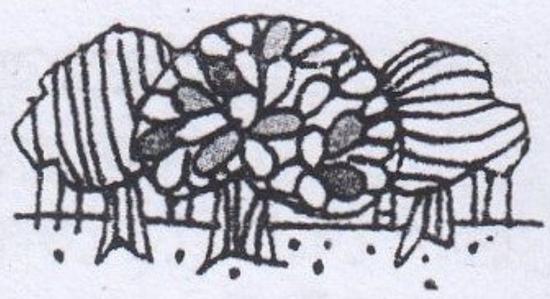
ছাতা



ওই শহরতলীর রাস্তাটা যেখানে একটু চওড়া হবার চেষ্টা শুরু করেছে, তার একপাশে সরু গলিটা, সহজে চোখে পড়ে না। যাত্রীবোঝাই বাসগুলো যখন গোঙাতে গোঙাতে হেলেদুলে এগুতে থাকে, নাকে রুমাল চেপে পথচারীকে ঘুরে দাঁড়াতে হয়, আর তখনই তা নজরে পড়ার সম্ভাবনা। ডান পাশে বড়ো বাড়ির প্রাচীরে হাত ঠেকিয়ে সামনের দিকে চলতে থাকলে, আবছা অন্ধকার দৃষ্টিকে ব্যাহত করবে, তারপর মনে হবে, প্রবেশ করছে কোনো পাহাড়ের সুরঙের ভিতরে স্বেচ্ছায়। নিচে নর্দমা। যাদের রুমাল থাকবে না, বাঁ হাতে নাকটা চেপে ধরতে হবে সজোরে। এভাবে আরো কিছুদূর এগুলে দেখা যাবে, একটু ফাঁকা, নীল আসমানের এক টুকরো, প্রৌঢ় পেয়ারা গাছটা মরিয়া হয়ে ডালপালা বাড়িয়ে রেখেছে, আর তার নিচেই দুচালা করগেটের ঘরখানা। বারান্দাটা বড়ো হলেও নানারকম জিনিশপত্রে ঠাসা ঃ ভাঙা চেয়ার, পাটশলা-লাকড়ি, খড়-বিচালির স্তূপ।

দুয়ারের কাছাকাছি বাঁশের খুঁটি ঘেঁষে একটা বেতের সোফা, ভেঙে লেপটে যাওয়ার অপেক্ষায় দিন গুণছে।

বারো তেরো বছর আগে নতুন বৌ-কে প্রাচুর্যের ইঙ্গিতে হকচকিয়ে দেবার অবচেতন ইচ্ছায়—কেনা এই সোফাটায় বসে সকাল-বিকেল দুবার নিবিষ্টমনে ধূমপান করেন আমিনুদ্দিন, সরকারী দপ্তরখানায় একশো পঁচিশের মালিক। বড়ো ছেলেটা জ্যামিতির সূত্র মুখস্থ করে মাদুরে বসে, ছোট ছেলেমেয়েগুলো সুর করে চেঁচায় প্রথমপাঠ দ্বিতীয়পাঠ সামনে। সামনের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে চলে তার নাক কানের পাশ দিয়ে, নানা দার্শনিক তত্ত্বে তার মগজটা খোপে খোপে ভরে উঠতে থাকে।

রোকেয়াবানুর মেজাজ ভালো নয়, এমন কথা তার বড়ো শত্রুও বলতে পারবে না। তবে এ জিনিশটা তার দুচোখের বিষ—এই গোমড়া হয়ে বসে থাকা, মিছিমিছি ভাবনা চিন্তায় মন খারাপ করা। আমিনুদ্দিন সব শোনেন, কিছু বলেন না ; সস্তা চশমায় ঢাকা তার ক্লান্ত চোখের তারায় এমন একটা ভাব খেলে, যাকে পত্নী-প্রেম মুগ্ধতার নিদর্শন ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

কিন্তু প্রকৃত তথ্য বিবৃত করতে গেলে, বলতে হয়, এতদিনকার একটানা দাম্পত্য জীবনের পরেও স্ত্রীকে তিনি পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেননি। এতে বেশ কিছুটা নতুনত্ব আছে সন্দেহ নেই; কারণ তার ধারণা ছিল, প্রথম প্রথম উভয়পক্ষ থেকেই আগ্রহের আতিশয্য থাকে, দৈনন্দিন টুকিটাকি ব্যবহারে, কথাবার্তায় ; বৌ মায়ের বাড়ি গেলে, বিরহের কবিতা লিখতে না বসলেও, অন্তত অকারণে দুপুরবোদে হেঁটে বেড়াতে, কিংবা বাপ-মায়ের ওপরে কথায় কথায় মেজাজ ফলাতে অনেককেই দেখা গেছে ; আর অতি আগ্রহে মায়ের বাড়ি গেলেও, হাতে মেহেদির ছোপ লাগানো, বিয়ের শাড়িপরা অপর প্রাণীটির ঘুমও যে গভীর রাত্রিতে মাঝে মাঝে ভেঙে যায়—এও সবারই জানা কথা।

কিন্তু সাত আটটা নতুন মানুষকে দুনিয়ার আলো দেখাবার পরও দীর্ঘশ্বাস—কাতরতা একটু কমে আসাই স্বাভাবিক।

অথচ এখানে দেখা যাচ্ছে ঠিক তার উল্‌টো।

এ যেন একটা রুটিন হয়ে গেছে। সন্ধ্যা হতেই ছেলেমেয়েদের খাইয়ে গিন্নী একেবারে

সাফসোফা। নিজেদের ভাগটুকু আলাদা করে রাখার অভ্যাস তার। একটা মাদুর পেতে ভাত বেড়ে দেন স্বামীকে, ঝাঁপের কোণায় নিজেও থালা নিয়ে বসেন একই সঙ্গে। আমিনুদ্দিন আপত্তি করেন না, কিছু মনেও করেন না; মেয়েরা আজকাল বাজারে বেরুতে শিখেছে, আর স্বামীর নাম নেওয়া, একসঙ্গে বসে খাওয়া-এতো নেহাৎ তুচ্ছ ব্যাপার। যুগের সাথে স্ত্রীর অগ্রগতি দেখে বরং তার আনন্দই লাগে। খাওয়া দাওয়া সেরে হারিকেনটা সিথানে রাখেন বিছানায়, তামাক সেজে হুকোর নলটা এগিয়ে দেন রোকেয়াবানু। তারপর পানের ডিবাটা এনে উপুড় হয়ে বালিশে ভর দিয়ে গভীর যত্নে খিলি তৈরি করেন গণ্ডাদুয়েক। দুজনের মাঝখানে রাখেন পানের ডিবাটা। কিছুক্ষণ এভাবে কেটে যাওয়ার পর সলতেটা কমিয়ে দেন হাত বাড়িয়ে। চৌকির নিচের দিকে মেঝেয় ছেলেপুলেরা শোয়, এমনকি কনিষ্ঠতম জাতকটাও তক্তপোষে শোওয়ার নাগরিক অধিকার পায় না।

এভাবে অনেকক্ষণ কেটে যায়। তামাকের ধোঁয়া আর পানের গন্ধ বাতাস ভারী করে তুলতে থাকে।

কিছু দূরে রাস্তায় শেষ যানবাহন চলাচলের শব্দ শোনা যায়। এ ছাড়া ঘরময় আদিম নীরবতা বিরাজ করে। মাঝে মাঝে স্বপ্নের ঘোরে কঁকিয়ে ওঠে মাঝারি মেয়েটা, বারান্দায় মুর্গির টঙে কদাচিৎ কক্ কক্, পাখার নড়াচড়া। পানের ডিবাটা সিথানে রেখে রোকেয়াবানু বলেন, ওগো শুনছো!

হুঁ! নাকে কিংবা মুখে ঠিক বুঝা যায় না, একটা অদ্ভুত শব্দ।

আমাদের সেই মুর্গিটা দুটি ডিম দিয়েছে!

হুঁ!

তুমি তো বলছিলে, জবে করে ফেলো। তোমার খালি বাজে গোঁ। জবে করলে একদিনেই সব খতম হয়ে যেত।

হুঁ!

মুর্গিটার জাত ভালো। আমি তো দেখেই বুঝেছিলাম, দেখো কেমন বাচ্চা দেয়। তা আর বলব কি, দেখলেই তো তোমার জিভ টস্‌টস্ করবে। বলবে এটা জবে করো, ওটা করো। মুর্গির বাচ্চার কত দাম বাজারে! তোমার কি চোখ আছে? আমাদের গাঁয়ের বেন্দার মা মুর্গি বেচেই টিনের ঘর তুলেছে।

আমিনুদ্দিন নিশ্চুপ। তার শ্বাস-টানা ক্রমে ভারী হয়ে উঠতে থাকে। রোকেয়াবানু ধাক্কা দিয়ে বলেন, কি, ঘুমিয়ে গেলে নাকি?

হু!

নারীকণ্ঠ হঠাৎ ঝাঁকিয়ে ওঠে, হুঁ, হুঁ, খালি হুঁ। মুখে যেন কাঁথা পুরে রেখেছেন, কথা জানেন না।

আবার স্তব্ধতা। আবার সেই বস্তির কুকুরের আচমকা ঘেউ ঘেউ, বাড়ির পিছনকার পচা জলায় নানারকম পোকার ঝিন্‌ঝিন্ টিপ্‌টিপ্ ডাক। ঘরের চালের ওপর পেয়ারাগাছের ডালায় একটা নিশাচর পাখি এসে বসে, ঝুপ্ করে।

সকালে কাক ডাকার আগেই উঠে পড়েন রোকেয়াবানু। গোসল সেরে এসে ফজরের নামাজ পড়েন শাদা শাড়িটা পরে। এরপর রান্নাঘরে চলে যান।

এভাবে শরৎ কাটে, হেমন্তে কাটে। শীতের পর বসন্ত আসে। গ্রীষ্ম যায়, আসমানের একটানা কান্না নিয়ে দেখা দেয় বর্ষা।

আষাঢ় শেষ হতে চলল, তবু বর্ষণের অন্ত নেই। রান্নাঘরের পাশ দিয়েই নর্দমা চলেছে,

পাশের দালানের কার্ণিশের ধারা ঝুপ্‌ঝুপ্‌ পড়তে থাকে ঘরের চালে, আর একসঙ্গে সব মিশে জোর একটানা শব্দে নালায় পড়ে। হেঁসেলের ছাউনী ফুটো হয়ে গেছে এমন নয়, তবু ফাঁকে-ফোকরে কিছু কিছু পানি ছিটকে পড়েই। সময় এগিয়ে চলে, সঙ্গে সঙ্গে মেঝেটা ভিজে চপ্‌চপ্‌ করতে থাকে। কেমন ঘিনঘিনে। সব সময় পয়—পরিষ্কার থাকবার চেষ্টা, এসব সহ্য হয় না রোকেয়াবানুর। কাছে—ভিতে কাউকে না পেয়ে, অপরাধী করতে না পেরে বক্‌বক্‌ করতে থাকেন আপন মনেই, হায়রে, চোখকানা খোদা, একটু ছ্যাক্‌ দিলে কি তোর আরশ ভেঙে পড়ত।

মাঝারি মেয়েটা বারান্দা থেকে চিঁচিঁ করে বলে, মা! আব্বা বললেন, অফিসের সময় হয়ে এল।

অফিসের সময় হয়ে এল! মেয়ের কথাটা চিবিয়ে চিবিয়ে মা জবাব দিলেন, সোফায় বসে বসে তার বলতে কি! সকাল থেকে বাইরে একটু নাক গলিয়ে দেখেছে, কেয়ামত হচ্ছে না শাদি-মোবারক? খালি মাতব্বরি, অফিসের সময় হয়েছে, আমি যেন জানি না।

আমিনুদ্দিন পাজামা পরতে পরতে শুনলেন কথাগুলো। তার ঠোঁটদুটো বেঁকে গেল, এই সঙ্গে এমন একটা ভঙ্গি হল, যাকে হাসিও বলা যেতে পারে।

বড়ো ছেলে নান্নু, তারও ইস্কুলের সময় হয়েছে। পারদ-ওঠা আয়নাটা সামনে নিয়ে সে মাথা আঁচ্‌ড়াচ্ছে, ঠোঁট বেঁকিয়ে, চোখ বড়ো করে চেহারাটা দেখলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। বাপ আড়চোখ ছেলেটাকে লক্ষ্য করে হাসলেন আবার। যুগটা পালটাচ্ছে বটে। তাদের আমলে গোঁফ না উঠলে চুল রাখাই ছিলো অশোভন, বখাটে হয়ে যাওয়ার লক্ষণ, আর আজকালকার ছোঁড়াদের হয়েছে কি।

অবশেষে ভাত এল।

ছেলেকেও বসতে দেখে রোকেয়াবানু চেঁচিয়ে ওঠেন, তুই আবার বসলি কেন? ওঠ্‌, পেটে যেন দোজখের আগুন, একটু তর সয়না!

ইস্কুলে যাব না? নান্নু গাল ফুলিয়ে বলে।

ইস্কুলে? মায়ের চোখজোড়া কপালে উঠল, এই বৃষ্টিতে ইস্কুলে যাবি? তোর মাস্টারদের খেয়েদেয়ে আর কাজ নেই বুঝি!

ছোট হলেও নান্নু বুদ্ধিমান, মিছিমিছি বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন বোধ করে না। নির্বিকার চিত্তে একটা বাসন টেনে নিয়ে বসে গেল।

ঘাড় গুঁজে গোগ্রাসে সে খেতে লাগল। রোকেয়াবানু একবার মার মার করে উঠছিলেন, স্বামী থামিয়ে দিলেন, আহা হা, খেতে দাও না! ইস্কুলে না-হয় না যাবে। হয়তো খিদে পেয়েছে!

খিদে পেয়েছে! পেলেই হল আ কি! ঢ্যাঙা ষাঁড় কোথাকার! ওদিকে ওরা যে খায়নি, তাদের খিদে পায় না? ছোটদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন রোকেয়াবানু।

বর্ষণ একটু কমলেও, বাইরে বেরুনোর মতো অবস্থা এখনো হয়নি। উঠোনে একহাঁটু পানি জমেছে, মাথা খারাপ ছাড়া কেউ জুতো পায়ে বেরুতে চাইবে না। একান্ত প্রয়োজন হলে হাতে নিয়ে নামতে হবে। পাজামা কুঁকড়িয়ে তুলতে হবে হাঁটুর ওপর। কাঁধে হাতল ঠেকিয়ে ছাতাটা এক হাতে, আর নিচে কাপড় অন্য হাতে ধরে রাস্তার দিকে এগুতে হবে সন্তর্পণে। আমিনুদ্দিনকে প্রায়ই এরকম করতে হয় বলে, বৃষ্টি না থামা সত্ত্বেও, তার যেন কোনো ভাবনা নেই। তিনি খাচ্ছেন ধীরেসুস্থে।

নাকেমুখে কিছু গুঁজে উঠে যায় নান্নু। মুখে এমন ভাব দেখায়, যেন সারা দুনিয়া গয়রত

হয়ে গেলেও, বারান্দায় পা দেয়ারও ইচ্ছে তার নেই। কিন্তু মায়ের শ্যেনদৃষ্টির আড়ালে গিয়ে তার চলনে চাঞ্চল্য দেখা দেয় ; টেবিলের কাছে গিয়ে চট্‌পট্‌ বইপত্তর সার্টের নিচে, প্যান্টের বন্ধনীতে গুঁজে ফেলে। কালো কাপড়ওলা বস্তুটা টাঙানো ছিল বেড়ায়, চেয়ে না চেয়ে কোনরকমে টেনে নিয়ে খরগোসটির মতো বেরিয়ে যায়।

উঠোনের পানিতে শব্দ।

নান্নু! ডাক নয়, যেন পৃষ্ঠদেশ লক্ষ্য করে একটা মোক্ষম বর্শা ছুঁড়ে মারা।

আটকে যায়। এতে পারে না, আর একটা পাও ফেলতে পারে না সে। সামনের দিকে মুখ করেই দাঁড়িয়ে থাকে। হয়তো কাঁপতেও থাকে, ঠিক দেখা যায় না।

আয়! ইদিকে আয়! চাঁচা-ছোলা স্পষ্ট নির্দেশ।

নানু নয়, তার পাদুটো তাকে দরে নিয়ে আসে। বারান্দার নিচেই দাঁড়িয়ে থাকে মাথা নিচু করে, উঠে আসার সাহস নেই। এমন অপরাধের শাস্তি কি, সে জানে, এতটুকু জীবনে এ ধরণের অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে অনেকবার। সে জানে, আত্মসমর্পণ করাই বুদ্ধিমানের কাঝ। একটানে চাতাটা হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে, বেড়ায় ঠেসান দিয়ে রেখে, ছেলের চুলের মুঠি ধরে বারান্দায় টেনে তুললেন রোকেয়াবানু। ডান হাতে ঠাশ্‌ঠাশ্‌ দুতিনটে চড় মেরে বসিয়ে দিলেন একেবারে।

দস্যি দস্যি! দশমাস দশদিন পেটে আমি সদ্যি ধরেছি! ছেলেকে ছেড়ে দিয়ে হাঁপাতে থাকেন, আরে বাপ্‌রে বাপ্‌ কী কল্‌জে দেখ না, দিনেদুপুরে ডাকাতি। ছাতিটা নিয়ে চলেছে!

ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করেন আমিনুদ্দিন।

একটু এগিয়ে এসে সহধর্মিনীর কন্টে সুর মিলিয়ে বলেন, ছেড়ে দিলে কেন? দেও, দেও আরো দেও! এত বয়েস হয়েছে, এখনো একটু কমনসেন্স হল না। হবে আর কবে!

আরে বাপ্‌রে বাপ্‌! ছেলেকে টেনে তুলে গালে একটা ঠোনা মেরে রোকেয়াবানু বলেন, ছাতিটা যে নিয়ে চলছিলি বড়, চোরের মতন? কথা বলছিস্‌ না কেন, হে? আমার নবাবপুত্তুর, থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেবো চড়িয়ে।

নানু কাঁদতে সাহস করে না। ঢোক গিলে সে তার আকাশচুম্বী অভিমানকে দমিয়ে রাখে। কিন্তু কাঁহাতকে আর মুখ বুঁজে থাকা যায়? চোখ কচলাতে কচলাতে সে বলে, ইস্‌ মারলেই হল। আমার ইস্কুল নেই যেন।

সে ভ্যাক্‌ভ্যাক্‌ করে চোখের পানি ছেড়ে দেয়। ছোট মেয়েটা মেঝেয় গড়াগড়ি দিতে দিতে আঙুল চোষে সেদিকে চেয়ে।

মাথা নিচু করে কী ভাবেন আমিনুদ্দিন। কাঁচা-পাকা খোঁচা খোঁচা দাড়িভরা চোয়ালদুটো বড়ো বিষণ্ন দেখায, চশমার আড়ালে ভাবলেশহীন ধূসর ছায়া নামে চোখে। পিরহানের পকেটে হাত ঢুকিয়ে এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন, যেন কিছু লোকজন থাকলে খেনি একটা জোরালো বক্তৃতা শুরু করে দিতেন। এ-ভাবটা পত্নীর দৃষ্টি এড়ায় না। ছাতাটা হাতে দিয়ে বলে ওঠেন, কি এখনো ভালমানুষের মতন দাঁড়িয়ে রয়েছো যে। তখন যে খুব হৈব চৈ শুরু করেছিলে। আপিসের সময় হয়ে এল! ভাত হল না!

ও, হ্যাঁ এই যাচ্ছি!

নিমেষে কর্ম-তৎপর হয়ে ওঠেন আমিনুদ্দিন। বারান্দায় গিয়ে ছেলেটাকে বলেন, চ, আমার সঙ্গে চ। তোদের ইস্কুলের পথ দিয়েই তো আমার যেতে হবে, দিয়ে যাব তোকে।

নান্নু অবাক বিস্ময়ে পিতার মুখের দিকে তাকায়। ইস্কুলের পথ, আর আপিসের পথ— দুটো দুরাজ্য দিয়ে চলে গেছে। অথচ উনি বলছেন কি? এ ভাবটা বেশিক্ষন থাকে না তার,

পিতার অর্থপূর্ণ ইশারা পেয়ে উঠোনে ছাতার নিচে নেমে যায়। দুজনে একসঙ্গে চলতে থাকে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে এক খিলি পান মুখে ঠেসে, রোকেয়াবানু এমন একটা ভঙ্গি করেন, একমাত্র বাঁদরের ভেংচি কাটার সঙ্গে যার তুলনা চলে।

বৃষ্টি কিছু পাতলা হলেও কাপড় বাঁচাবার মতো নয়। পিতাপুত্র যেখানে এসে থামে, তার দুদিকে দুটো রাস্তা চলে গেছে। এখন আর একসঙ্গে যাবার উপায় নেই, আর গেলেও একজনের ক্ষতি হবেই। চট্ করে একটা বুদ্ধি খেলে যায় পিতার মস্তিষ্কে, ছাতাটা ছেলের হাতে দিয়ে বলেন, এই নে। তুই যা। ইস্কুলের ঘন্টা হয়ত পড়ে গেল!

আপনি? নান্নু উচ্চারণ করে।

আমিনুদ্দিন হাসেন। বলেন, আমার জন্যে ভাবিসনে! ঐ বাস এসে গেছে। চট্ করে উঠে পড়ব, তারপর নেমে সোজা চলে যাব আপিসে! এই নে, তুই যা!

ওর কানের কাছে ফিস্‌ফিস্ করে আরো কী বলেন, কুচক্রীর আদল ফোটে চেহারায়।

নান্নু ঘাড় নাড়ে, আচ্ছা!

যেন বৃষ্টিকে তুড়ি দিয়ে এড়িয়ে চলেছেন এমনিভাবে মাথাটা নিচু করে বাস-স্ট্যান্ডের দিকে দৌড়ে যান আমিনুদ্দিন। ছেলেটা নিজের পথ ধরে, খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে।

টেবিলের তিন পাশেই ফাইল, ফাইলের স্তূপ। পিঠটা একটু কুঁজো করে সামনের দিকে ঝুঁকে বসাই তার অভ্যাস, চমশা নেওয়া সত্ত্বেও জৈবিক চোখজোড়া কুলিযে উঠতে পারে না। কাজ করার সময় বোতাম খুলে দেন পিরহানের, গায়ে ল্যাপটানো গেঞ্জিটা ঘিন্‌ঘিন্ করে ঘামে, হাতাদুটো কনুই ইস্তক কুচকিয়ে খচ্‌খচ্ করে কলম চালিয়ে যান, অটোমেটিক যন্ত্রের মতো, একটু চিন্তা করে দেখা, নিম্নতম বুদ্ধিবৃত্তির চর্চারও কোনো প্রয়োজন পড়ে না, মগজ আর মনকে একেবারে এড়িয়ে কেবল হাত যেন স্বেচ্ছায় কাজ করে চলে। পাশের টেবিলের সহকর্মী, আতাউল হক খান, একটু বেশি বাক্যবাগীশ, যখন তখন এটা-সেটা নিয়ে রসাল গল্প জমিয়ে তোলার ওস্তাদ। অবশ্য এতে কারো কাজের ব্যাঘাত এতটুকু হয় না। হাত করে হাতের কাজ, মুখ করে মুখের।

জোহরের নামাজের জন্যে ছুটি পাওয়া যায় আধ ঘণ্টা। আতাউল হক খান আকর্ণবিস্তৃত একটা হাসি দিয়ে টেবিলের সামনে দাঁড়ায়। একটা মোহিনী-বিড়ি হাত বাড়িয়ে দেয়, নেন, খান।

বিড়িটা হাত বাড়িয়ে নেন আমিনুদ্দিন।

খান বলে, ভাবছেন কি অত? ভেবে আর কি হবে বলুন, যা হবার তা হবেই, আপনি আমি ঠেকাতে পারব না! হ্যাঁ, ব্যক্তিগতভাবে আমি ওমর খৈয়ামের ভক্ত। লোকটার প্রতিভা ছিল বটে। কয়েক শতক আগেও কি বিপ্লবী কথা শুনিয়ে গেছেন, খাও-দাও, নাচো, গাও-কারন কালই তোমাকে মরতে হবে।

হুঁ। আমিনুদ্দিন শব্দ করেন।

আরে! আপনার পিরহানটা যে দেখছি ভিজা! ছাতা নেই বুঝি।

ছিল একটা। আনতে ভুলে গেছি।

খান সহজভাবে বলেন, হ্যাঁ, ঠিকই। বৃষ্টির দিনে ছাতা আনতে ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক। যাই বলুন, আমরা বড্ড আপনভোলা। নিজের সুখ-সুবিধার দিকেও সবসময় নজর রাখতে পারি না!

খান যদিও কথাটা আঘাত দেবার জন্য বলেনি, তবু হঠাৎ মনে বড়ো লাগে। চুপ মেরে থাকেন আমিনুদ্দিন। ভাবেন, ও ভদ্রলোকেরই বা দোষ কি। সত্যিই তো, জামাটা বেশ ভিজে গেছে, লেপটে আছে পিঠে। এজন্যেই বোধ হয় ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা লাগছিল এতক্ষণ।

আপিস ছাড়ে, কিন্তু বৃষ্টি ছাড়ে না। দুপুর-বেলাটায়, যখন কোনো প্রয়োজন ছিলো না, একটু বিরতি ঘটেছিল, আকাশ পরিষ্কার হতে দেখে আশাও জেগেছিলো অনেকের মনে, কিন্তু বেলা গড়িয়ে যেতেই আবার মেঘ জমেছে, কালো-কালো। সঙ্গে সঙ্গে নাকিকান্নাও শুরু হল। বৃষ্টি একটু পাতলা হবে আশায় আমিনুদ্দিন দাঁড়িয়ে থাকেন আপিসের বারান্দায়। কিন্তু পাতলা হবে দূরের কথা, ক্রমে ক্রমে আরো বেড়েই চলে।

আপিসের একজন কর্মচারী। ছাতা মাথায় বেরুচ্ছে। আপনি বাসস্ট্যাণ্ডের কাছে যাবেন কি? বলে অনুমতির অপেক্ষা না করেই ছাতার নিচে মাথাটা ঢুকিয়ে দেন আমিনুদ্দিন। ভদ্রলোক নাক ছিটকায়, কিছু বলতে পারে না।

একটা দোকানের বারান্দা ঘেঁষে ছাতা-হাতে দাঁড়িয়ে আছে নান্নু, পিতার অপেক্ষায়। এখানেই দাঁড়িয়ে থাকার কথা ছিল।

চ শিগগির। রাত হয়ে গেল। ছাতাটা নিজের হাতে নিয়ে বলেন আমিনুদ্দিন।

সত্যি অন্ধকার হয়ে আসছে। এমন মেঘলা দিনে সূর্যের মুখদর্শন অসম্ভব, তবু প্রাকৃতিক আবছায়া আর সন্ধ্যাকে চিনে নিতে কষ্ট হয় না। যে-কোনো কারণেই হোক, আপিস থেকে ফিরতে রাত হয়ে গেলে, বাংলা-ভাষায় নতুন নতুন বাগ্নিধির সৃষ্টি হয়ে চলবে, কেবল দুটো ঠোঁটের শক্তিতেই। এ বিষয়ে রোকেয়াবানুকে একদম নির্দয় বলা ছাড়া উপায় নেই, ছেলেপুলে, স্বামী যেই হোক, সন্ধ্যার আগে বাড়ি না ফেরার ব্যাপারটা। ছাতার নিচে জড়াজড়ি করে পিতাপুত্র বাড়িতে ঢোকবার গলিটার মুখে এসে দাঁড়ায়।

পিতা বলেন, আমি ছাতা হাতে বাড়িতে ঢুকি। তুই একটু পরে আসিস। বুঝলি? যাতে সন্দেহ করতে না পারে!

নান্নু সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ে।

পিরহানটা আলনায় রাখতে গিয়ে রোকেয়াবানু সওয়াল করেন, জামাটা ভিজল কি ভাবে, শুনি!

এই ভিজে গেছে! আমিনুদ্দিন প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে চাইলেন।

ভিজে গেছে মানে?

বাইরে গিয়ে দেখ না, কেমন বাতাস! আরে বাপস্ বৃষ্টিকে একেবারে তেরছা করে এনে গায়ে ছুঁড়ে দেয়। ছাতার সাধ্যি কি আটকায়! বলে হাত-পা ধুতে বেরিয়ে যান আমিনুদ্দিন। ভাবেন, হায়রে স্ত্রীজাতি! তোদর হাত থেকে বাঁচবার কোনো পথই বিধাতা সৃষ্টি করেন নি!

নান্নু!

জি আম্মা!

রোকেয়াবানু অভিযোগ করলেন, ইস্কুল থেকে কিভাবে এলি? তোর জামা-কাপড় ভিজল না যে।

আমার এক ক্লাস-ফ্রেণ্ড তার ছাতায় করে দিয়ে গেছে!

তিনি এগিয়ে যান স্বামীর দিকে, নান্নু তো ছাতায় করে এসেছে। কই, সে তো ভিজেনি!

আমিনুদ্দিন জবাব দেন, ও ছেলেমানুষ, আবার ভিজবে কি? প্যাণ্ট পরে, হাফ-সার্ট পরে, ওদের কথা আলাদা!

প্রশ্নকর্ত্রী এরকম জবাবে সন্তুষ্ট হয়েছেন বলে মনে হয় না। শুকোবার জন্যে ছাতাটা ঘরের এক কোণায় মেলে দিয়ে চলে যান নিজের কাজে।

ক্রমে রাত হয়। খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার পর, রোকেয়াবানু একটা পিতলের চামচেয় কিছু সরষের তেল নিয়ে তা গরম করেন চেরাগের শিখায়। দুতিনটে রশুন ছেঁচে দেন

মিশিয়ে। এরপর চৌকিতে উঠে মালিশ করতে বসেন স্বামীর গা। বড়ো ভালো লাগে আমিনুদ্দিনের। শরীরের মাংস বিশেষ নেই ; তবু পা'য়ের পাতায়, আঙুলের ফাঁকে, হাঁটুর নিচে, উরুর কাছে, বুকের দিকে আর পিঠের ওপর ঈষৎ গরম তেল মাখানো চটচটে হাতটা যখন যত্নের সঙ্গে চাপ দিয়ে দিয়ে চলে,—তখন বাতির শিখার দিকে চেয়ে হঠাৎ তার মনে হয়, দুনিয়াতে স্ত্রী যাদের নেই তাদের মতো হতভাগ্যদের গলায় কলসী বেঁধে মরে যাওয়াই ভালো। তার চোখের তারায় গভীর তৃপ্তির ছায়া পড়ে। স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন একদৃষ্টে, এই মুহূর্তে অনেক বেশি সুন্দরী মনে হয় তাকে।

একসময় খুকখুক করে কেশে ওঠেন তিনি।

রোকেয়াবানু বলেন, আবার কাশিও হয়েছে দেখছি।

তৎক্ষণাৎ ছাতাটার কথা তার মনে পড়ে যায়। তার পেছনে একটা কারণ অবশ্য রয়েছে। অনেকদিনের পুরনো একটা ছাতা ; গত গ্রীষ্মে দেখা গেল, তার দেহের পরিচ্ছদটা একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে, ধরে ধরে অসংখ্য মোটা সূঁচ ফোটানোর মতো, কালো রং উঠে ফ্যাকাশে শাদা রূপ ধারণ করলো, শিকগুলোও এমন দুর্বল হয়ে পড়লো, ছাতাটাকে কোনরকমেই জিনস্ব আকৃতিতে রাখতে পারল না। তবু চলছিল। কিন্তু কালক্রমে দেখা গেল, আপনা-আপনিই কাপড় ছিঁড়ে ছিঁড়ে ঝুলে পড়েছে। এই তো হাল। কি করা যায় এখন? আমিনুদ্দিন এসব নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামাননি, কোনো না কোনো উপায়ে দিন চলবেই, অনড় বিশ্বাস তার। কিন্তু সবার দৃষ্টি-ভঙ্গি তো এক নয়? ছেঁড়া গেঞ্জি পিরহানের নিচে পরে বাইরে বেরুনো যায়, কিন্তু ছেঁড়া ছাতায় অসম্ভব। এ যে একেবারে খোলাসা, সূর্যের নিচে, সূর্যেরই আক্রমণ প্রতিহত করতে উদ্যত। পথে ঘাটে, হাটে বাজারে ছাতা সবারই নজরে পড়ে। নিতান্ত খোলাখুলি।

কিন্তু রোকেয়াবানুর কাছে শুচিবায়ুগ্রস্ততার প্রশ্রয় নেই। তার যুক্তি সম্পূর্ণ অন্য রকম। কাজে-কর্মে বসতে-মুতে তার কেবলি মনে হয়, সংসার ধর্মে স্বামী একটা ছাতা বিশেষ, যে সুদিনে দুর্দিনে চেলেপুলে—বৌকে ছায়া প্রদান করে, ঝড়-বৃষ্টি-রৌদ্রের হাত থেকে বাঁচায়। কোনো কারণে এ অকেজো হয়ে পড়লে সামনে কেবল ধূ-ধূ মরুভূমি, হাশরের ময়দান। গরমের দিন শেষ না হতেই বনেদী ছাতাটার হাল দেখে তার ভাবনার অন্ত রইল না ; স্বামীকে বললেন, খেয়ে না খেয়ে দাঁতে কামড় দিয়ে একটা কিনে নিতে। কিন্তু পীড়াপীড়ি করলেই তো হল না? রক্তমাংসের একটা মানুষ কত আর কুলোতে পারে? জিনিশপত্রের আক্রা দর। এতো কাচ্চা-বাচ্চা। অবস্থাটা ধীরেসুস্থে চিন্তা করে দেখলেন রোকেয়াবানু, বাংলাদেশের আর যে গুণই থাকুক, বর্ষাটা এমনি বিশ্রী, মানুষকে নাকানি-চোবানি খাইয়ে ছাড়ে, বৃষ্টির জন্যে আপিস কামাই করতে হলে, হাঁড়ি চড়বে না। অতএব তিনি সিদ্ধান্ত করে ফেললেন, নিজে নিজেই। সব সময়ই আনিটা দু আনিটা সঞ্চয় করা তার অভ্যাস ; তাছাড়া প্রতিবেশী অফিসারের বৌয়ের কাছে চুপি চুপি হাঁস-মুর্গি বিক্রি করে জমিয়েছিলেন কিছু। ইচ্ছা ছিল নামাজ পড়ার জন্যে একটা ভাল সুতীর শাড়ি কেনা। কিন্তু তিনি স্বার্থত্যাগ করলেন, ওদিকে স্বামী জানতেও পারলেন না। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে সাড়ে এগারোটা টাকা গুণে দিয়ে বললেন, দোকান থেকে ছাতা কিনে বাড়ি ফিরতে। না হলে, রোকেয়াবানু এমন একটা ইঙ্গিত করলেন, যারপর স্বামীর তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়া ছাড়া গত্যন্তর রইল না।

ছাতা আনা হলে, একটি দিনের পরিশ্রমে নাম লিখলেন, বাড়ির নম্বর, ঠিকানা লিখলেন সুই-সূতো দিয়ে, যাতে হারানো গেলেও পাওয়া যায়।

স্বামীর গায়ে তেল মালিশ করতে করতে তার স্বার্থত্যাগের কথা মস্তিষ্কে খেলা করে,

শাড়ির জন্যে অনুশোচনা জাগে দুর্বল মুহূর্তে। এভাবে রাতের চাকা গড়িয়ে চলে অসমাপ্ত স্তব্ধতার দিকে, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে তার।

সকাল হয়। যতই দিন যাচ্ছে, আকাশ যেন কোমর বেঁধে লেগেছে, মানুষের চলাচলকে বন্ধ করে দিতে। কিছুক্ষণ হয়তো নিঝ্‌ঝুম, চুপচাপ, কিন্তু তা সহ্য হবে কেন? একটু পরই ওঠে গুড়গুড়, গুম্‌গুম্ গর্জন-একটানা, একঘেয়ে ঝমঝমানি শুরু হয়ে যায়। রান্নাঘরে বেড়ার ফাঁকে ছিটকে পড়ে বৃষ্টির ছিটে। মেঝেটা কাদা-কাদা, চ্যাপচেপে। আসমানের মালিককে লক্ষ্য করে রোকেয়াবানুর সুমধুর বাক্যবর্ষণ চলে বাইরের বর্ষণের সঙ্গে তাল রেখে।

কিন্তু তা'হলে হাত-পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকলে তো চলে না। পুরনো টেবিল ঘড়িটাতে দশটা বাজলে হাতে তুলে নেন ছাতাটা। নান্নু তার সঙ্গে যায়, মায়ের সামনে ভেজা বেড়ালটি হয়ে।

বাস-স্ট্যাণ্ডের কাছাকাছি এসেই পিতা বলেন, এই নে, তুই যা। ইস্কুলের ঘণ্টা বোধ হয় পড়ে গেল।

নান্নু উপেক্ষা করতে পারে না পিতার নির্দেশ। ছাতাটা হাতে নিয়ে সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, নিজের অজানতেই যেন। দেখে, বাবা ভিজতে ভিজতে ছুটেছেন, রবারের পাম্প সু থেকে কাদার ছিটে পড়ছে পাজামার পেছন দিকে, টিপ্‌টিপ্ বৃষ্টি পড়ছে মাথায়, পিরহানের ওপর। তার কিশোর চোখের তারাদুটো কেমন একটা অনুকম্পার আবরণে ম্লান হয়ে যায়। বাসটা চলা শুরু করলে, সে পা বাড়ায়।

বিকেলে ইস্কুল ছুটি হলে, আবার সে এসে দাঁড়িয়ে থাকে নির্দিষ্ট স্থানটিতে। কিছুক্ষণ পর পিতা আসেন। দুজনে মিলে চলে বাড়ির উদ্দেশ্যে। গলিটার মুখে এসে আবার সে দাঁড়ায়। পিতা ভিতরে চলে যান ছাতা হাতে। এরপর সে ঢোকে।

এমনিভাবে সপ্তাহখানেক কেটে গেল। কাশিটা বেড়েছে আমিনুদ্দিনের। একবার উঠলে শিগগির থামতে চায় না, বুকে বড্ড টান লাগে। ব্যথা বাজে। কপালের দুপাশের রগ্ দুটো টন্‌টন্ করে, মাথা ঘোরায়। একটু জ্বর-জ্বর ভাব। বাইরে আগের মতোই কাজ কর্ম করলেও, ভিতর থেকে যেন শরীরটা ভেঙে পড়েছে। বড্ড ক্লান্তি বোধ করেন আজকাল।

সেদিন বোধ হয় শনিবার। কিছু ফাইল জমে আছে। ওপরওলা অফিসারের তাড়ায় কলম চালিয়ে যাচ্ছিলেন বেপরোয়া, হঠাৎ এক সময় টেবিলের উপর এলিয়ে পড়লো মাথাটা। পাশের টেবিলে আতাউল হক খান হকচকিয়ে উঠলো, কি হল আপনার।

কোন জবাব নেই।

কাছে এসে, শরীর স্পর্শ করে, শিউরে ওঠে খান, ইস্ এযে ভীষণ জ্বর। হাত পুড়ে যাচ্ছে। এমন শলীর নিয়ে কেউ আপিস করতে আসে নাকি! চুলোয় যাক চাকরি! নিজে বাচলে তো বাপের নাম।

হেড-ক্লার্কের কাছে একটা দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়ে, রিকশা করে তাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল খান। তখন আড়াইটে বেজেছে।

শরীর খুব ভালো যাচ্ছে না জানলেও, হঠাৎ এভাবে জ্বর আসবে, ভাবতে পারেননি রোকেয়াবানু। অপ্রস্তুত হয়ে যান, কেমন যেন। এত ঝড়-ঝাপটায় তৈরি হয়ে ওঠা তার মনোবল ভেঙে পড়তে চায, টুকরো টুকরো হয়ে। অজানা আশঙ্কা তার সমস্ত মনকে ছেয়ে ফেলে। অসুখ বিসুখে তার বড়ো ভয়, ক জানি কি থেকে কিসে গড়ায় বলা তো যায় না। ডাক্তার ডাকারও সংগতি নেই। মাথায় পানি ঢালা, তেল গরম করে হাত-পা মালিশ করা—ইত্যাকার যত প্রক্রিয়া তার জানা আছে, সবই বেপরোয়াভাবে প্রয়োগ করতে থাকেন রোগীর ওপর।

মালিশ করতে করতে হঠাৎ তার চক্ষু স্থির হয়ে যায়।

ছাতিটা কই? জিজ্ঞেস করেন ভয়ার্তস্বরে।

উসখুস করেন আমিনুদ্দিন। পরে বলেন, ও হ্যাঁ। ভুলেই গিয়েছিলাম. আপিসে বোধ হয় ফেলে এসেছি।

রোকেয়াবানু বিচলিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন, পাওয়া যাবে তো?

ও, তার জন্যে ভেবো না। নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। সরকারি আপিসে কোন জিনিশ হারানো যায় না।

উনি মনে মনে ঠিক করে রাখেন, নান্নু ইস্কুল ফেরামাত্র তাকে পাঠিয়ে দেবেন ছাতাটার খোঁজে! কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে এল, ও ফিরছে না দেখে অবাক হয়ে যান। এত দেরি হবার কথা তো নয়। শত ঝড় বৃষ্টি হলেও, সে সময়মতো আসবেই বাড়িতে। বিপদ যখন আসে, সবদিক থেকেই আসে। তার মেজাজ বিগড়ে যায়।

ছাতাটা একপাশে লুকিয়ে ঘরের ভিতরে প্রায় ঢুকে পড়ছিল নান্নু, মায়ের নজরে পড়ে গেল। লম্বা পা ফেলে তিনি এগিয়ে এলেন, কিরে ছাতি পেলি কোত্থেকে?

নান্নু মাথা হেঁট করে থাকে।

কি! জবাব দিচ্ছিস্ না কেন? মা ধমক দিয়ে উঠলেন।

ও মুখ নিচু করে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, আমার কি দোষ। বাইরে গিয়ে আব্বাই তো দিয়ে যান। বলেন, আমার লাগবে না তুই যা।

নিমেষে আগাগোড়া ব্যাপারটা যেন দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গেল রোকেয়াবানুর কাছে। তার ভুরু যায় কুঁচকে। পান খাওয়া পুরু ঠোঁট জোড়া কাঁপতে থাকে রাগে, তাহলে এই ব্যাপার!

থপ্‌থপ্ পা ফেলে স্বামীর বিছানার কাছে হাজির হলেন রণমূর্তিতে। তার শরীরটা ভেতর থেকে ঝাঁকানি দিতে থাকে। কোনো কথা আসছে না মুখে, কণ্ঠরোধ হয়ে এসেছে তার। কিন্তু এ-ভাবটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না, ক্রমে তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে উঠল—কপালে চোখে মুখে ঠোঁটে বুকে কেমন একটা বিবর্ণ স্তব্ধতা।

তোমার মনে বুঝি এই ছিল! কথাটা ঠিকমতো উচ্চারিত হল না, গলা কাঁপছে। কেমন একটা জ্বালা, অপরিমেয় ঝাঁজ। এরপর রোকেয়াবানু ফুঁপিয়ে উঠে বসে পড়লেন দু'হাতে মুখ চেপে তারপর উপরে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, ও মাগো, আমি কি করবো গো! আমারে মেরে ফেলার ফিকির করছে। কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে পথে বসাতে চায়। ভিক্ষা করাতে চায়। নিজে মরে, আমাদের সবাইকে মারতে চায়। ও মাগো, আমি কই যাবো গো।

ছোট-খুকীর মতো তিনি কাঁদতে থাকেন মাটি লেপটিয়ে।

আমিনুদ্দিন কিছুই ঠাহর করে উঠতে পারেন না, সব এলোমেলো হয়ে গেছে যেন। আলোর দিকে মুখ করে একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন শুধু। তার চোখ বড়ো বড়ো হয়ে উঠেছে। কোনো অনুভূতি, কিংবা ভাবের প্রকাশ সেখানে নেই। কিছুক্ষণ পর ব্যাপারটা আগাগোড়া হৃদয়ঙ্গম করে হঠাৎ তিনি রেগে ওঠেন। কট্‌মট্ করে তাকিয়ে বলেন, কেবল বাজে প্যানপ্যানানি। দুনিয়াটা কোন্ তালে ঘুরছে বুঝতে পারছ না!

কান্না থামিয়ে কথাগুলো শোনবার পর আবার ঝর্‌ঝর্ করে চোখের পানি ছেড়ে দেন রোকেয়াবানু। কেননা, তিনি কিছু বুঝতে পারে না, এ অপবাদ জীবনে এই প্রথম।

এপ্রিল, ১৯৫১



জলটুঙি

অবিশ্রাম, দেওয়ালঘড়িটাও শব্দ করে চলে, টক্ টক্ টক্ টক্।

সে আসবে। সে আসবে আজ রাত সাড়ে আটটায়। এই একটি সম্ভাবনা সমস্ত বাড়িটাকে গানের কলির মতো বেঁধে রেখেছে। তাই না এত সংশয়। তাই না তার অভ্যর্থনার জন্য এত কৌশল।

চারদিকে থমথমে নীরবতা। অন্ধকারের পর্দা গাছপালার আশ্রয়ে নেমে পৃথিবীকে পুরোপুরি ঢেকে ফেলতে না পারলেও, দুশ্চিন্তার কালোমেঘে একটি মানুষে মুখমণ্ডল ছায়াচ্ছন্ন। চলাফেরায় কেমন একটা সতর্ক চাঞ্চল্য। কোনো দুঃসহ স্মৃতির ভার কপালের বলিরেখাকে প্রত্যক্ষতর করে তুলেছে।

পেছন দিককার বারান্দাটা এতক্ষণ খালি ছিল। আমেনাবিবি ব্যস্তভাবে ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে ডাকলেন, রুবি, ইদিকে আয় তো মা।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে হাতমুখ ধোয়ার জন্য রাবেয়া কুয়া থেকে পানি তুলছিল। মায়ের অর্থপূর্ণ ডাক মুনতে পেয়ে চমকে উঠল। তাহলে, সময় হয়ে এসেছে কি? এখনো তো সরজমিনে রাতই হয়নি? বালতিটা গোসলখানার পাকায় রেখে খসে—যাওয়া আঁচল কোমরে ভাল করে পেঁচিয়ে সে প্রায় ছুটে গেল।

উত্তরের কামরাটা নেহাত ছোট নয়। এটাকে বলা যায় বাড়ির মধ্যমণি। জামাকাপড় থেকে শুরু করে আয়ব্যয়ের হিসেব-ধরা কাঠের সিন্দুকটা পর্যন্ত সবকিছু এ ঘরেই থাকে। ছেলেপুলেরা অভিভাবকের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে কদাচিৎ ঢুকে পড়লেও, ইঁদুরের মতো খুটখাট করতে পারে না, নীরবতাকে বজায় রেখেই বেরিয়ে আসে বুদ্ধিমানের মতো। সংসারের টুকিটাকি জিনিশপত্রও এখানেই থাকে, প্রয়োজনের সময় সেগুলো গৃহিণীর হাত দিয়ে বাইরের আলো দেখবার অধিকার পায়।

সে আসবে। মাথাটা কাত করে চৌকির নিচে ঢুকিয়ে আমেনা একটা টিনের বাক্স বার করলেন টেনে। শাড়ির প্রান্তে বাঁধা চাবির গোছাটা ধরে চট করে তালাটা খুলে ফেললেন। সাবধানী হাতের টানে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল সুন্দর শিল্পকাজ করা কয়েকটি চীনামাটির বাসন। একটি কাচের গেলাস। একটি নিমকদান। আর কয়েকটি বাটি। মেয়েকে প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, যাতো মা। এগুলি ধুয়ে আন্।

রাবেয়া দু'হাতে আসবাবগুলো আগলে ধরে বেরিয়ে গেল সাবধানে।

ঈদ গেছে গতকাল। টানাটানি নিত্যকার হলেও বছরের পবিত্র দিনটিকে উৎসবমুখর করে তোলার জন্যে আনিস মুন্সি চেষ্টার ত্রুটি করেননি। বিবির জন্যে নতুন কাপড় কিনেছেন। বাজারের সেরা না হলেও দেখতে মন্দ নয়। মেয়েটার জন্যে কিনেছেন একটা নীলপেড়ে শাড়ি। বেশ চড়া দামেই। ছোটদের জন্যে রবারের জুতো। রংচঙে টুপি। এ ছাড়া মিষ্টি, মাংস, দুধ, ফলমূলও কম পয়সা টানেনি। কিতাবে লেখা আছে, ঈদের দিনে আনন্দ কর, এখন দাঁত কামড়ে থাকলে চলে না।

এ উপলক্ষে মহল্লার একমাত্র মসজিদের মুয়াজ্জিন ও ইমাম হিসেবে তিনি দাওয়াত কম

পান না বাইরে। কোন্‌দিন কার বাসায় যাবেন তা তেলচিটাচিটে নোট বইটাতে টুকে না রাখলে জবান খেলাপ করার বিপদে পড়তে হয়। এর পাল্টা আয়োজন না করলেও চলে। তবু সামাজিকতাকে উপেক্ষা করা চলে না। তাই তিনিও পাড়াপড়শী গণ্যমান্য ব্যক্তিদের জিয়াফত করতে ছাড়েন না।

গতকাল এমনি জলসায় বাড়িটা গুলজার হয়ে উঠেছিল। ঢালা সতরঞ্চি, তার ওপর পাঁচহাতি নল-লাগানো ফর্সি হুঁকার ধোঁয়া ও আগরবাতির সুগন্ধি মিলে এমনি দেলখোশ পরিবেশে বেহেশতের হুর গেলমান থেকে রেশনের চিনি পর্যন্ত আলোচনার কোন বিষয়ই বাদ যায়নি। কিছুক্ষণ পর পর হাসির রোল উঠছিল। আর তখন মুন্সির উৎসাহের বাঁধ যেন ভেঙে গেছে, ঘন ঘন অন্দরমহলে যাওয়া-আসা ও অন্যদের ওপর বেপরোয়া হুকুম চালানোর মধ্যে তারই ফেনিলতা পড়ছিল উপচে উপচে।

আমেনাবিবি কিন্তু একেবারে উদাসীন। তাঁরই বাড়িতে এতো হৈচৈ হচ্ছে, আর তাঁর কানের মাকড়িদুটোও নড়ছে না, এ অস্বাভাবিক। মুন্সি হন্তদন্ত হয়ে এসে বললেন, সবাই এসে গেছে। আর দেরি করে লাভ নাই।

ওখানে সব সাজানো আছে। ডেগ-ডেগচি বাসনকোসন আঙুল ইশারায় দেখিয়ে পান চিবোতে লাগলেন। যেন তাঁর কিছু করার নেই। মেয়েটাকে ডেকে বললেন, রুবি। সব ঠিকঠাক করে দে তো।

তাঁর কণ্ঠস্বর ক্লান্ত। কালো ভ্রূর নিচে বেড়ালের মতো মিটমিটে চোখে একটি বক্রদৃষ্টি হেনে মুন্সি নিজেই লেগে যান কাজে। অতিথিদের প্রতি এতটুকু গাফিলতির মানে অভদ্রতা।

খাওয়াতে প্রায় দশটা বেজে গেল। বাসনপত্র বারান্দায় জড়ো করে হঠাৎ রাবেয়ার মনে হল তার ভীষণ খিদে পেয়েছে। দৌড়ে ছুটে এল মায়ের কাছে। বলল, আম্মা। অনেক রাত হয়ে গেছে।

মা বসে পান চিবোচ্ছিলেন। বললেন, এখন ওগুলি ধোয়ার দরকার নাই। ঘরের ভিতরে এনে রেখে তোন আব্বাকে খেতে দে। এর পর তোর খাওয়া সেরে শুয়ে পড়গে। সারাদিন একটানা খাটুনি, কাঁচা শরীরে কত সয়।

আপনি খাবেন না? কাপড়ের প্রান্তটা আঙুলে জড়াতে জড়াতে ও জিগগেস করল।

না।

অধিক রাত্রে বিছানায় শুয়ে মুন্সি জিগগেস করলেন, আজ ঈদ গেল। কাপড়টা পরা হয়নি কেন শুনি?

আমেনা পাশ ফিরে চুপ হয়ে রইলেন। পড়তি বয়সেও তিনি যেভাবে মান-অভিমান করেন তা কোনো সদ্য তরুণীকেও লজ্জা দিতে পারে।

কথার জওয়াব দেওয়া হচ্ছে না কেন?

না। আমি কিছু বলব না। ডুকরে কেঁদে উঠলেন আমেনা। বললেন, এই উৎসব আমার ভাল লাগছে না।

এ মনোভাবের উৎস কোথায় তা মুন্সির অজানা নয়। আর এখানে এসে তাঁর ব্যক্তিত্ব পাষাণের মত কঠোর হয়ে ওঠে, পিটপিটে চোখদুটো জ্বলতে থাকে। ব্যাপারটা মনে করতেও দারুণ বিতৃষ্ণা। বড়ো দুটো ছেলে ছিল। দু'জনেই পড়তো কলেজে। এক ক্লাশ ওপর নিচে। কত কষ্ট করে, চার পাঁচ বাড়িতে কোরান শরিফ পড়িয়ে, সংসার খরচ অনেক কেটে-ছেঁটে

যে ওদের খরচ জোগান দিতেন, তা এক পরওয়ারদেগার ছাড়া কেউ জানে না। অথচ শিক্ষিত হয়েও ওরা কতটুকু উপলব্ধি করল? কতটুকু মূল্য দিল এই ত্যাগের? না, কতকগুলো বদমায়েশ ছেলের পাল্লায় পড়ে একটা গেল জেলে, আরেকটার কোন পাত্তাই নেই। সব সময় বাড়িটার ওপর গোয়েন্দার প্রখর দৃষ্টি। এছাড়া মহল্লা-প্রধানদের উপদেশ, আর বক্রোক্তি তো আছেই। তাই ছেলেদের কথা ভেবে স্ত্রীর ঘ্যানর-ঘ্যানর তাঁর একটুকু সহ্য হয় না। একটু আভাস পেলেই গরগর করে ওঠেন।

একশ' বার বলেছি, ওদের ভাবনা ছাড়ো। যতসব কু-সন্তান পেটে ধরেছ। তোমার স্নেহের থোড়াই ধার ধারে ওরা। ওদের কথা বলতে শরম করে না?

এর বিরুদ্ধে কোন পাল্টা অভিযোগ নেই। তবু একটি আকুতি ফেনিয়ে ওঠে আমেনার মনে। বুকের পাঁজর যদি একটা একটা করে ভেঙে যেতে থাকে, তা হলে মানুষ কি করে বাঁচতে পারে? এর জবাব কোথায়? এই আকুলতা? এই অস্বস্তির? এর বিপক্ষে কোন্ অকাট্য যুক্তি দাঁড় করানো যায়? কোন্ সত্যভাষণের?

তাঁর ঠোঁটজোড়া আবেগে কাঁপতে থাকে। কথা নেই।

এমনিভাবে সময় কেটে যায়। আতঙ্ক নয়, কেমন একটা বিষণ্নতা তাঁর মুখে বাসা বাঁধে। যার প্রকাশ স্থৈর্যে। একাগ্র নীরবতায়।

রাবেয়া এসে বলল, আম্মা। বাসন ধোয়া হয়েছে।

ওগুলি কোঠার ভিতর সাজিয়ে রাখ্। আমেনা রান্নাঘরে চলে গেলেন, ব্যস্ততায়।

সে আসবে। যদিও নিজে একটু ছুঁয়েও দেখেননি, ঈদের আয়োজন থেকে অনেক কিছু তুলে রেখেছেন। কেউ জানেনা, মেয়েটি ছাড়া।

দেয়ালঘড়িটা সময়ের বুকে হাতুড়ি পিটে চলে, টক্ টক্ টক্। অবিচ্ছিন্ন শব্দ দ্রুততাল হয়ে হারিয়ে যায় ভাবনার বিস্তীর্ণ ঝড়ে, সময় প্রায় হয়ে এল। কোনো আকস্মিক বাধা পথে নেকড়ের মতো ওঁৎ পেতে থাকেনি তো? মায়ের বুক দুরুদুরু করতে থাকে।

খাবারগুলো রান্নাঘর থেকে তুলে এনে নির্জন কোঠায় রাখলেন সাজিয়ে। হারিকেনের চিমনি সাফ করেননি। জ্বলজ্বলে আলোয় কামরাটা কোন অস্বাভাবিক ঘটনার নিশ্চয়তা সৃষ্টি করেছে। এক খিলি পান মুখে ঠেসে দিয়ে আমেনা বেরিয়ে এলেন উঠোনে। অন্ধকার বেশি না হলেও, পরিচিত লোকের মুখও না-চেনার পক্ষে যথেষ্ট। তিনি একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

আওতার বাইরের রাস্তায় চটিজুতোর আওয়াজ শুনে হকচকিয়ে উঠলেন একবার। মুন্সি গেছেন দাওয়াত খেতে। এ—সময় ফেরার কথা নয়। না, শব্দটা মিলিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ বাদে একটা ছেলে প্রায় লাফিয়ে বারান্দায় উঠে ভেতরে গেল। কাছে গিয়ে আমেনা জিগগেস করলে ফিসফিসিয়ে, কি খবর?

এসেছে! সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল।

কই? আমেনা চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

ওই পেয়ারাতলায় দাঁড়িয়ে। বাসায় কেউ আছে নাকি?

না। তিনি নিচুগলায় বললেন, নিয়ে আয়। কেউ নাই।

তার চোখ ফেটে পানি এল। বাসন ঠিক করতে কাঁপতে লাগল আঙুলগুলো। লাল কেরোসিন ভরা হারিকেন। কালো ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেছে চিমনিটা। বড় অনুজ্জ্বল। বড়

নিষ্প্রভ এই আলো। ঝড় লণ্ঠনটা বাড়িতেই আছে, তা জ্বাললে সমস্ত বাড়িটা ঝল্‌মল্‌ করে উঠত। কিন্তু উপায় নেই।

দস্তরখানাটা পেতে দিলেন মাদুরের সামনের দিকে।

সে এল। আধো আলো, আধো ছায়ায় এসে দাঁড়াল। কোটের কলারটা ঘাড় অবধি খাড়া হয়ে উঠেছে খরগোসের কানের মতো। গলায় মাফলার জড়ানো। মাথায় টুপি। চওড়া কপালের নিচে চোখজোড়া চক্‌চক্‌ করছে। মুখে স্মিত হাসি। নাকের নিচে ঘন কালো গোঁফ পৌরুষকে সুস্পষ্ট করে তুলেছে। মায়ের মুখের দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে। তারপর শান্ত গলায় বলল, কেমন আছেন মা?

আমেনার মুখের সূক্ষ্ম রেখাগুলো চঞ্চল হল। কোনো কথা বেরুল না। ঝর্‌ঝর করে দু'চোখের পানি ছেড়ে দিলেন তিনি। আঁচলে তা মোছার চেষ্টাও না করে আবেগ-ভাঙা স্বরে উচ্চারণ করলে, ভাল। তুই কেমন?

ভালই। সহাস্য মুখে আলি আকবর বলল, কিন্তু আপনি কাঁদছেন যে! আমি এলাম, আমার জন্যে এতো আয়োজন করলেন— কই আনন্দিত হবেন, না এমন সময় কান্না! আপনার ছেলের মনখারাপ হয়ে যাবে বুঝতে পারছেন না?

মা কেন কাঁদে তুই বুঝবি না। স্বরে অভিমানের সুর স্পষ্ট।

রাবেয়া কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছিল। ড্যাবডেবে চোখে সে বড় ভাইকে দেখছিল। মানুষ কিভাবে বাড়ি ছেলে থাকতে পারে তা ওর মাথায় ঢোকে না। উনি বড়ো নিষ্ঠুর। এক ফোঁটা দয়ামায়া নেই। না হলে সবাইকে ফেলে কিনা লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়ান!

তাকে দেখতে পেয়ে আকবর বলর, এই যে রুবি। ছ'মাসেই অনেক বড় হয়ে গেছিস্‌। কই, খাবার টাবার দে। ভাইয়ের জন্যে পোলাও কোর্মা খুব করেছিস, না রে?

গলার স্বর নতুন ঠেকে কানে। জাববে কি বলবে ভেবে পায় না সে। শুধু ঘাড় নাড়ে।

নানা ধরণের অনুভূতিতে আমেনার ভেতরটা তোলপাড় হচ্ছিল, হঠাৎ তিনি সচেতন হয়ে উঠলেন। মাথার কাপড় ঠিক করে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটিকে বললেন, যাও তো বাবা। উঠানের দোরের কাছে দাঁড়িয়ে থাকগে। কাউকে আসতে দেখলে দৌড়ে এসে খবর দিও, কেমন?

আচ্ছা।

পাশের বাসার কেরানীর ছেলে শাজু। ভারি পাগলাটে। প্রবেশিকা উত্তীর্ণ হয়ে কেবল নিজের একগুঁয়েমিতে আর্ট ইস্কুলে ভর্তি হয়েছে। রাবেয়াকে সে ভয়ানক ভালবাসে। মায়ের বাক্স থেকে পয়সা চুরি করে চকলেট কিনে দেয়। তাকে মডেল করে ছবি আঁকতেও ছাড়ে না। সে বলে, ও হচ্ছে তার মোনালিসা। একে তো ছকি আঁকা কুফরী কাজ, তার ওপর মেয়েটার সঙ্গে অতিরিক্ত মাখামাখি, মুন্সি তাকে দু'চোখে দেখতে পারেন না।

আকবর বসল মাদুরে। সামনের বাসনে ভাপওড়া ভাত।

খেতে গিয়ে এমন এলোপাতাড়ি গ্রাস তুলতে লাগল মুখে যে, মা চুপ হয়ে থাকতে পারলেন না। বললেন, অমন করছিস কেন? ধীরে সুস্থে খা।

আর কি আছে দিন। বাসনটা চেটেপুটে খেয়ে ও বলল।

মা শঙ্কিত হলেন। খাচ্ছে, এ সুখের কথা। কিন্তু এভাবে খাওয়াটা খুব ভালো নয়। এই মাথা নিচু করে, কোনদিকে না চেয়ে গোগ্রাসে গেলা। তিনি জানেন, এভাবে যারা খায়, তারা

বাঁচে না বেশিদিন।

জিগগেস করলেন, আরো তরকারি নিবি?

নেব। আছে নাকি? অনেকদিন ঝাল খাই না।

মা বিব্রত বোধ করলেন। বললেন, আছে। তবে তিনদিন আগেকার। ওগুলি খাওয়া ঠিক হবে না! অসুখ-বিসুখ করতে পারে।

মুখে বললেও তিনি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। রান্নাঘরের কড়াইয়ে মাছের তরকারি ছিল। ওর পাতে ভাত দিয়ে একটি বাটি পূর্ণ করে আনলেন। তার ওদিকে দৃকপাত নেই। সে কেবলি খাচ্ছে। খাচ্ছে কালাজ্বরের রোগীর মতো। ক্ষিপ্রগতিতে নড়ছে হাতের পাঁচ আঙুল। ঈষৎ হলদে হয়ে যাওয়া মুখটা আরো ভারি হয়ে উঠেছে। আমেনা ছেলের মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে রইলেন।

ছোট ছেলে আনু কোঁকাচ্ছে পাশের কোঠায়। তার জ্বর। সেদিকে কারো দৃকপাত নেই। দিনরাত পড়ে থাকে বিছানায় ভেজা সলতেরমতো। বিড়বিড় করে। একটু চেতনা হলেই কাঁদে। ছ'মাস পর ভাইয়ের আগমনের খবরটা রাবেয়া চেপে রাখতে পারল না। বাহাদুরি করে ওর কানে বলে দিল।

কিছুক্ষণ পর চৌকাঠের কাছে একটা শব্দ হল। ধপাস করে। একটা কাতরানি।

আনু! মা আকুল হয়ে এগিয়ে গেলেন। তাকে কোলে তুলে নিয়ে এগিয়ে লেন, এখানে কেন এলি বাবা। ইস্ মাথাটা কেটে গেছে।

ভাইকে দেখব আমি! ভাইকে দেখব। আনু ভ্যাক্‌ভ্যাক্ করে কেঁদে উঠল। সেদিকে চেয়ে আকবরের মুখে কোন কথা জোগালো না। সে স্তব্ধ হয়ে রইল।

ঘরে বাইরে যতসব বদমাইশের রাজত্বি। এত করে বোঝালাম, ছেলেদের পড়িয়ে কাজ নেই। তা শুনল আরে কে? চুড়ি বেচ, মাদুলি বেছ— কি সোহাগ। চাকরি করবে, টাকা আনবে— কি সোহাগ। এখন হাটে ঘাটে বে-ইজ্জত হতে হয় আমাকে। অসহ্য!

আপন মনে বকতে বকতে, সামনে দুয়ার বন্ধ দেখে, পেছন দিয়ে ঘরে ঢুকলেন আনিস মুন্সি। নেমন্তন্ন বাড়িতে খাওয়া হয়নি। মজলিশের আলোচনা গড়াতে গড়াতে তার ছেলেদের কথা ওঠে, আর ওদের নিয়ে বাঁকাচোরা কথার ঘা তার কলিজায় বড়ো বিধেছে। তিনি স্থির থাকতে পারেন নি। অনেকের অনুরোধ উপেক্ষা করে বেশ ঝাঁজের সঙ্গেই চলে এসেছেন।

তাকে ঢুকতে দেখে শাজু প্রথমটায় চমকে উঠেছিল। তুমি আবার কেহে? একটু নুয়ে ওর মুখ নিরীক্ষণ করে মুন্সি বলরেন, ও যা ভেবেছিলাম। তা রাত্তির বেলায় এখানে আসা হয়েছে কেন শুনি? মতলবখানা কি? একশ বার না বলেছি, এ বাড়িতে পা দেবে না।

ও বুদ্ধি করে বললে, মানে, আমি নয়। বাবা আপনাকে ডাকতে পাঠিয়েছিলেন, তার নাকি জরুরি কথা আছে?

এখন যেতে পারব না। বলে তিনি গট্‌গট্ করে এগিয়ে গেলেন।

ঘরের ভেতর টু শব্দটি নেই। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজ করে যাচ্ছে, চুপচাপ। কেউ একটু নড়ল না। নড়ার চেষ্টাও করতে পারল না। এমনি আকস্মিক।

তাহলে এই ব্যাপার! ঈদ করানো হচ্ছে! দাওয়াত খেতে যাওয়ার জন্যে কেন এত তাড়া এখন বুঝতে পারছি। নীরবে চেয়ে থেকে হঠাৎ মুন্সি ফেটে পড়লেন, কিন্তু আর আমি সহ্য করব না, আর না।

সশব্দে ছড়িয়ে গেল বাসনপত্রগুলি। লাথির চোটে। একটা তস্তুরি ভেঙে খানখান। ভাত তরকারি ফিরনী মিলে একাকার। ক্ষিপ্তের মতো তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, একটা দানাও খেতে দেব না যাও, এক্ষুণি বেরিয়ে যাও আমার বাড়িতে থেকে। এই মুহূর্তে। না হলে ধরিয়ে দেব। যাও।

আমেনা পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন চুপ হয়ে। বাধা দিলেন না। কেঁদে উঠলেন না ডুকরে। ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন শুধু।

চিলমচির ওপর হাতমুখ ধুয়ে আকবর ধীরে সুস্থে হাত মুছল রুমালে। দাঁড়িয়ে কোটের কলারটা ঠিক করে বলল, আচ্ছা মা আসি। অমন চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? কষ্ট হচ্ছে নাকি? কিন্তু আমি তো পেট ভরেই খেয়েছি।

তুই আর আসিস না। তোর জন্যে আর লোক পাঠাব না। বিড়বিড় করলেন তিনি।

কেন আসব না? নিশ্চয় আসব। মাঝে মাঝে আপনাদের দেখতে আসব। অবশ্য যদি সময় পাই।

আমেনা হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, না। আসিস্ না। আমি মরে যাই সেও ভালো। তবু এসব দেখতে পারব না!

ফোঁপানোর মতো শব্দ করে তিনি চলে গেলেন কামরা ছেড়ে। আকবর সে মুহূর্তেই বেরিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছিল। পারল না। আব্বা মেঝের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, একটা অঙ্গারের ফুলকি যেন মস্তিষ্কের কোষ থেকে ছিটকে উঠে নিভে গেছে। কপাল কোঁচকানো। চাপা ঠোঁটের কোণ থেকে ক্রোধের চিহ্ন একেবারে মিলিয়ে যায়নি। তবু সেখানে আর বিস্ফোরণের নির্দেশ নেই। কাঁধটা ঝাঁকানি দিয়ে চলতে শুরু করে আকবর বলল, মাকে অনর্থক কষ্ট দেবেন না।

মুন্সি জবাব দিলেন না কোনো। একবার মাত্র ছেলের মুখের দিকে আড়দৃষ্টি বুলিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

সে চলে গেল। এরপর নীরবতা। সমস্ত বাড়িটাকে কে যেন কথা-না বলার সংকল্পে মুড়ে দিল। অতল স্তব্ধতার বুকে হৃৎপিন্ডের উঠতি-পড়তির মতো কেবল দেয়াল-ঘড়িটার একটানা আওয়াজ। আবহাওয়া গুমোট। জানালার বাইরে আমগাছের একটি পাতাও নড়ছে না। লালচে বাতির শিখা স্থির হয়ে জ্বলছে। এখন ঘুমোবার সময় নয়, তবু রাবেয়া গায়ে পাতলা কাঁথা টেনে শুয়ে পড়েছে। চকলেট চিবোচ্ছে। ওর কিশোরী হৃদয়ের অজস্র মূক প্রশ্ন সমস্ত বাড়ির ঠান্ডা নীরবতাকে আরো ভারি করে তুলতে থাকে কুয়াশার মতো।

কোঁকানো বন্ধ হয়েছে আনুর। এমন জ্বর, উত্তাপে কপালটা এক্ষুণি ফেটে পড়বে যেন। স্পর্শ করে আমেনা শিউরে উঠলেন। আলোটা সিথানে তেপায়য় রেখে ওর গায়ের লেপের সঙ্গে আরো একটা ভারি কাঁথা ভাঁজ করে দিলেন। আস্তে আস্তে। ও চোখ বুজে আছে। মুখটা দেখাচ্ছে বড়ো বিষণ্ন।

কপালে পট্টি দেওয়ার জন্যে একফালি শাদা কাপড় আর এক জগ পানি এনে রাখলেন টুলের ওপর। মুন্সি ছেলের শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছেন, দেখতে পাননি।

অসুখ বেড়েছে নাকি? অনেকক্ষণ জবাব না পেয়ে কপালে হাত রেখে অস্ফুট গলায় উচ্চারণ করলেন, তাইতো দেখছি।

কোনো প্রত্যুত্তর মিলল না!

ডাক্তার আমেদকে ডাকব? দিনের বেলা পথের একবার দেখা হয়েছিল। এখন বোধ হয় বাসায়ই আছেন! যাবো তার জন্যে?

আমেনা নিশ্চুপ। বড়ো এলুমেনিয়ামের তাগাড়ে পানি ঢেলে কাপড়ের টুকরোটা ভিজিয়ে নিলেন, তারপর তা দিয়ে লম্বালম্বি ঢেকে দিলেন ছেলের কপাল। ভেজা আঙুলে চোখের পাতাদুটো মুছে দিলেন আলতোভাবে। এর আগে একশ'বার তাঁকে বলেছেন ডাক্তার ডাকতে। তিনি কানও দেননি। ওসব ওষুধের ওপর তাঁর একিন নেই। ওগুলোতে থাকে মদ মেশানো। নাপাক জিনিশ। কিতাবের আয়াতে এক গেলাস পানি পড়ে দিলেই যে কোনো জটিল রোগ ভালো হয়। অবশ্য যদি আদৌ পরমায়ু থাকে। ডাক্তার না ডাকার স্বপক্ষে তিনি এসব যুক্তিই দেখিয়েছেন বারবার।

কি মুখে তালা লেগেছে নাকি? রা বেরুচ্ছে না কেন? মুন্সি দাঁত খিচিয়ে উঠলেন। বলতে লাগলেন, মরুক। মরুক গে। এটাকেও আর বাঁচিয়ে লাভ নেই। একটা গেছে জেলে, আরেকটা ফেরারী, আর এটাও বড় হয়ে কি হয় কে জানে? চোর, না ডাকাত, না বদমায়েশ! মরুক, এক্ষুণি মরে যাক।

তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন বারান্দায় এসে। নিজের কথাগুলো তঁর নিজের কানেই বাজছে। একেকবার ঝাপটা দিয়ে দিয়ে। এমনি তীক্ষ্ণ তাঁর গলা। ভেতরের সমস্ত জ্বালাকে একবারে রূপ দিতে কণ্ঠস্বর আশ্চর্য সক্ষম। মাথাটা টন্‌টন্‌ করছে, ছেলেটার মুখ এমন বিবর্ণ হয়ে গেল হঠাৎ? ঈদের দু'তিনদিন আগেকার একটি ছোট ঘটনা মনে পড়ল তার। তখন জ্বর বেশি ছিল না।সাঙ্গপাঙ্গদের সঙ্গে হৈ চৈ করছিল উঠোনে। গোলমালে তাঁর মাথা চড়ে গেল। সকাল বেলার কোরান-তেলাওয়াতটাও ঠিকমতো করতে দিল না? আনু হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছিল, বাবার উপস্থিতিতে তার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। একটি গম্ভীর ডাক। এক পা দু'পা করে কাছে যেতেই বাপ তার কানে ধরে হেঁচড়ে তুললেন বারান্দার ওপর। তারপরে গায়ের সমস্ত জোরে এমন এক বে-হিসেবী থাপ্‌পড় মারলেন যে, অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল ছেলেটা। চোখ উলটিয়ে দিল।

তমি মানুষ না আর কিছু? আমেনা ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললেন, দুধের বাচ্চাটার গায়ে হাত তুলতে একটু বাধলো না।

না। আমি জল্লাদ। মুন্সি তিরিক্ষি গলায় বললেন, আমি তিন মসে একটা হাসি দেই না, আর ও এতো হাসবে কেন? এতো হাসির খোরাক কোথেকে আসে?

সেদিন থেকে আনুর জ্বর যে বেড়েছে আর কমেনি।

ঘটনাটা ছোট হলেও নতুন করে পীড়া দিতে লাগল। কপালের দু'পাশের রগদুটো ছট্‌ছট্‌ করছে। মস্তিষ্কে কে যেন একটা একটা করে আলপিন ঢুকিয়ে দিচ্ছে। কই, আগে তো এরকম কিছু হয়নি। এমন দুর্বলতা। এমন অনুশোচনা। এসেছিল ছ'মাস পর, চেলেটা ভাল করে খেতেও পারল না।

ভূত গ্রস্তের মতো এদিক ওদিক হাঁটতে হাঁটতে মুন্সি আবার আনুর শিয়রে এসে দাঁড়ালেন, ওর জ্বরতপ্ত মলিন মুখটার দিকে চেয়ে রইলেন ঝাপসা দৃষ্টি দিয়ে।

কতক্ষণ কেটে গেল বলতে পারবেন না। ছেলেটা একবার করুণভাবে কঁকিয়ে উঠতেই আর স্থির থাকতে পারলেন না ক্ষণেকের জন্যেও। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় নামলেন। রাত তো খুব বেশি হয়নি। ডাক্তার আমেদকে এখন পাওয়া যাবে না?

অন্যমনস্কভাবে চলতে চলতে পথ ভুল করে এসে পড়লেন মসজিদের গেটের কাছে। একদল মুসল্লি দাঁড়িয়েছিলেন। তাকে দেখতে পেয়ে কাছে এসে বললেন, এই যে। আপনার জন্যেই যাচ্ছিলাম। অনেক রাত হয়ে গেল। নামাজ পড়াবেন না? সবাই বসে আছে।

ও হাঁ। খুব দেরি হয়ে গেল। মুন্সি বিড়বিড় করে বললেন, আমার একটা কাজ ছিল। জরুরি কাজ।

অজুহাত দেয়ার প্রয়োজন ছিল না। তাঁর কথাগুলি সেরকমই শোনাল। তাড়াতাড়ি পাঞ্জাবীর হাতা গুটিয়ে হাউজের পাকায় বসে অজু করতে লাগলেন। দিনে পাঁচবার অভ্যাস, সাধারণ ভুলও হবার কথা নয়। কিন্তু এ সময় এলোমেলো হয়ে গেলো সব। হাত ধোয়ার আগেই ধুয়ে ফেললেন মখ। ছের মোছার আগে পা। সেখানে লক্ষ্য করার কেউ ছিল না।

চটিজোড়াটা সিঁড়ির নিচে রেখে মিনারের ওপরে উঠরেন। মাথার ভেতরটা ভোঁ ভোঁ করছে। তা আজান দিতে হবে।

ওপর থেকে দেখা যায়, অসংখ্য জানালার আলো। ল্যাম্পপোস্টের ক্লান্ত চাউনি। আবছা অন্ধকারে স্থির হয়ে আছে ছাদের আয়তন। আর তারও ওপরে আসমান। তারায় তারায় ভরা। গোলাকার তাঁবুর ছাউনীকে বেঁধে দেয়া হয়েছে ছায়াপথের ফিতেয়। ওপরে চাঁদ নেই। সানের মিম্বরে দাঁড়িয়ে মুন্সির কণ্ঠস্বর অনেক দূরে মিলিযে গেল, আল্লাহু-আক্-বা-র।

আজানের সময় এমন মিষ্টি গলা আর কারো হয় না। এজন্যে তিনি প্রসিদ্ধ। অনেকে তাঁকে বেলালের সঙ্গে তুলনা করতেও ছাড়ে না। কিন্তু আজকের কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেছে। সে তীক্ষ্নতা, সে তেজ নেই গলায়। স্বরটা কেমন যেন গরগরে। ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে।

মাঝামাঝি এসে স্বর আর বেরুতেই চাইল না। ডানপাশ ফিরে ডাকলেন, হাই আলাস্ সালাহ্।

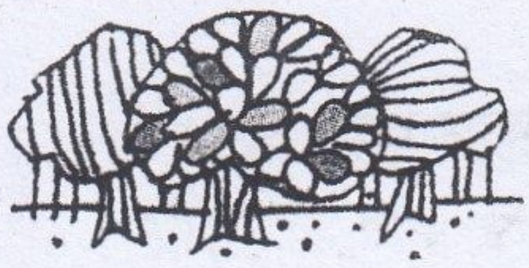
কিন্তু বাঁ পাশে ফিরতে পারলেন না। ছাদগুলি হুড়মুড় করে নড়ে উঠছে। এরপর দুলে দুলে তরঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। তারই একটা প্রচন্ড প্রবাহ এগিয়ে আসছে যেন। গোঙানির মত একটা শব্দ করে তিনি পড়ে গেলেন।

কি হল। মুসল্লিদের কয়েকজন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো।

তারা টেনে তুললেন তাঁকে। ঘাড়ে শক্তি নেই। মাথাটা ঝুলে পড়েছে। অস্ফুট যাতনায় তিনি অতিকষ্টে বলরেন, মিনারটা দুলছে। আমাকে নিচে নিয়ে চল। নিচে!

মুসল্লিরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। কিছুই বুঝতে পারলেন না। দু'পাশে দু'জনে তাঁকে আগলে ধরে সাবধানে মাটিতে নামলেন সিঁড়ি বেয়ে। পা হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে কোনমতে এসে মুন্সি ধপ্পাস করে পড়ে গেলেন বিছানায়। তাঁর মনে হল, সমস্ত বাড়িটাই দুলছে।

ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২।



ছায়ামৃগ

এমন রাত বারোটার পর কলোনীর চৌকস ছাদ চাঁদকে মাথায় নিয়ে ঝিম্ ধরে থাকে ঠাণ্ডায়। সিঁড়িতে এখন শব্দ নেই, কর্মজর্জর আধছেঁড়া জুতোর পদক্ষেপ অনেক আগেই থেমে গেছে। পায়রার খোপের মত বিচিত্র কামরাগুলো, সারাদিনের ঘরকন্নার আসবাবপত্র, টেবিল-আলনাকে একপাশে সরিয়ে রেখে, নিজেরাই কানাকানি করছে যেন রহস্যময় আত্মার উত্তাপে, ঐখানে শুয়ে আছে কারা, প্রতিদিন ঘনিষ্ঠ আশ্রয় দিয়েও কি জানবেনা তাদের পরিচয়?

এমনি প্রশ্নে হঠাৎ হাওয়ায় শাদা নরম মেঘ হয়ে মশারিটাও নড়ছে, জানালার শিক বেয়ে লাফিয়ে এসে পড়েছে যেখানে আলো, কোন স্বচ্ছ কবিতার ভাষার মতো ঝলমল করছে।

এছাড়া চারদিকে শুধু অন্ধকার, আর আবছায়া। দেয়ালের ধার ঘেঁষে অদৃশ্য কালোর কণারা ঝাঁক বেঁধে ওপরে উঠে ছড়িয়ে পড়েছে, ডুবিয়ে দিয়েছে বস্তুর চেহারাকে। কিন্তু জানালাটা এমন করে কে খুলল, চাঁদের গায়ে-পড়া ঢলঢলানি অসহ্য। রাত শুধু রাতের জন্যেই। রাত শুধু তলিয়ে যেতে, মিশে যেতে প্রকৃতির দুর্বোধ্য সত্তায়। এখানে কারো খবরদারির অধিকার নেই।

কে? কে ওখানে? কড়া নাড়ছে কে?—শেষ শব্দটা ঠোঁট থেকে ঝরে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে চোখদু'টি চট করে খুলে যায় ওসমানের, যন্ত্রচালিতের মতো বিছানায় উঠে বসে হাঁপাতে থাকে। ভুল বুঝতে পেরেও, কান্ খাড়া করে রাখে, চারদিকে নিস্তব্ধতা। সুইচ টিপবার জন্যে হাত বাড়িয়ে তার মনে পড়ে, দু'দিন ধরে কারেন্টের গোলমাল চলছে।

আলনার কাছে ওৎ পেতে আছে যেন একটা বিকট কালোমূর্তি, বালিশের নিচে থেকে টর্চটা হাতে নিয়ে মশারি একটু উলটিয়ে আলো ফেলে দেখে, না মানুষ নয়, পাশের একটা হুকে পুরানো ওভারকোটটা টাঙানো আছে। কামরার চারপাশে আলোটা দু'বার ঘুরিয়ে এনেও স্বস্তি নেই, চাদরটা গায়ে জড়িয়ে খাট থেকে নেমে আসে। একবার মনে করে, ধাক্কা দিয়ে নূরজাহানকে জাগায়, কিন্তু পরমুহূর্তে কী ভেবে সে একাই এগিয়ে যায় দরজার দিকে। এদিক ওদিক চেয়ে নিয়ে, টর্চের তীব্র আলো ফেলে আঙুল ঘষে ঘষে দেখে, ছিটকিনিটা ঠিকই আছে, খিলের দায়িত্বে কণামাত্র শৈথিল্য লক্ষ্য করা গেল না। এ বার সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে খানিকক্ষণ। একটা অস্পষ্ট শব্দের গন্ধ সে পাচ্ছে, যা একটু আগে, মুখর হয়ে উঠেছিল, এখন নেই। ঠাণ্ডা মেঝেতে কার সতর্ক পা'য়ের স্পর্শ, এখনো একেবারে বিলীন হয়ে যায়নি। আস্তে আস্তে সে পাশের কোঠায় ঢোকে, তন্ন তন্ন করে কী খোঁজে, টেবিলের ওপর এলোমেলো বইপত্র, তিনদিন ধরে যেমনটি দেখছে ঠিক তেমনটি রয়েছে। আরো কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, মাথার চুলে হাত বুলিয়ে, এরপর চলে আসে সে বিছানার কাছে। তার বুকের ভিতরটা সত্যি ঢিব্‌ঢিব্ করছে।

আবার শুতে যাবার আগে তার মনে হয়, বড্ড পিপাসা লেগেছে। গেলাসটা খুঁজে নিয়ে সে পানির কুঁজোর কাছে গিয়ে বসে। মুখের কাছে নিয়েছে তো হাতটা কেঁপে উঠল, আঙুল ছাড়িয়ে পিছলে পড়ে গেল গেলাসটা, শব্দ হল।

চোর! চোর! গুণ্ডা! মশারির ভিতরে আচমকা চেঁচিয়ে ওঠে নূরজাহান।

আহ্, চেঁচিও না! এই যে আমি! ওসমান ছুটে এসে ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দেয়, বলে, আমি পানি খেতে উঠেছিলাম।

ও তুমি! আমি ভেবেছিলাম, বুঝি চোর! নূরজাহান কিছুটা প্রকৃতস্থ হয়।

ভয় পেয়েছ নাকি? স্বাভাবিক গলায় জিগগেস করে ওসমান।

ইস্, ভয়। এতে আবার ভয় পায় নাকি কেউ!

যাক, তবু ভালো। এতক্ষণে কথা বলবার সুযোগ পেয়ে সে সজীব হয়ে উঠেছে। দাঁড়িয়ে থেকেই বলে, আজকের রাতটা যেন কেমন!

তাই বলো! লেপটা কাঁধ পর্যন্ত টেনে নিয়ে নূরজাহান বলে, তুমি কখন উঠে গেলে একটু টের পেলাম না। উঠলে তো উঠলে আমাকে ডাক দিলে কি ক্ষতি হয়ে যেত। বাতিটি একটু জ্বালাওনা লক্ষ্মিটি। মুখ না দেখলে আমি কথা বলতে পারি না!

তাই নাকি! তোমার সব কথা তো শুনি লাইট অফ্ করার পর। পকেট থেকে দেশলাই বের করে ওসমান জানায়, বেশ জ্বালাতে পারি, কিন্তু এক শর্ত।

কী!

তোমাকে উঠতে হবে।

তার মানে?

ওসমান ব্যাখ্যা করে বলে, মানে সোজা। বিছানা থেকে উঠে এসে স্টোভটা জ্বেলে গরম পানি করতে হবে। আমি এদিকে দু'টি কাপ ধুয়ে দুধ আর চিনি রাখব। তারপর তুমি—

যত রসই ফলাওনা কেন আমি এখন চা করতে পারব না। উহ্, যা ঠাণ্ডা। নূরজাহান লেপের নিচে গা ডুবিয়ে বলে, তাছাড়া এখন চা খাওয়ার মানে সারারাতের ঘুম মাটি করা।

এমনটি আরো হয়েছে অনেকবার এরপর কী করতে হয় ওসমানের তা ভালোভাবে জানা আছে। তাই সে আর কথা না বলে সুইচ টিপে দিল। কামরাটা আলোকিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে সাহস ও শক্তি ফিরে আসে। এতক্ষণ কী যেন হচ্ছিল, ঠিক বোঝা যায়নি। বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে সে নিজেকে দেখে, তার কোন পরিবর্তন হয়নি, এমনকি মাথার চুলের ভাঁজটা আগের মতোই রয়েছে। নিজেকে ফিরে পেয়েছে সে আবার। যে সোজা ঢুকে যায় মশারির ভিতরে তারপর হেঁচকাটানে লেপটা সরিয়ে দিয়ে কোলপাঁজা করে নামিয়ে আনে নূরজাহানকে। এসব ব্যাপারে শব্দ করবার মতো বোকা মেয়ে সে নয়, তবু শরীর ঝাঁকিয়ে নিজেকে মুক্ত করতে চায়। আর এমনিভাবে দু'জনেই উষ্ণ হয়ে ওঠে। আজ রাতে আর ঘুম হবে না।

চা'য়ের সরঞ্জাম জড়ো করে কাজে লেগে যায় নূরজাহান ; মুখ থেকে যখন কথা বেরিয়েছে সে জানত এরপর গড়িমসির স্থান নেই।

একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছড়াতে ছড়াতে অন্যমনস্ক হয়ে যায় ওসমান, জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। বিপরীত দিকের ব্যারাকটা অদূরই, স্তব্ধ হয়ে নিজের ছায়ার দিকে চেয়ে আছে। এতগুলো পরিবার, একটিমাত্র জানালার পর্দায় আলোর আভাস দেখা যাচ্ছে। ভিতরে যারাই থাকুক, কেন তারা রাত জাগছে কেউ বলতে পারবে না। একটা মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে তার সব রহস্যের খবর নেয়া যথেষ্ট কঠিন। নিজের পরিচয় সে জানে কতটুকু। ওসমান জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে চলে আসে।

এই নিন, পীর সাহেব! নূরজাহান বিরক্ত হয়ে উঠেছে।

দু'জনে দুটি চেয়ারে বসেছে। কাপে একটা চুমুক দিয়ে ওভারকোটটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে ওসমান। আরো দু'টি চোখ তার সঙ্গ নেয়। দু'জনেই নীরব। দু'জনকেই কে যেন চুপ করিয়ে দিয়েছে। অনেকক্ষণ পর একজন মুখ খোলে, আচ্ছা, সত্যিই তোমার মনে হয়েছিল চোর এসেছে!

হাঁ তাই, নূরজাহান জবাব দেয়, দেখলাম ট্রাংকের তালাটা কে যেন ভেঙে ফেলেছে। শাড়িদু'টি আর হারটা নিয়ে পালাচ্ছে। হাতে ছুরি, চোখ আগুনের মতো জ্বলছে তার, মুখ চিন্‌তে পারিনি।

ও জানেনা আমার মনের কথা, জানাতেও চাইনে। কিন্তু আমি জানি, লোকটার মুখ স্পষ্ট চিনতে পেরেছিলাম! চওড়া কপাল, উসকোখুসকো চুল ঠোঁট মোটা কদাকার চেহারা আরও বিশ্রী হয়ে উঠেছিল। আমি চিৎকার করে উঠেছিলাম অলংকার পত্র নিয়ে যাওয়ার সময়, দেখছিলাম ছুরির তীক্ষ্ম ফলাটা আমার দিকে লক্ষ্য করে সে এগিয়ে আসছে। আমার প্রতি তার রোখ আছে তা জানতাম, কিন্তু তবু এই মূর্তিতে হাজির হবে ভাবতে পারিনি।

পুরনো বাসাটা ছিল জঘন্য রকম। বস্তির ভিতরে আধা-ভাঙা একতলা, চুণকাম নেই, ইট আর সুর্কির গন্ধে টেকা দায়। আর সবচেয়ে অসহ্য, কলতলায় মেয়েদের ঝগড়া-ঝাটি। এমন পরিবেশে মানুষ বাস করতে পারে না।

অনেক চেষ্টা চরিত্রের পর অবশেষে কলোনীতে ঠাঁই পাওয়া গেল। ওসমান সেদিন বললে, এইবার একদিকে তুমি আর আমি, আরেকদিকে পৃথিবী। দেখি কার জয় হয়।

আমি বললাম, হবে আমাদেরই।

কি ভাবে?

তা জানিনা। কিছু না পেয়ে জবাব দিলাম, তবে তুমি এটুকু বিশ্বাস করতে পার, মেয়েদের কথা অনেক সময়ই ঠিক হয়।

ও হেসে বললে, হয়। তবে ঠিক উলটোভাবে।

কলোনীতে এসে সত্যি খুশি হলাম। মনের মতো বর, আর মনের মতো ঘর, এই তো ছিল কাম্য। মা বলতেন, ছেলেটা দেখতে শুনতে ভালো, তবে বাড়িতে কি আছে কে জানে। বাবা তো একেবারে আমলই দেননি। কিন্তু বলি, আমি কি এতই বোকা। ওর চেহারা দেখেই, ঠিক চিনতে পেরেছিলাম, বাড়িতে কিছু নাই থাকুক, ও ঠিক নিজের পথ করে নিতে পারবে। আর যদি কিছু নাই থাকল, তবে এমন দামী সুট, সোনালী ঘড়ি, টাই-জুতো কোত্থেকে আসে? ওদের কেবল বাজে গোঁ, ওরা জানতেন না, বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন সে পুরাপুরি চুকিয়ে দিত, দু'টি ভালো শাড়ি কিনে দিয়েছে, সিনেমা আর রিকশা খরচ যে কত করেছে তার হিসেব নেই। তাছাড়া ছাত্র হিশেরেও মন্দ নয়, পাশ করে বেরিয়ে এলে, মোটা মাইনের চাকরি পাবে সহজেই। আমি এত বোকা মেয়ে নই, এ সব ভেবেই না তাকে ভালোবেসেছিলাম।

রেডিওতে ও যখন স্থায়ী চাকরি পেল, তখনই বাবা-মার ভুল ভেঙেছে। এখন পেয়েছি ভালো বাসা। আমি সুখী হতে চলেছি।

কিন্তু কপালে বোধ হয় একটা ফাঁড়া ছিল, নইলে এমনটি হবে কেন? নতুন বাসায় আসার সপ্তাহ খানেক পরে একটা চিঠি এল আমার নামে, খুলে পড়লাম, প্রিয় ভাবি, প্রথমেই আমার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ করো। অভিনন্দন গ্রহণ করো তোমার সাহসিকতার জন্যে। আজকের দিনে অনেকেই হৃদয়ের মূল্য দিতে জানেনা, কেননা আমরা জীবনটাকে দেখছি ফুটো পয়সার ভিতর দিয়ে। কিন্তু তুমি মেয়েদের ওপর সে অপবাদ কাটিয়ে উঠেছ। আমার কথাগুলো হেঁয়ালি নয়, শিগগিরই যখন দেখা হবে, আরো অনেক বলব। তুমি কিন্তু বাধা দিতে পারবে না, কেমন?

জিগগেস করলাম, ছেলেটি কে?

চিঠি পড়ে ও বললে, আর বলোনা, আচ্ছা ফ্যাসাদেই পড়েছি। আমাদের পাশের বাড়ির ছেলেটি। এবারে যখন বাড়ি গিয়েছিলাম ওর মা এসে ধরে পড়লে একটু দয়া কর। ওর বাপের জমিজমা বেচে এতদূর নিয়েছি, এবারে পাশ করেছে, এখন বি, এ, পড়তে চায়। তোমার বাসায় যদি থাকতে খেতে দাও, তাহলে—

তুমি রাজি হয়ে এসেছ?

কি আর করি বলো, ভাবলাম, এমনিতেও একটা বয়-টয় রাখতে হবে। শপিং-এর কাজটা যদি ওর দ্বারা চলে যায়, তবে মন্দ কি। মুখও রইল, ক্ষতিও হল না।

কিছুটা রাগ হল। বললাম, আমার কি। তুমিই সংসার চালাও। আজকের দিনে একটা মানুষের ঠেলা কত বুঝলে হোত।

আমার খারাপ লাগছিল, এরপর আর আমাদের একাকিত্বটা থাকবে না। সে আর আমি একলা থাকব একটি বাসায়, মনের রঙে রাঙিয়ে তুলব দৈনন্দিন প্রত্যেকটি খুটিনাটি মুহূর্ত, এমনি দিনের জন্যে কত কল্পনার জাল বুনেছি। সবই ভেস্তে গেল।

সেদিন কী বার ছল বলতে পারব না। আমরা বাইরে বেরুব বলে সন্ধ্যায় তৈরি হয়েছি। এ-সময়টায় রিকসা করে বেড়াতে সত্যি আনন্দ পাওয়া যায়। বড় রাস্তায় ভিড়, হরেক-রকম শব্দ, আর দোকানগুলোর আলোর ঝক্‌মকি আমার মোটেই সহ্য হয় না, আমি ভালোবাসি রমনার জনবিরল রাস্তাগুলো। মাঠের ওপর তারায় ভরা আশমান, কোথাও বিশেষ আলো নেই, গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে মৌন হয়ে, ও কথা বলছে ফিসফিস করে আমার কানে, খোলাচুলে আঙুল বুলিয়ে আদর করছে, আমরা ভেসে চলেছি, বড় ভালো লাগে। সিঁড়ি দিয়ে নামবার আগেই মনটা ঝিম্‌ঝিম্‌ করে নিবিড় খুশিতে, নিজকে নিজের কাছেই মনে হয় অপূর্ব। কিন্তু সেদিন এ ভাবটা আর রইল না।

নিচে নেমে আসতে দেখি, একটা রিকসা এসে থেমেছে। হাতে টিনের সুটকেস, আর বগলে কম্বলের বোচকাটা নিয়ে, ওপরে উঠতে গিয়ে হঠাৎ দাঁড়াল ছেলেটা, এই যে তোমরা। আমি এসে পড়েছি। উহ্, ট্রেনের যা নবাবি চাল! ভাবি, আমাকে চিনতে পারছ না। আমি কিন্তু তোমাকে ঠিক চিনেছি।

ওসমান বললে, আমরা এখন বাইরে যাচ্ছি।

তা' যাও। আমার জায়গাটা দেখিয়ে দিলেই হল। ভেবেছিলাম, বুঝি খুঁজেই পাব না। কিন্তু রিকসাওয়ালা ব্যাটা খুব চালু। নম্বর বলতেই ঠিক নিয়ে এল!

কিছুক্ষণের জন্যে ওপরে উঠে, এরপর বাইরে বেরুলাম বটে, কিন্তু সারাক্ষণ মনের ভিতরটা ভারী হয়ে রইল। ও কথা বলল কম, আমি জবাব দিলাম আবোলতাবোল। এমন কিম্ভূতকিমাকার চেহারা আর দেখিনি, গুণ্ডার মতো দেখতে। দাঁতগুলো না-হয় দুধের মতো ফকফকে, কিন্তু মুখে যথেষ্ট ব্রণ। এসব ছেলেরা যে কোন খারাপ কাজ করতে পারে। তার আবার কি কথার বাহার, যেন সাত জন্মের কুটুম। নামটাও বিদঘুটে, হাশমত।

সাড়ে ন'টার সময় বাড়ি ফিরে দেখি, তখনো আলো জ্বলছে। ভিতরে গিয়ে বললাম, তাকে খাওয়ার কথা বলা হয়নি।

ওসমান বললে, তাইতো। আর কী হবে, খেয়েই বোধ হয় এসেছে। বিকেলের ট্রেনে কেউ না খেয়ে আসে না।

তবু যাও, জিগগেস করে এসো। বললাম, একটা ভদ্রতাও তো আছে!

ঠিক বলেছ বটে।

সে-রাত্রে হাশমত খায়নি। কেন খায়নি তার যুক্তিসংগত কারণ খোঁজবার জন্যে আমরা

প্রস্তুত ছিলাম না, আর তার মুখেও কোন অনুযোগের চিহ্ন দেখিনি। পরে দেখলাম খাওয়ার ব্যাপারে সত্যি সে একটু উদাসীন। সারাদিন না খেয়ে থাকলেও খাবার চেয়ে পাঠাবে না, খারাপ আর ভালো রান্না তার কাছে সমান, প্রশংসাও নেই, অরুচিও নেই। দেখলে গোবেচারা বলে মনে হয় না, অথচ কথা বলে নেহাৎই কম, একান্ত প্রয়োজনের সময় দু'একটা ছাড়া-ছাড়া শব্দ। কিন্তু কোন বিষয়ের ওপর একবার বলতে শুরু করলে, থামতে চায় না, অপরপক্ষকে বলবার সুযোগ দেয় না, সে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। তর্কের কোন কোন বিন্দুতে এসে উত্তেজনায় কাঁপে সে, মুখটা এমন বিশ্রি হয়ে ওঠে যে, সেদিকে চাওয়া যায় না। আমি তার কথা শুনি বটে, কিন্তু মুখ তুলে চাইনে।

আগেই বলেছি, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সে কোনদিন উৎসাহ প্রকাশ করেনি। কিন্তু একদিন তার ব্যতিক্রম হল। দশটা বাজবার আগেই জামাকাপড় পরে এসে বললে, ভাবী, চটপট দুটি খেতে দাও তো।

রান্না যে হয়নি এখনো! আমি জবাব দিলাম।

হয়নি! তা'ও তো বটে। খানিকক্ষণ চুপ হয়ে থাকার পর হাশমত বললে, কিন্তু কেন হয়নি? দশটা বাজে এতক্ষণে হয়ে যাওয়া উচিত ছিল।

উচিত ছিল মানে? আমার কণ্ঠস্বরে তীব্র ঝাঁজ।

মানে সোজা। বসে বসে সারাদিন কি কর শুনি, শাড়ি বদলান আর পাউডার মাখা, এই তো! দু'টি ভাতও সময়মতো দিতে পারো না? রাগে আমার বাক রোধ হয়ে এসেছে। আর তখনো সে বলে চলেছে, ছেলেদের ঘাড় ভাঙাই তোমাদের স্বভাব জানি, কিন্তু তা' বলে এতদূর গড়িয়ে যাওয়ার কোন মানে হয় না। মাসের মধ্যে পনেরো দিন না খেয়ে গে' ক্লাস করি।

ওর কথাগুলো এমনই আকস্মিক, এমনই ধৃষ্টতাপূর্ণ ও অপমানকর যে আমার চোখ ফেটে পানি এল।

অনেক কষ্টে নিজেকে দমিয়ে রাখলাম। এর প্রতিশোধ নিতেই হবে, কিন্তু অন্যকে জানিয়ে হৈ চৈ করে লাভ নেই।

সে এক আশ্চর্য ব্যাপার, আমার দিন রাত্রির মুহূর্তগুলো তারই ভাবনায় ভরে উঠেছে, সে কখন কামরায় আসে আর কখন বেরিয়ে যায় কাছে না গেলেও স্পষ্ট টের পাই। ওর চালচলনের প্রতিটা সূক্ষ্মতন্ত্রী আমার দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। ওর সম্বন্ধে এমন মনোযোগী হয়ে উঠলাম কেন নিজের মনের আনাচে-কানাচে হাতড়েও কোন সদুত্তর পাইনে। বাইরে থেকে কেবল বুঝতে পারি তাকে আমি অবজ্ঞা করি, সিঁড়িতে তার পা'য়ের শব্দটা পর্যন্ত গায়ে কাঁটা ফোটায়। খাবার দেয়ার ব্যাপারে সময়টা আরো বিশৃংখল হয়ে গেল, অথচ রান্না হয়ে যায় ঠিক সময়েই। ইচ্ছা করলেই দিতে পারি, কিন্তু দিইনে। আর দিলেও নতুন চাকরানি মেয়েটাকে দিয়ে পাঠাই, নিজে যাইনে।

তবু তার দিক থেকে উচ্চবাচ্য নেই। কতদিন এমনিতেই খাবার পড়ে রয়েছে, গিয়ে দেখেছি। বাইরে থেকে ফেরার পর মেয়েটা জিগগেস করলে বলেছে, খেয়ে এসেছে।

ওসমান বাসায় ছিল না। সেদিন কলেজ থেকে ফিরে আমাকে বললে, ভাবী, জানি তুমি আমাকে ঠিক আপনার বলে গ্রহণ করতে পারছ না, এ যে-কোন মানুষের খারাপ লাগবার কথা, আমারও লাগছে। কিন্তু তবু এখানে কিছুদিন থাকতেই হবে, আর যতদিন থাকব আমার প্রতি এমন উদাসীন হয়ে থাকলে চলবে কেন?

আমি কিছু বলিনি। বলবার প্রয়োজনও ছিল না হয়তো। মোট কথা, এ বিষয়ে আমি মথা ঘামাতে চাইনে। চাইনে ভাবতেও।

মনে হয়, তার চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুও আমার থেকে অনেক দূরে। কলেজের ছোকরা অনেক দেখেছি, কিন্তু এমনটি চোখে পড়েনি। ছাত্রত্বের সকল উদ্দীপনা ও সুষমাকে যেন সে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে শরীর থেকে, মন থেকে। অষ্টপ্রহর কি ভাবে তা সেই জানে, কোথায় ঘুরে বেড়ায় তার পাত্তা পাবে না কেউ। সকালে নাশতা না খেয়েই বেরিয়ে যায়, বাসায় ফেরে অধিক রাত্রিতে, যখন আমরা ঘুমোবার যোগাড় করি, কিংবা ঘুমিয়ে থাকি। চারদিক যখন নিঝ্‌ঝুম হয়ে এসেছে, তখন আস্তে আস্তে উঠে এসে দরজার ফাঁকে চাইলে দেখা যায়, মোমবাতি জ্বেলে কাগজপত্তর নাড়াচাড়া করছে, লিখছে কিংবা কিছু একটা পড়ছে। আজকাল ঘন ঘন বন্ধুবান্ধবরা যাওয়া-আসা করছে, তাদের সব কথা শোনা যায় না, তবু মাঝে মাঝে ছিটকে আসা মন্তব্য থেকে বুঝতে কষ্ট হয় না, একটা কিছু ঘটছে।

একুশে ফেব্রুয়ারি এল। সারাদিন বাইরে যেতে সাহস করিনে, রাত্রিটাও কেমন ভয়ার্ত উত্তেজনায় কাটলো। দুনিয়াতে বসবাস দায় হয়ে উঠেছে। ভাবলেই বুক ধড়ফড় করতে থাকে।

পরদিন বিকেলে বাইরে থেকে এসে ওসমান বললে, আহা, বেচারীর বোধ হয় খসম নেই!

কি হয়েছে! কোন মেয়ে মারা গেছে নাকি? আমি ব্যাকুল হয়ে জিগগেস করলাম।

মারা যায়নি, তবে কতকটা ও-রকমই! ও বললে, কি কাণ্ড দেখনা, একরাত্রে শহীদদের স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে ফেলেছে মেডিক্যালের ছেলেরা, রীতিমত মনুমেণ্ট আর কি। আর সেখানে মানুষের কি ভীড়! কেউ ফুল দিচ্ছে, কেউ কেউ পয়সা দিচ্ছে। দশটাকা-একশ' টাকার নোট পর্যন্ত ফেলেছে অনেকে, জিগগেস করে জানলাম, এগুলি নাকি আন্দোলনের কাজে লাগবে। সবচাইতে মজার ব্যাপার হল, একটা সোমত্ত মেয়ে, নারানগঞ্জ থেকে এসে, অনেক লোকের চোখের সামনে তার সোনার হারগাছিটা যখন দিল স্মৃতিস্তম্ভের গোড়ায়! মাথা খারাপ আর কি। তাই বলছিলাম, বেচারীর বোধ হয় স্বামি নেই!

জিগগেস করলাম, তোমার গুণধর ভাইটি কোথায়? কাল সকালে বেরিয়েছে—

বুঝতেই তো পারছ!

এসব কিন্তু ভালো লক্ষণ নয় বাপু, আমার ভয় করে!

ও হেসে বললে, তুমি একটি আস্ত বোকা। ঠিক ওষুধটি যখন ছাড়ব তখন দেখবে, ভয়ের কোন কারণই নেই। বুঝেছ? ভাষার জন্য রাস্তায় মরা সহজ, কিন্তু অন্যের ঘাড়ে চড়ে থাকাটা যে যথেষ্ট কঠিন তা বুঝিয়ে দিতে বেশিক্ষণ লাগে না।

ওর কথার ইংগিতটুকু ঠিক বুঝতে পারিনি, নিজেদের প্রতি অবিশ্বাস আরো বেড়ে যায়, মনে মনে। জানালায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি, রাস্তার মানুষগুলো যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে, এমনকি ছোট ছেলেমেয়েদের গতিবিধিও যথেষ্ট সন্দেহজনক। সবচেয়ে খারাপ লাগছে, বাইরে যেতে পারছিনে, একে তো আতংক, তার ওপর ট্রাফিক বন্ধ। আমার পক্ষে পা'য়ে হাঁটা অসম্ভব।

এমন ভাবে ক'টা দিন কাটলো, যেন বেঁচে নেই, আগুনের শিখার ওপর মাংসের মতো জ্বলে যাচ্ছি। চারদিকে কেবল শব্দ, বিচিত্র ধরণের শব্দ, যেগুলোর কোনো অর্থ নেই। সপ্তাহ ধরে দু'চোখের পাতা এক করতে পারিনি।

কিন্তু-সে রাত্রে কেমন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, এমন গভীর আশ্চর্য ঘুম আর ঘুমাইনি। শুয়েছিলাম দু'জনে গলাগলি করে, হয়তো দেখছিলাম কোন সুন্দর দুর্বোধ্য স্বপ্ন। এমন সময় হঠাৎ আমার চোখজোড়া খুলে গেল। বাইরে সামান্য ফর্সা হয়ে এসেছে, কিন্তু এত সকালে কে এসেছে ডাকতে। কি কাজ থাকতে পারে? এমন জোরে কড়া নাড়বার সাহসইবা পেলো কোথায়। ওকে ডেকে তুলে দু'জনেই খানিকক্ষণ বসে রইলাম। উষ্মার সঙ্গে বললাম, কার

ঘরে আগুন লেগেছে দেখ না গিয়ে!

তাইতো এত সকালে এসেছে কে? বাজে মাত্র সাড়ে চারটে—

কিছু অনুমান করতে পার না?

খাট থেকে নেমে মেঝেয় দাঁড়িয়ে ওসমান বললে, না। কিছুই তো অনুমান করতে পারছিনা।—

মিছে কথা বলেছিলাম, নূরজাহানকে, অভিনয় করেছিলাম, কেননা আমি জানতাম রাত পোহাবার আগেই কা'রা আসবে। বাইরে থেকে মনের খবর জানা মুশকিল, তাই আশেপাশের কেউ টের পায়নি, রাত এগারোটার সময় সিগারেট কিনব বলে বেরিয়েছিলাম, যদিও পকেটে কেসটা পুরোই ছিল। আসলে আমি গিয়েছিলাম রাস্তার মোড়ে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে। কাছে গিয়ে বলেছিলাম, আজ আছে।

তাহলে ঠিক রইল। আমার সিগারেটে আগুন দিয়ে নিজেও একটা ধরিয়ে ভদ্রলোক বলেছিলেন, গুড নাইট! তারাই এসেছে। খিল খুলে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জিগগেস করলাম, কি চান আপনারা? এত রাত্রে মিছিমিছি বিরক্ত করতে এসেছেন।

মিঃ ওসমান, আমি দুঃখিত, কিন্তু তবু উপায় নেই। আমার কর্তব্য পালন করতে হবে। দিন্ আলোটা। চলুন আমাদের সঙ্গে আপনার কামরাগুলা দেখিয়ে দেবেন।

এরপর যা' হবার, তাই হল। এমনিতে যথেষ্ট পাহারা, তাই হাতকড়া লাগায়নি, যাবার সময় হাশমত চোখজোড়া বড় বড় করে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল, তার চাউনি সহ্য করতে না পেরে অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। প্রথমটায় নূরজাহানের মুর্ছা যাবার যোগাড়, কিন্তু ওরা চলে যাওয়ার পর যখন ব্যাপারটা আগাগোড়া বুঝিয়ে দিলাম, ও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলে। বলল, আরে বাপস্, তোমার পেটে এত বুদ্ধি। যাক্, আপদ চলে গেল।

ও জানতনা আমি কী করেছি, তাই এই কথাটা এত সহজভাবে বলতে পেরেছিল। আমি অস্বীকার করেছি রক্তের সম্পর্ককে, একথা সে জানতনা। পাশের বাড়ির কোন পরিচিত ছেলে সে ছিলনা, সে ছিল আমার আপন মা'য়ের পেটের ভাই। নূরজাহানের কাছে আমি তার ভুল পরিচয় দিয়েছিলাম ইচ্ছা করেই। একটা মেয়ের কাছে কোন বিষয়েই আমি খাটো হতে চাইনে, আমার কোন ফাঁক তার চোখে ধরা পড়বে এও অসহ্য। যাই করেছি, তার জন্যে অবশ্য এতটুকু অনুশোচনা আমার নেই, কেননা আমি শান্তি চাই, সুখ চাই, আমি চাই জীবনটাকে উপভোগ করতে। কারো কারণে, সে যতবড় আপনজনই হোক না কেন, তা নষ্ট হবার সম্ভাবনা দেখলে, সাহসীর মতো ব্যবস্থা অবলম্বন করতেই হয়।

আর কে জানবে আমার ভিতরের খবর। এখন বাপ-মা'কে বেশ দু'কথা লেখা যাবে। কেন আমি তা'কে শহরে আনতে চাইনি।

গত নভেম্বরে যখন বাড়ি গিয়েছিলাম, মা একদিকে ডেকে নিয়ে মিন্‌মিন্ করে বলেছিলেন, বাবা, হাশমত তো এবার পাশ করল। তুমি কিছু ভাবলে?

আমি বললাম, ভাবব আবার কি। আমাকে কিছু করতে বলছেন নাকি?

না। আমি না। মা কেশে নিয়ে বললেন, তোর বাবা বলছিলেন কি, বৌমাও হয়েছে, আর বাসাও যখন করেছিস, তখন—

মা'য়ের মুখের ওপর কিছু বলতে পারলাম না, ভিতরটা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। কিসের জন্য তাদের এই অমোঘ দাবী? পড়িয়ে শুনিয়ে মানুষ করেছে, এই তো। কিন্তু মাসে বাড়ি

থেকে চল্লিশ টাকা করে পাঠালেই বুঝি সব দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়? এই টাকায় ভালো টিফিনই হবার জোগাড় ছিল না, সিগারেট আর সিনেমা বাদ দিয়েও। তারপর আছে কি, বাঁধা হোটেলের পাওনা, কাপড়চোপড়। নূরজাহানের সঙ্গে দেখা করতে গেলে, অন্যের সুট ধার করে নেয়া ছাড়া উপায় ছিল না, সব সময় তো আর চাওয়া যায় না, তাই শেষ পর্যন্ত বন্ধুর হাতে পায়ে ধ'রে নিজেরই করে নিয়েছি। বাধ্য হয়েই একটা ঘড়ি হাতসাফাই করতে হল। লজ্জার কথা, কত আর বলবো, এমন দিনও গেছে, যখন ব্লাউজের কাপড়ের টাকা যোগাড় করতে হয়েছে, কোন বন্ধুর কাছে পাঠ্যবই বিক্রি করে। এখন চাকরি পেয়েছি, আর সবাই যেন জোঁকের মতো ধরেছে। আমি কারো আত্মীয়তার ধার ধারিনে।

শুনলাম মা বলছেন, ওর কাছে কথাটা পেড়েছিলাম, কিছুই বলছেনা।

আব্বা ক্ষেপে উঠলেন। বললেন, বলবে আবার কি। হাশমত ওর সঙ্গে যাবে। ওর জন্য জমিজমা, সব বিক্রি করেছি, এ কথা তার ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করে লাভ নেই বলেই চুপ হয়ে রইলাম। কিছুদিন চালিয়ে নেয়া যাক, এরপর দেখা যাবে।

সে বাসায় আসার পর আমার হৃৎপিণ্ডটা একেকবার ছাৎ করে উঠত বিতৃষ্ণায়। এসেছে, থাকুক। কিন্তু তা'বলে তার অধিকারের সীমা ডিঙিয়ে গেলে চলবেনা। ভাই ডাকুক, আপত্তি করবনা, এমনিতেও অনেকেই ডাকে, তবে তা' একই পিতৃত্বের সম্পর্ক পর্যন্ত গড়ালে সহ্য করবনা। তার ছেঁড়া ময়লা পোশাক, আর হাড়গিলার মতো চেহারার সঙ্গে আমার কোন যোগ নেই। যদি চায়, বড়জোর একটা পুরনো শার্ট দিয়ে দিতে পারি, কিন্তু যখন-তখন আলনা থেকে আমার জামা-কাপড় নিতে পারবেনা। আমার আর তার দাঁড়াবার জমি এক নয়।

একদিন বিকেলে সে ভিতরে এসে বলল, তোমার জন্য একটি লোক অপেক্ষা করছে বৈঠকখানায়।

কে লোক? কেমন দেখতে?

তুমি গেলেই বুঝতে পারবে। হাশমত চলে গেল।

আমি পর্দা সরিয়ে ওখানে যেতেই আঁৎকে উঠলাম, এ'যে মুন্সি। নিজেকে যথাসম্ভব সংযত করে সহজ হতে চাইলাম। বললাম, এই যে মুন্সি, কেমন আছ। দেখিই না যে আজকাল, কেমন চলছে।

মুন্সি হাসল। এই হাসির অর্থ বুঝতে কষ্ট হল না আমার। নিম দাড়িতে একটু আঙুল বুলিয়ে তমিজ সহকারে ও বলল, আল্লার দুনিয়া, আল্লা চালায়। আমরা কি আর চলতে পারি? কিন্তু আপনার খবর কি তাই বলুন, ন'মাস ধরে দেখা নেই। আর ন'মাসে এই-আরে বাব্‌বা।

তোমাকে অনেক খুঁজেছি, পাইনি। যাক্, এসেছ ভালোই হয়েছে, চারদিকে কেবল কাজ আর কাজ।

আমিও তাই বলি, কাজ আর কাজ। কাজ করলে মানুষ খেয়ে বাঁচবেই। এই দেখুন, আমাকে কেউ ঠকাতে পারেনা, কেননা আমার কাজে ফাঁকি নেই। বৌয়ের গয়না বেচে রেস্টুরেণ্ট করেছি। অনেক ছেলেকে খাওয়াই, আর অনেকেই পরীক্ষা দিয়ে চলে যায়, পয়সা দেয়না। কিন্তু একদিন না একদিন ঠিক হাতের কাছে এসে যায়, এই যেমন—

যেজন্যে দিনের বেলায় রাস্তায় বেরুই না, সে আপদই এসে হাজির। মুন্সিকে শনিবারের কথা দিয়ে বিদায় করলাম। কিন্তু তখন আমার দ'কান দিয়ে ফাঁপ ছুটেছে। আমার কেমন যেন

সন্দেহ হল, ফিরে জিগগেস করলাম, বাসার ঠিকানা কি ভাবে জানল?

হাশমত শান্ত গলায় বললে আমি নিয়ে এসেছি।

তুমি নিয়ে এসেছ! আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

হ্যাঁ আমি। বাকির খাতায় নাম লিখতে গিয়ে পরিচয়টা হয়ে গেল। তাছাড়া আমাদের চেহারায় নাকি কোথায় একটা মিল আছে, মুন্সি ত তাই বলল!

চুপ করো।

আরেকটি খবর দিয়ে নিই। হাশমত নির্বিকারভাবে বলল, নূরু মিয়া আসবে শনিবারে তোমার সঙ্গে দেখা করতে। ভাত খাইয়ে দেড়শ' টাকা ছাড়তে সে রাজি নয়!

মুখের ওপর এমন কথা বলতে সাহস করলে তুমি। বেরিয়ে যাও এখান থেকে, ইডিয়েট কোথাকার, বেরিয়ে যাও!

মগজের ভিতর থেকে যেন একটি আগুনের ফুলকি ছিটকে পড়ল। বড় কড়া কথা বলে ফেলেছি, তবু আমাকে বলতেই হতো। নূরজাহান হয়তো শুনতে পায়নি, রাত্রির রান্নায় মেয়েটাকে সাহায্য করছে।

তোমার চাকরির টাকায় আমার ভাগ রয়েছে। খানিকক্ষণ চুপ হয়ে থেকে হাশমত অবিকৃত স্বরে বললে, আমি যাব না।

হারিকেনের আলোটা কেমন অনুজ্জ্বল হয়ে আসে তাদের চোখে। রাত গড়িয়ে চলেছে পরিপূর্ণ নীরবতার দিকে। চা'য়ের সরঞ্জাম গুছিয়ে রাখতে গিয়ে নূরজাহান বলে, এখনো হলনা তোমার?

আমি তো তোমার মত সরবত খাইনা, যে, ঢক্‌ঢক্ করে গিলে ফেলব। আমি চা খাই! আর তার মানেই হল, একটা চুমুক দিয়ে পাঁচ মিনিট বসে থাকা! একটু ভেবে নিয়ে ওসমান বলে ওঠে, কিন্তু আমি ভাবছি, এভাবে রাত্তির বেলা ঘুম থেকে চেঁচিয়ে উঠলে চলবে কেন? তোমার দেখছি ম্যানিয়া হতে চলেছে। আজ পর্যন্ত ক'বার এমনটি হয়েছে হিসাব রেখেছ?

ক'বার? নূরজাহান হেসে জিগগেস করে।

কমপক্ষে দশবার। ওসমান গম্ভীর হয়ে বলে, আজেবাজে ভাবনা ছেড়ে, পরিষ্কার মন নিয়ে শুলেই এমনটি আর হবে না।

চেষ্টা করে দেখা যাবে। নূরজাহান বলে, ইস, মাথাটা ফেটে যাচ্ছে, শুইগে।

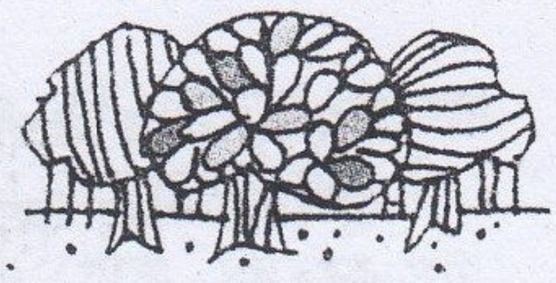
হারিকেনের সলতেটা কমিয়ে দেয়া হয়। জানালা বন্ধ, তাই বাইরে থেকে জোছনার প্রবাহ আসতে পারে না, তবু সম্পূর্ণ অন্ধকার নয়, সারা ঘরে আবছায়া। বাতি কমাবার আগে তারা পরস্পর চোখের ভাষাকে পাঠ করেছে, সেখানে ঔদাসীন্যের জড়তা নেই। হঠাৎ শীতটা যেন ভয়ংকরভাবে বেড়ে গেছে, সামান্য কাপড়ও শরীরের স্পর্শের উত্তাপকে বাধা দেয়। এরপর দু'জনেরই মনে হয়, তারা বিছানায় নেই। শূন্যের ওপর একে অন্যকে আঁকড়ে ধরেছে।

আবেশজড়িত গলায় শেষবারের মতো নূরজাহান বলে, ছিটকিনিটা দিয়ে এসেছে তো!

এর জবাবে একটা শব্দ হয়। কিন্তু তার কিছুই বোঝা যায় না, থমকে দাঁড়ানো ছায়ার ভিতরে একাকার হয়ে মিলিয়ে যায়।

ফেব্রুয়ারি ১৯৫২

অন্ধকার সিঁড়ি



এবড়ো-খেবড়ো সংকীর্ণ গলিপথে ঝকর ঝকর করতে করতে রিকশাটা যখন দোতলা বাড়িটার সামনে এসে থামল, তার অনেক আগেই দ্বিতীয়ার ক্ষীণ চাঁদ অস্তমিত হয়েছিল। আকাশের তারাও অনেক ওপরে, তাদের মিটিমিটি চাউনির আভা ধুলোমাটির কাছে পৌছায় না। আর সারি সারি বৈদ্যুতিক বাতি? এদের তেজ অবশ্য যথেষ্ট আছে, কিন্তু শহরের অধিকাংশ স্থানই আলোকিত করতে অক্ষম।

বাড়িটা নতুন, নির্মাণকার্য যে এখনও শেষ হয়নি, প্রমাণ তার কংক্রিটে ইটে নানারকম লোহলক্কড় চুনা সুর্কিতে পলেস্তরায়।

বারান্দার এক পাশে এবং ওপরের একটি কামরায় বাল্‌ব জ্বলছে, তাও নিষ্প্রভ, নেহাত সাধারণ,সায়িকভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্যই যেন।

কাজেই চারদিকটা থমকে দাঁড়ানো গাঢ় আবছায়া আবৃত, শুধু সদ্য তৈরী কাচের জানালা দিয়ে ওপরতলার আলোটাকে দেখাচ্ছে এক অজানা রহস্যের সঙকেতের মতো।

রিকশা থেকে নামলো দু'জন। মেয়েটি খুট্ করে মাটিতে পা দিয়েই অনুচ্চস্বরে উচ্চার করল, একি! সব অন্ধকার যে!

ছেলেটি পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে ব্যস্তার সঙ্গে বলল, যা। ভুল হয়ে গেল। রেজগি সব শার্টের পকেটে রয়ে গেছে। রিকশাওয়ালা, দশ টাকার নোটের ভাঙতি হবে?

খুক্‌খুক্ কাশি থামিয়ে রিকশাওয়ালা জবাব দেয়, কি যে বলেন, সায়েব। ত পয়সা থাকলে তো ভালোই ছিল।

তাহলে? ছেলেটি কি যেন ভাবল। বললে, আচ্ছা একটু দাঁড়াও। ভাঙিয়ে দিচ্ছি।

ইটের অনুচ্চ পাঁচিল-ঘেরা আনা ঢুকে পড়ে ওরা। হাবিজাবির মধ্য দিয়ে চলা, সাবধান না হলেই নয়। নিচের মাটি দেখে দেখে এক পা দু'পা করে এগিয়ে যাচ্ছে ছেলেটা। পিছনে মেয়েটি তাকে অনুসরণ করছে ঠিক ছায়ার মতো। কোনো কথা নেই। কেবল মাঝে মাঝে কাচের চুড়ির আওয়াজ। শান্ত নদীর ওপর দিয়ে বয়ে চলা মাঘের হিমজড়ানো বাতাসের মতো অনিশ্চয়ের বিচিত্র অনুভূতিতে ভরা ওর মন। এ আবার কোথায় নিলে এল ভাইয়া?

কিন্তু প্রশ্ন করে লাভ নেই। জীবনটা যার হাল ছেড়ে দেওয়া মাস্তুলভাঙা নৌকার মতো, অপরিচয়ের ভয় তার অবান্তর। কারণ হাওয়ার ঠেলা ও ঢেউয়ের ধাক্কায় কোনো না কোনো স্থানে গন্তব্য তার সুনিশ্চিত এবং সেখানকার অবস্থার মুখোমুখি হওয়ার জন্য মন তো তৈরিই আছে।

কিন্তু এও হয়তো নয়। সর্ব-রিক্ততার মধ্যে একটা শক্তি আছে, আছে মহার্ঘ সম্পদ আবিষ্কারের আত্মতৃপ্তি। কিন্তু ওর মধ্যে তার পরিচয় কোথায়? পঁচিশ বছরে যৌবনের সকল সৌকুমার্য লুপ্ত, মাজাঘষা সতর্ক প্রসাধন চেহারার শ্রী বাড়াবার বদলে একটা বিরস কঠিন্যকেই অধিকতর প্রকট করে তুলেছে। চোখ, গাল বসে যাওয়া চোয়ালে ধরা মুখটা যেন এক দীর্ঘ বিষাক্ত অন্তর্দ্বন্দ্বের ক্ষতবিক্ষত প্রতিকৃতি। কাজেই নতুন আর কি অভিজ্ঞতা মোকাবেলা করার আছে, যার আশঙ্কায় শরীর তার শির্‌শির্ করবে?

বারান্দায় বালবের অস্পষ্ট আলোয় ও থামল। জিগগেস করল, আমি দাঁড়াব?

দাঁড়াবি মানে? চল উপরে চল। ভাইয়ার কণ্ঠস্বরে এমনি একটি ঝাঁজাল নিষ্ঠুরতা, লীনা

আর আপত্তি জানাতে সাহস করল না।

কিছুদূরে বাঁক নিয়ে উঠে-যাওয়া সিঁড়িটার প্রথম ধাপের নিচে দাঁড়িয়ে পূর্বের মতোই সে আবার উচ্চারণ করে, অন্ধকার যে!

বাসায় রোজ একশ'বার উপর-নিচে ওঠানামা করিস, আর এ অন্ধকার লাগছে! তিন ধাপ ওপর থেকে কিঞ্চিৎ বিরক্তি সহকারে বলল দলিল।

বাসার সিঁড়ি তো চেনা, চলতে চলতে অভ্যেস হয়ে গেছে।

এ সিঁড়িও সে রকমই, নতুন কিছু নয়। কিসসু হবে না, তুই উঠে আয়। দলিল হাত বাড়িয়ে দিল।

লীনা আর কিছু বলল না, হাতও ধরল না, চাপা জেদের সঙ্গে শরীরটা সামান্য ঝুঁকিয়ে ধাপে ধাপে পা ফেলতে লাগল। কিন্তু তা বেশিক্ষণ নয়। কয়েকবার পা ফেলতেই অকস্মাৎ ওর মনে হল, একটা প্রবল ঝাঁকানিতে সিঁড়িটা যেন কুঁকড়ে যাচ্ছে। কংক্রিটের বেষ্টনী ধরে সে দাঁড়িযে পড়ল, নিজের অজান্তেই যেন।

একি! তোর কি হল আবার? ওপর থেকে প্রশ্ন ভেসে এল।

লীনা বুঝতে পারল, ঝিম ধরে থাকা মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গিয়েছিল ওর। চোখ বুজে আত্মস্থ হল। সে সিঁড়ির বেষ্টনীর কার্নিশ ভর দিয়ে চলতে চলতে বলল, কিছু না, পা'টা ফসকে যাচ্ছিল, চল।

ধাপের পর ধাপ, তার ওপরে ধাপ। একে একে সবগুলি ধাপকেই পেরিয়ে যেতে হবে ওপরতলায়।

অনেক দিন ত বাইরে যাসনে, আজ চলিস সন্ধ্যায়।

কোথায়? তুমিই যাও না, আমার গিয়ে কি দরকার?

আছে। কাপড় ধোয়া নেই? নীল শাড়িটাতো আছে।

তা আছে। কিন্তু যাবে কোথায়, কিছু বুঝতে পারছি না।

সে এখন বলব না, গেলেই সব বুঝতে পারবি।

কিন্তু শরীরটা ভালো নেই, কেমন বিচ্ছিরি লাগছে।

এ চেঞ্জ অব সিজনের জন্য, বেরুলেই ঠিক হয়ে যাবে।

ঠিক হয়েই তো গেছে। চলতে গিয়ে পা দুটো কেঁপে কেঁপে উঠছে, মাথাটা টলছে শরীরের গোপন কোষ থেকে বেরিয়ে কেমন একটা উৎকট ঘিনঘিনে ভাব শিরায় শিরায় যেন সঞ্চারিত হয়ে যাচ্ছে। তবু এ আর বেশি কথা কি; দাঁতে দাঁত চেপে চুপচাপ সহ্য করে নিলেই হল। সিঁড়ির বাঁকে সমতল জায়গাটায় দাঁড়াল লীনা। কয়টি ধাপ পেরিয়ে আসতেই এত ক্লান্তি, সামনে যে আরো অর্ধেক বাকি। আর দেরি করে লাভ নেই।

বুকটা ধুকধুক করছে, শুনছ? কেন এলে তুমি?

উপায় ছিল না। যার খাই তার মন জুগানো চাই।

কিন্তু ওর ভাব ভালো নয়, ঠাহর করতে পারছ না?

পারছি। কিন্তু তাতে আমার কিছু যায় আসে না, কারণ—

থামলে কেন বল। নিজের বিচারে সাহস নেই বুঝি?

সাহস নেই বলছ কি? আমি না তোমার বহু চেনা?

তাইতো বলতে পারছি, সেই লীনা বেঁচে নেই।

সিঁড়ির শেষ ধাপটা পেরিয়ে যেতে লীনার ঠোঁটের কোণায় একটু করুণ ম্লান হাসি ফুটে উঠল। বিবেকের দাপট এত বেশি।

চোখ তুলে দেখে সামনের কামরাটার ভিতরেই আলো। কপাট দুটো খোলা, কিন্তু অদূরে খড়খড়ি মতো কাঠের ঝাঁপের আড়াল। ওপাশে কে আছে?

এইটুকুই রহস্য। কোথায় যাচ্ছে, কি বৃত্তান্ত, আগে থেকে তা জানলেও হয়তো আপত্তির কিছু থাকত না, কিন্তু দলিলের ঐ বিশ্রী স্বভাব, একটা অনাবশ্যক চাপা জটিলতার মধ্য দিয়ে কাজ করা,সব ব্যাপারেই তার পরিচয় তো থাকা চাই। কথা বাড়ালে আবার মেজাজ দেখানো। তবু মেয়ে মানুষের মন সবজান্তা। কাজেই, না বললেও তার ব্যবহারের গোপন উৎসটি নির্ভুল অনুমানে খুঁজে নিতে লীনার এতটুকু বেগ পেতে হয় না। একটি চাকরির জন্য দরখাস্ত করেছে দলির এবং আজকাল তারই তদবিরে আছে, বোনকে সঙ্গে নিয়ে এই অপরিচিত জায়গায় হানা দেওয়ার সঙ্গে এর যোগসূত্র আছে বলেই লীনার নিশ্চিত ধারণা। করুণা হয় তার জন্য, সেইজন্যই সে প্রতিবাদ করে না। তবু এ কী রকম ছেলেমানুষি? ও কি পণ্যা? ওর মরচে-ধরা রূপ-যৌবন পরপুরুষের মন ভোলাতে কতটুকু সক্ষম? কিন্তু অন্ধকারে পথ খুঁজে মরা দলিল হয়তো ভেবেছে, মেয়েমানুষ, অবিবাহিত, তরুণী— এই যথেষ্ট। বোকা আর কাকে বলে!

এগিয়ে গিয়ে একটু ইতস্ত করার পর তালা লাগানোর আংটাটি ধরে দলির নাড়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে গম্ভীর মোটা গলার প্রশ্ন, কে?

মে আই কাম ইন স্যার?

ইয়ে— স।

ঘাড়ের কাছে কলারটা টেনে লীনাকে একটু দাঁড়াবার ইঙ্গিত করে দলিল কামরার ভিতরে গেল। বলল, আদাব স্যার।

রিকশাওয়ালা অনেকক্ষণ ধরে বেল বাজিয়ে বিরক্ত হয়েছিল। এবারে সে দালানের কাছে এসে ডাক দিল, কই গেলেন সাব?

বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াবার পর ছায়াপথ নীহারিকা তারাভরা আকাশের পানে চেয়ে চুপচাপ কী ভাবছে লীনা? কোনো নিগূঢ় তত্ত্ব? হালকা স্মৃতির রোমন্থন, অথবা নিবিষ্ট চোখ উচিয়ে শুধুই চেয়ে থাকা? অনেক সময় মনের হদিস নিজেরই পাওয়া ভার, অন্যের তো কথাই নেই। কত বিনিদ্র রজনী কেটেছে, সুদূরের আলোর বিন্দুতে তারই ইতিহাস কি লেখা আছে? হয়তো আছে হয়তো নাই, কে জানে। আসলে প্রতিদিনকার অতিচেনা জনও এক একটি রহস্যের দ্বীপ, বাইরের পরিচয় আর ভিতরের রূপে কত পার্থক্য। সমাজের চোখে তার যে ইতিহাস লিখিত হয়, সেতো নেহাত আংশিক, অসম্পূর্ণ, অকিঞ্চিৎকর।

লীনা, লীনা। ডাকতে ডাকতে দলিল বেরিয়ে এল। লীনা এগিয়ে যেতেই বলর, চল্ ভিতরে চল্, একটু বসবি।—

লীনা কোনো আপত্তি জানাল না, কিন্তু সে টের পেল, এ পায় সামনে ফেলতেই তার নাড়ী একটু দ্রুত চলতে শুরু করেছে।

এই আমার বোন লীনা স্যার। সবুর সাহেব ভদ্রতা করে উঠে দাঁড়ালেন। দলির বলল, তুই একটু বস, আলাপ কর, কেমন? আমি রিকশাভাড়াটা দিয়ে আসি।

আশ্চর্য ছলনা। লীনা যেন খুকী, নাকে দুধ খায়, দুনিয়ার হালচাল কিছুই বুঝতে পারে না। অন্যসময় হলে সে হেসে উঠত, ধারালো ব্যঙ্গের হাসি, কিন্তু এখন শুধু সে আর একটু সহজ হওয়ার ভঙ্গিতে নড়েচড়ে বসল গদি বসানো চেয়ারটায়। লজ্জা নয়, একটি উদ্ভট অস্বস্তিকর জড়তা, তবু সে মুখ তুলে চাইল এক সময়। কত বয়েস হবে ভদ্রলোকের? পঁয়ত্রিশ? চল্লিশও হতে পারে। তবে চেহারায় অপূর্ব জৌলুস। পালিশ করে আঁচড়ানো

টেরিকাটা মাথা, ঘাড়খানা মোটা! গোলগাল মুখে চোখদুটি মার্বেলের মতো, তবে এখন অচঞ্চল, ঘোর ধরা। কি শুধোচ্ছেন ইনি, কি বলছেন? খ্যাশ্‌খ্যাশ্‌ গলার স্বর, ঠোঁটদুটো ওঠা-নামা করছে না? কিন্তু একি, বাতাসে এ কিসের গন্ধ, টক টক, ভোটকা, মাতাল-মাতাল। কথা বলার সঙ্গে তা ভদ্রলোকের মুখ থেকেই উদগীর্ণ হচ্ছে নাকি? লীনা অনভব করল, পাকস্থলীর একেবারে তলা থেকে ভো সাপের মতো কি একটা গলনালীর মধ্যে উঠে আসছে ওর। সে প্রাণপণে ঢোক গিলল, অসহায় বিমূঢ়ের মতো। ভদ্রলোক তার কালো গোঁফে তা দিয়ে হাসছেন না মিটিমিটি? এরপরে কি করবেন? তার চাহনিটা খারাপ।

রাস্তায় নেমে এসে দেরি হওয়া কৈফিয়তের বদলে রিকশাওয়ালাকে একটা ধমক দিল দলিল। তাচ্ছিল্যভরে আধুলিটা ওর হাতে ফেলে বলল, তোমার পয়সা নিয়ে পালাচ্ছিলাম নাকি হে। অত যে চেঁচামেচি করলে।

রিকশাওয়ালা নতুন এবং গাঁয়ের গন্ধ এখনো তার শরীরে আছে। কাজেই পেটের ভিতরে নিজের কথাগুলি ঘুষ-ঘুষ করতে থাকলেও সে বিমেষ উচ্চবাচ্য করল না। গাড়িটা টেনে নিয়ে ফিরে চলল।

এদিকে নিজের বুদ্ধির বহর দেখে দলিল নিজেই তাজ্জব। কি সুন্দর কায়দা। এক ঢিলে দুই পাখি মারা। সাফল্যের উত্তেজনায় সে বাতাসে একটা ঘুসি মারল। যখন তখন পকেটে দশ টাকার নোট যদি থাকত তা হলে কি যার-তার পিছনে এমন কুত্তার মতো ফ্যা ফ্যা করে ফেরা? আসলে এও একটি চাল, কূটনৈতিক চালও বলা যেতে পারে। ভদ্রতার মধ্য দিয়ে এমন একটা সুযোগ সৃষ্টি করা গেল, কাজ হাসেলের জন্য যা অপরিহার্য। কিন্তু কিছু সময় নষ্ট করা চাই, অন্তত আধঘন্টা। এর মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে।

দক্ষিণ দিকের রাস্তাটা ধরে গলির মুখ পর্যন্ত গেলে পান-সিগারেটের দোকান মেলে। আশা-নিরাশার মুহূর্ত, এখন একটু ধূমপান করলে মন্দ হয় না। শাসন ব্যবস্থাটা একটা বহু খোপওয়ালা জালের মত জটিল, কিন্তু অমোঘ। সুতোর ঢিক জায়গাটায় ধরে টান দিতে পারলে হাতে হাতে ফল লাভ অবশ্যম্ভাবী। নইলে শত যোগ্যতা থাক, মাথা খুঁড়ে পড়েছে নাকি আড়ই হাজার। কান্ডটা রীতিমত লোমহর্ষক বৈকি। বাঁ হাত নাড়াচাড়ার খানিকটা সুবিধে থাকলেই ভেড়ার পালের মতো সব্বাই এক জায়গায় এসে ভিড় করবে, একি একটা কাজের কথা হল।

কিন্তু খেয়েদেয়ে কামাই ঝি বাঁচলে জামাই। সাতপাঁচ না ভেবে নিজের চরকায় তেল দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

অন্যমনস্কভাবে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে গলির মুখ থেকে ফিরে আসে দলিল। সময়টা এত মন্থরগতি কেন?

না একেই বলে উন্নতি। দিনের পর দিন পিষ্ট হয়ে ধুঁকে ধুঁকে নয়, একেবারে সা সা করে উঠে যাওয়া, আরব্য উপন্যাসের আবু হোসেনের কাহিনীও হয়তো এমন চমকপ্রদ নয়। একই এলাকার লোক। অনেক দিন দেশের বাড়ি ছেড়ে দিলেও বাবার সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয় ছিল। কত দেখা গেছে। কম পয়সার চা-খানা হোটেলে রাস্তার ধারে, ময়লা কাপড়-চোপড়, চামড়ার হ্যান্ড ব্যাগ হাতে হন্নে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, রোদে পোড়া ঘামে ভেজা চেহারা। হঠাৎ একদিন তাকে দেখা গেল সাইকেলে। এইটে নিশ্চয় লক্ষযোগ্য নয়। কিছুদিন পরে মোটর সাইকেলে, তারও দাম আর কত? এই মধ্যে খবরের কাগজে কালো শেরোয়ানী পরা ছবি ছাপা হল। বিপুল ভোটাধিক্যে পরিষদ প্রতিনিধি হয়ে ফিরেছেন। অতঃপর চকচকে অস্টিন গাড়ি এবং হাল ফ্যাশনের বাড়ির ত প্রয়োজনই। এখন ওপর মহলে তার মতো ক্ষমতাবান লোক খুব কমই আছে। তিনি কল নন, কল চালাবার কলকাঠি। কিন্তু মিছিমিছি বাড়িয়ে বললে কি হবে, যে

বিবরণ সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয় তা একান্তই অশ্রদ্ধেয়।

আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার একটা কথা অবশ্য আছে; কিন্তু সে আঙুলও আকাশ থেকে পড়ে না।

আসলে যে নাচতে জানে তার কাছে উঠোন সব সময়েই সোজা। অন্যে যত নিন্দেই করুক, উনি করিৎকর্মা, প্রতিভাবান লোক, তাই লোহাকে কেমন করে সোনা করতে হয় সে কৌশল তাঁর জানা আছে। অমন লেকচার ক'জনে করতে পারে? কথাগুলি তার কথা নয়, আগুনের হলকা, বিদ্যুৎ তরঙ্গের মতো মানুষের শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হয়ে যায়, পাগলা-করা, উদ্দীপ্ত। এ যেন এক অলৌকিক সম্মোহন, শুনতে শুনতে লোকে কখনও জিগির দিয়ে উঠে জিন্দাবাদ, জয় হোক, তা ওরা বলতে পারবে না। কাজেই তাঁর সামনে গেলে দলিলের যে এত বিনয় তা অনর্থক নয়।

মুশকিল, দশ টাকার ভাঙতির জন্য প্রায় এক মাইল হাঁটতে হল। গলাঝাড়া দেওয়ার পর কামরায় ঢুকে কাঁচুমাচু করে একপাশে দাঁড়াল দলিল। এরপর হঠাৎ যেন মনে পড়েছে এমনি ভাবে বলর, ও সেদিন পল্টন ময়দানে ফাইন বলেছেন স্যার। একেবারে খাঁটি কথা। দুর্নীতিপরায়ণ বিজিনেসম্যান ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার্সদের শায়েস্তা করতে না পারলে দেশের মঙ্গল নেই। এদেরকে নির্মমভাবে নির্মূল করতে হবে। লোকে খুব এ্যাপ্রিসিয়েট করেছে আপনার বক্তৃতা।

এতক্ষণ সময়টা যেন বরফের মতো কুচি কুচি হয়ে ছড়িয়েছিল তাদের চারপাশে, ওপরে, নিচে অদৃশ্য ঠান্ডা। ওরাও কিবসেই ছিল পাথরের মূর্তির মতো? মনে হয় তাই। কারণ কোথাও পরিবর্তনের সামান্য চিহ্ন নেই। ভিতরে ভিতরে খানিকটা উদ্বিগ্ন হয়ে দলিল মনোযোগের সঙ্গে চাইতেই দেখল তার কথায় সাহেবের মুখে ক্রমে প্রসন্নতা ফুটে উঠছে। টেবিলের ফাইলের ওপর থেকে কেসটা তুলে নিয়ে একটা সিগারেট বার করলেন, এরপর দেশলাই ঠুকে তা ধরিয়ে শান্তস্বরে বলরৈন, দাঁড়িয়ে কেন, বসো।

সঙ্কোচরে সঙ্গে বসতে গেলে লীনা ওর মুখের দিকে পরম অসহায় কাতর দৃষ্টিতে চাইল।

দেখ আমার একটা প্রিন্সিপ্‌ল আছে এবং সে মতেই আমি কাজ করি। তাতে কে বেজার হল, কে খুশি হল, তা দেখবার দায়িত্ব আমার নয়। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে সবুর সাহেব বলরেন, আমার কাছে দেশের স্বার্থই প্রথম এবং শেষ জিনিশ। কাজেই কাউকে আমি পরোয়া করি না। সেদিন যে বক্তৃতা দিয়েছি তাতে চেনাশোনা অনেকের আঁতেই ঘা লেগেছে, আমি জানি, কিন্তু এর জন্য থোড়াই আমার ভাবনা। আমি যে প্লান দিয়েছি তা একসিকিউট করলে বাছাধনদের অনেকেই পাততাড়ি গুটাতে বাধ্য হবে। আর এসব চক্রান্তের শেষ না হলে জনসাধারণের মুক্তি নেই।

তাতো নিশ্চয়ই স্যার, তাতো নিশ্চয়ই। দেশের গরিবদের জন্য আপনার যে অবদান তা অবিস্মরণীয়।

ক্লিন এডমিনিস্ট্রেশনেব পক্ষপাতী আমি। কাজেই অন প্রিন্সিপল্ কারুর জন্য রিকমেন্ডেশন আমি করি না, কিন্তু তোমার কথা আলাদা। তোমার বাবা আমাকে বড় স্নেহ করতেন। চিঠির একটা খাম হাত বাড়িয়ে দিয়ে সবুর সাহেব বললেন, এই নাও। এইটে দিলেই হবে। আর কিছু লাগবে না।

সেদিনের কথা মনে রেখেছেন? মেনী থ্যাঙ্কস্ স্যার, মেনী থ্যাঙ্কস্। আই স্যাল রিমেইন এভার গ্রেটফুল টু ইউ। অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তির উত্তেজনায় প্রায় কাঁপতে থাকে দলিল। কয়েকদিন আগে ফোনে সে কথাটা পেড়েছিল, এত কাজের চাপেও ভুলে যাননি, সবুর সাহেব সত্যিই মহান,

কারণ এই চিঠি মানে চাকরি। আর চাকরি মানে মোটামুটি সচ্ছল জীবন।

এদিকে লীনাও কাঁপছিল, বিকারগ্রস্ত জ্বরের রোগীর মতো। অথবা হয়তো তাও নয় বরং ভূতে পাওয়ার পূর্ব লক্ষণ যেন চেহারায় ওর।

উহ্ বড্ড খারাপ লাগছে। অস্পষ্ট স্বরে আপন মনেই যেন কথাটা সে উচ্চারণ করল। এরপর ডানহাতে মাথাটা চেপে ধরে উঠে দাঁড়াল। সেই বিশ্রী ভোটকা গন্ধটা! লাল মতো পানি উঠে আসছে মুখের ভিতরে গল্‌গল্ করে, ফোয়ারার মতো। সে যদি এই মুহূর্তে কোথাও পালিয়ে যেতে পারত। কিন্তু সাধ্য নেই। সে খট্‌খট্ করে দ্রুত পদে কামরা থেকে বেরিয়ে এল।

এই যে আবার কি হল তোর? দলির ভয়ানক বিব্রত বোধ করল, কি হয়েছে ঠিক ঠাহর করতে পারল না। বলল, কিছু মনে করবেন না স্যার, ছোটবেলায় টাইফয়েড হয়েছিল, ওর মাথায় একটু ছিট আছে। পরে আবার দেখা করব, এখন আসি, আদাব।

সবুর সাহেব তাকিয়ে আছেন বিমূঢ়ের মতো, মুখটা তার থমথমে। ব্যস্তসমস্ত দলিল বারান্দায় এসে চাপা শাসনের সুরে ডাক দিল, লীনা।

কিন্তু জবাবের বদলে শোনা গেল একটা শব্দ, ওয়াক। দলিল এগিয়ে গিয়ে দেশলাই কাঠি জ্বালাল। সিঁড়ির ওপরে উবু হয়ে বসে লীনা বমি করছে।

এ আবার কি ফ্যাসাদ বাধালি। মাথার চুলে বা হাতটা রেখে ওর মুখের কাছে আলোটা উঁচিয়ে ধরে রাখল! কাঠিটা জ্বলতে জ্বলতে নিভে গেল এক সময়।

ওয়াক—! বমির আরেকটি উদ্বেগ থামিয়ে অতিকষ্টে লীনা বলল, আমাকে বাসায় নিয়ে চল জলদি।

ওর মনে হচ্ছিল বমির সঙ্গে ভিতরের নাড়িভুঁড়ি উগরে আসবে বুঝি। কিন্তু কিছু অজীর্ণ তরকারির টুকরো ও তরল পদার্থ ছাড়া বিশেষ বেরুল না।

সবুর সাহেব এসে নীরবে কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। লীনা তার পায়ের কাছের কাপড়ের ডানহাতটা খ্বারি করে কাতর স্বরে বলল, আপনি একটু দূরে সরে যান, প্লিজ একটু দূরে।

দলিল কৈফিয়ৎ দেয়ার ভঙ্গিতে বলল, কিছু মনে করবেন না স্যার, ওর মাথা ঠিক নেই। আপনার বাসায় পানি আছে?

হ্যাঁ, আছে। কুঁজোটার কাছে গেলাসও আছে একটা। ঢেলে নিয়ে এসো! সবুর সাহেবের স্বর নির্বাপিত, কিন্তু সমবেদনায় ভরা।

আরও প্রায় আধঘন্টার পর ওরা যখন রাস্তায় নেমে এল, লীনা তখন অনেকটা সুস্থ। কিন্তু শরীর দুর্বল, তার পরতে পরতে জোড়ায় জোড়ায় কিসের এক ক্লিষ্ট নিবিড় অসহায়তা। কেমন করে কি হয়ে গেল। সব যেন গোলমেলে, কোনো নিষ্ঠুর সত্যের সংকেতবাহী। রিকশার ছাদটা ঠেলে ফেলে দিয়ে সে গহীন আকাশের দিকে চাইল একবার।

দলিলের কাছেও ব্যাপারটা মনে হচ্ছে ধোঁয়াটে। সবুর সাহেব বলেছিলেন, চারদিকে কলেরা-বসন্ত, জীবাণুর ছড়াছড়ি, সাবধান না হলেসত্যি বিপদ।

এ হয়তো নয়। টেবিলের কাছে ভারাক্রান্ত মদের গন্ধের আভাস সেও পেয়েছিল, বিমেষ আমল দেয়নি। আর তাতে অমন হবারই বা কি থাকতে পারে?

সে দমে গেছে, ভয়ও পেয়েছে হয়তো। কাজেই কোনো কথা না তুলে চুপ-চাপ বসে ছিল। কিন্তু কৌতূহলের সুড়সুড়ি অসহ্য। সরাসরি শুধোতে লজ্জা, তাই আমতা-আমতাভাবে একটু ঘুরিয়ে গিগেস করল, কিরে কি বললেন উনি?

আসলে ও কি জানতে চায়, সে অনুমান শক্ত নয়। কি ঘোরালো পিচ্ছিল আঁসচে ব্যাভার! ঘেন্না হয় না?

লীনাকে চুপ হয়ে থাকতে দেখে দলিল নরম গলায় আবার বলল, কিরে কথা বলছিস না যে। রাগ করেছিস?

হু? বাতাসের স্তর ভেদ করে সম্পূর্ণ অন্য জগৎ থেকে যেন এই আনুনাসিক পাল্টা অনিশ্চিত প্রশ্ন উঠে এল, লীনার চোখমুখ অমাবস্যার মতো, মগ্ন আচ্ছন্ন অথচ স্বপ্নময়।

কি ভাবছে সে, কি ভাবছে এত? দলিল উস্‌খুস্ করে নড়েচড়ে বসে এবং এরপর পকেট থেকে বার করে একটি সিগারেট ধরাল। ও কি অভিশাপ দিচ্ছে? ঠান্ডা শীতল মর্মভেদী চাহনি দিয়ে জানাচ্ছে প্রতিবাদ? কিন্তু এক্ষেত্রে তার কতটুকু অপরাধ। বাবা হঠাৎ মরে গিয়ে সংসারে যে বিতিকিচ্ছি সৃষ্টি করে গেছেন, এতগুলি পেট নিয়ে বাঁচবার একটা উপায় খুজে বার করতে হবে তো। সবাই বলছে নির্বুদ্ধিতা। বয়স পুরো হবার পরেও অবসর না নিয়ে চাকরিতে লেগে থাকার কি মানে ছিল? বলতেন কি-না, কাজনা করলে ভালো লাগে না। যমে যারে টানে, তার এমনি নশা জমে। বাইরে থেকে দেখতে স্বাস্থ্য খারাপ না লাগলেও একদিন অপিস ফেরার পর মসজিদে নামাজ পড়তে গিয়ে সত্যই অজ্ঞান হয়ে পড়লেন এবং মাঝখানে জ্ঞান ফিরে এলেও বিছানা ছেড়ে আর উঠতে পারলেন না। অথচ যদি সঙ্গে সঙ্গে রিটায়ার করতেন খেয়েদেয়ে দেহটা ভালো থাকত, পেনশন কমিউট করিয়ে কয়েক হাজার টাকাও পেতেন। এখন কোনটাই মিলল না—না মাইনে, না পেনশন, না ক্ষতিপূরণ। এদিকে পোষ্যের সদগতির কথা বাদ, লায়েক মেয়েটাকেও বিয়ে দিয়ে যেতে পারেননি। কেন যে ওকে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত পড়িয়েছিলেন? সঙ্গতি না থাকলেও ছিল অসঙ্গত উচ্চাশা। অথচ ওর শিক্ষাটাই এখন বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একে তো আর রিকশাওয়ালার হাতে সঁপে দেওয়া যায় না? শিক্ষিত ছেলেরা যে কদাচিৎ বিয়ে করে তার শর্ত এবং মহল অন্য।

এজন্যই ও যন হাসে না, গোমড়া হয়ে থাকে তখন বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা দীর্ঘশ্বাস চেপে রাখা যায় না।

ওর দুঃখের অন্তর্লীন উৎসটির সন্ধান জানা আছে বলেই কোনো রকম সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টাও অবান্তর হয়ে দাঁড়ায়।

তবে লীনার দুঃখের উৎস কি? তপ্ত সরোবর দেখে খর সূর্যকে মনে পড়া স্বাভাবিক, কিন্তু তার একেবারে তলদেশে, না তলদেশ ছাড়িয়ে গূঢ় অন্তঃস্থলে লুক্কায়িত স্বয়ংবহ্ উষ্ণ প্রস্রবণের অস্তিত্বকে কয়জন আবিষ্কার করতে পারে? তার এতটুকু উষ্ণতাও কি ঢেউয়ের মুখে বলকে বলকে ওঠে না? কেউ জানবে না সেই ইহিাস, যা তমসার মতো, রক্তের মতো। যে বাতাসে এত নিঃশ্বাস পড়েছে, তাও হয়তো কাছেভিতে নেই, এখনো পুরনো বাড়ির জরাজীর্ণ জড় পদার্থের কিছু বা শুধু সাক্ষী।

কিন্তু সত্য কখনো এত সহজে হার মানে না, সতর্কতার সহস্র বর্ম ভেদ করে কোনো না কোন সময় বিষফোঁড়ার মতো আত্মপ্রকাশ করে, অনিবার্য।

আলোটা কমিয়ে আড়াল করে রাখা, দক্ষিণের নিজের ছোট কামরায় বিছানার ওপর আলুথালু লুটিয়ে পড়ে এই তত্ত্বই হয়তো অবাক হয়ে ভাবচিল লীনা।

সারাপথ ভাইয়ের সঙ্গে সে কথা বলতে পারেনি, বাসায় ফিরেও মৌন মূক। রিকশা থেকে নেমে সরাসরি ওপরে গিয়ে যে শুয়েছিল, ওঠেনি এখনও। মাঝখানে ছোট বোন মিনি এলে স্নিগ্ধস্বরে বলেছে, আমি খাব'নারে আজ, শরীরটা ভালো লাগছে না। ছোটদেরকে খাইয়ে ফেলগে, যা।

চিররুগ্ন মা'য়ের কাশি থেমেছে, এখন হয়তো কেউ জেগে নেই। খানিকক্ষণ পর দেয়ালঘড়িতে বারোটা বাজল। বালিশে চুল ছড়ানো, চিৎ হয়ে শুয়ে লীনা চোখ মেয়ে আছে।

নিচের মাটি থেকে ওপরে উঠে এসেছে আমগাছটা, তার শাখা-প্রশাখা জানলার কাছে। গুটি গুটি বোল ধরেছে আমগাছে, কত বোর। সোঁদা সোঁদা। দিগন্তের দরোজা খুলে গিয়ে বল্গাহারা চৈতি হাওার মাতামাতি শুরু হল। তা এখনো দূরন্ত। আমের থোকা থোকা পাতায় পাতায় সরসর দাপাদাপি। বোলগুলি ঝরে পড়বে না? বাতাসের তোড়ে একটি সবুজ পাতা ছিঁড়ে এসে পড়ল ওর বুকের ওপর, সঙ্গে সঙ্গে সে তা হাতে তুলে নিল। বুলাল ঠোঁটে, নাকে চোখের পাতায়।

একটা যখন বাজল, বিছানা থেকে নেমে এল লীনা, আলো বাড়িয়ে বাতিটা তুলে আনল। এখন আর কেউ জেগে নেই তো? নিশ্চয়ই নেই।

দেয়ালের কাছে পুরনো ড্রেসিং টেবিলটার সামনে দাঁড়িয়ে সে একে একে শরীরের কাপড় খুলতে লাগল। এমন নির্মমভাবে কিসের চিহ্ন সে খোঁজে?

না, না। সব লক্ষ একেবারে স্পষ্ট। চাবি ঘুরিয়ে হারিকেনটা হঠাৎ নিভিয়ে ফেলেঅস্ফুট আর্তনাদের সঙ্গে দু'হাতে মুখ ঢেকে সে মঝের উপর বসে পড়ল।

একি পাপ? ভয়ঙ্কর পাপ? কিন্তু যে নিয়মে প্রেরিত পুরুষেরা মর্তের ধুলোয় জন্মগ্রহণ করেন, এখানেও তো তার এতটুকু রদবদল হয়নি।

ঢং। ঢং। ঢং। রাত তিনটে বেজেছে। মগ্নতার ঘোর কাটিয়ে লীনা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। কি সুন্দর আশ্চর্য উধাও হওয়া রাত আজ। চারধারে শুধু কানাকানি, শুধু বিহ্বলতা। রাতের আকাশের নিচে বহু বিস্তৃত নীল নীল সমুদের ঢেউ তীরে গিয়ে আছড়ে পড়ার মতো এক দুবার ফেনিল উচ্ছলতা। এমন রাতে খুলে যায় আদিম চেতনার সিংহদ্বার, কামনার দল মেলে পদ্মের মতো। মানুষ শুধু বাহিরটা দেখে, কাজেই করুণ করতে বাধে না তাঁদের। কিন্তু নীলা জানে এতটুকু জীবন তার কত মহার্ঘ সম্পদের ভরা। এমনি অনেক রাতে সে পেয়েছে প্রেম, দুর্লভ প্রেম, সোনার হরি। কত অজস্র বাঁধ-না মানা বন্য চুম্বন আলিঙ্গনের স্বর্গীয় সুধায় ভরে পরিপূর্ণ হয়ে আছে তার এমনি রাতের মুহূর্তগুলি।

কিন্তু তিনটে বেজে গেল অনেকক্ষণ, সে তো এল না এখনো, দরজায় টোকা দিল না? বাড়ি থেকে ফিরেছে কাল। দিনের বেলায় একবারও দেখা হয়নি। কি হয়েছে ওর?

পরনের কাপড়চোপড় ঠিক করার পর লীনা সন্তর্পণে খিলটা খুলল। বেরিয়ে এসে আবার কপাটদুটো ভালো মতো ভেজিয়ে শিকল লাগাল। খানিক দূর এগুলেই নিচে নামবার সিঁড়ি। খালি পায়ে আস্তে আস্তে হেঁটে এসে সেখানে একটু দাঁড়াল।

ছি ছি, এ কি করলেন আপনি। বিশ্বাসের এই মূল্য।

বিশ্বাসঘাতকতা তো করিনি, মন চাইল তাই।

মন অনেক কিছুই চায়, সব দেখলে চলবে কেন?

কিন্তু ভীরুতার বদলে নিজেকে পঙ্গু করতে আমি নারাজ।

তবু অন্য পক্ষটাও তো দেখতে হবে, তার ভবিষ্যৎ?

তা নষ্ট হবে না সে কথা আমি পাকাপাকি দিতে পারি।

কিন্তু আপনি জানেন, এ পথ ভার নয়, ধিকৃত।

বহু ব্যবহৃত সুর্কি ওঠা ধাপগুলির অর্ধেক ছাড়িয়ে এসে লীনা আবার একটু দাঁড়াল। মেঘলা দিনের সন্ধ্যেয় ওষ্ঠাধরে সেই প্রথম বিপ্লবের স্মৃতি এত রঙিন? ধূর সম্পর্কীয় আত্মীয়, শ্বশুরের টাকায় ডাকারি পড়ছেন, নিচের তলার কামরাটা ভাড়া নেওযার সময় কে ভেবেছিল, ওর জীবন-নাটকে ইনি প্রধান অভিনেতা হবেন? কিসের সম্মোহনে যেন বাকি ধাপগুলো সে তরতর্ করে পেরিয়ে এল।

ঘুম ঠিকই ভেঙেছিল লীনা, কিন্তু আমি বড় ক্লান্ত।

কেন? আজ বড় খাটুনি গেছে নাকি, অথবা অন্য কিছু?

হ্যাঁ, অন্য কিছু তোমার স্বর অমন কাঁপছে কেন?

সে কিছু নয়, একটা কথা বলব? ইমপরটেন্ট।

বলবে, সে আবার অনুমতি চাইতে হবে নাকি।

তুমি যে বলেছিলে কিছুই হবে না, কিন্তু হয়ে গেছে।

হয়ে গেছে! তার মানে! কথাটা বুঝতে পারছি না।

ধীরে শান্তভাবে নিম্নস্বরে লীনা বুঝিয়ে দেয়ার পর আর কোনো অস্পষ্টতা রইল না। করিম অন্ধকারে শিউরে উঠল। তার গায়ের রোমে ঘাম দেখা দিল বিন্দু বিন্দু। লীনার কাঁধের এলোচুলের রাশ থেকে হাতটা তার শিথিল হয়ে পড়ল। নিমেষ রক্তপ্রবাহ যেন হিম হয়ে গেছে।

একসিডেন্ট! আমি ডাক্তার মানুষ, আমারও অন একসিডেন্ট হল! খানিকক্ষণ চুপ হয়ে রইল করিম। এরপর হঠাৎ যেন সমাধান কুঁজে পেয়েছে এমনভাবে বলল, ঠিক আছে। কোন ভয় নেই। নষ্ট করে ফেললেই চলবে।

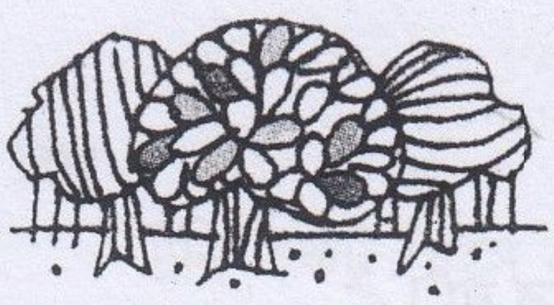
না পরিষ্কার স্থির উত্তর। অনেক ভাবনার পর পূর্ব সিদ্ধান্তেরই যেন স্পষ্ট ঘোষণা।

কিন্তু— কিন্তু আমি তো এখন তোমাকে বিয়ে করতে পারবো না! করিম ওর হাতটা সাপটে ধরে ব্যাকুলভাবে বলল, তোমাকে বলিনি বড় ছেলেটা আমার সেদিন মারা গেছে! মনটা এমনিতেই খারাপ, নতুন সমস্যায় আমাকে জড়িয়ো না লক্ষ্মীটি, লক্ষ্মীমণি!

নিমেষে লীনার দেহে যেন বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হলো। ক্ষিপ্তের মতো সে মারমুখী হয়ে উঠল। ওর শরীর আঁচড়ে, খামচিয়ে বলতে লাগল, কেন, কেন? তাহলে কেন আমাকে নষ্ট করলে তুমি, কেন?

আমার কথামতো চল, কখনো তোমাকে ফেলে পালাব না!

মিথ্যে, মিথ্যে। সব মিথ্যে। তুমি লম্পট, তোমাকে বিশ্বাস করি না। প্রাণপণে ধাক্কা মেরে তাকে ছাড়িয়ে এল লীনা, বাইরে এসে টলতে টলতে চলতে লাল। কিন্তু পারল না, বেশি দূর এগুতে পারল না। ওপরতলার ঘরে যাওয়ার সিঁড়ির প্রথম ধাপটায় পা দিতেই ধপ্ করে পড়ে গেল। একটা কাতর ধ্বনি বেরিয়ে এল মুখ থেকে। তবু জ্ঞান হারাল না, বিচিত্র দুর্বোধ্য সব অনুভূতি জাগছে। তাহলে আত্মহত্যা? মৃত্যু? কিন্তু কেন? এরপরে বাঁচার কি কোনো সার্থকতা নেই? এতবড়ো পৃথিবীটাও একটা ছোট্ট তুলতুলে শিশু আর তার মা'কে জায়গা করে দিতে একেবারেই অক্ষম?



কয়েকটি কমলালেবু

ওই খান সাহেবের গলি থেকে বেড়িয়ে সেন্ট্রাল জেলের প্রাচীর ঘেঁষে রমনার দিকে চলে যাওয়া রাস্তাটায় যখন এসে পড়ল, মুর্তাজা, হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসরির দেয়ালঘড়িটায় দেখে চারটা বাজে। প্রায় সে জোরে পা চালিয়ে দিল। সাড়ে চারটেয় হাসপাতালের দরোজা খুলে দেয়া হয় দর্শনার্থীদের জন্য, একটু আগে গেলে খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলার সুযোগ পাওয়া সম্ভব। ডান পা'য়ের স্যান্ডেলের বুড়ো আঙুলের ফিতাটা গেছে ছিঁড়ে, হাঁটতে অসুবিধা হচ্ছে, কিন্তু তবু পথচলার গতি এতটুকু কমায় না। গত রাত্রে তিনটা পর্যন্ত জেগে থাকায় চোখজোড়া লাল হয়ে আছে চশমার কাচের ভিতরে, চুলগুলো উড় উড় , গতকাল থেকে গোসল করার সুযোগ হয়নি। কাপড়চোপড় ও সারা চেহারাটা মলিন। কিন্তু ঘামে ভেজা মুখে একটা স্নিগ্ধ প্রশান্তি কেননা সে তার কথা রাখতে পেরেছে, এখন তার ডান হাতে রুমাল বাঁধা কয়েকটি তাজা কমলালেবু।

এই কমলা কয়টি যোগাড় করতে যথেষ্ট কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে তাকে। এখন সে কষ্টের কথা আর মনে নেই। ভিতরটা ঝল্‌মল্‌ করছে খুশিতে।

গত পরশু নাইট ক্লাসে কাজ করবার সময় পাশের বন্ধুর মুখে একটা নাম শুনে ও জিগগেস করছিল, সত্যি, ছাড়া পেয়েছেন?তুমি কার কাছে শুনেছ?

ছাড়া পাননি। শুধু চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে থাকবার অনুমতি পেয়েছেন। ছ'মাসের জন্যে।

অসুখটা খুব সিরিয়াস নাকি? ওর বিষণ্ন জিজ্ঞাসা।

ডাক্তাররা বলছেন বাঁচবেন কিনা সন্দেহ। পেপটিক আলসার, পাকস্থলীতে ঘা হয়েছে। এর একমাত্র রেমিডি হচ্ছে অপারেশন। কিন্তু শরীরে মোটেই রক্ত নেই, অপারেশন করবেন কি করে?

তুলিতে রং নিয়ে মুর্তাজা সাগ্রহে বলল, কাল দেখতে যাব।

পরদিন সকাল ন'টায় ও মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের দিকে চলল।

অনেকদিন তার নাম শুনে আসছে, কিংবদন্তীর মত। তাঁর সাহসের কথা ভেবে বিস্মিত হয়েছে। এখন তাঁকে দেখবার এমন সুযোগ হারানো যায় না।

এসে দেখে, তাঁর বেডের কাছে লোকের ভিড়। চার-পাঁচজন দাঁড়িয়ে আছে, আর একজন একটু ঝুঁকে কি আলাপ করছেন। দু'জনের ফাঁক দিয়ে মুর্তাজা চেয়ে দেখল, মুখটা ভীষণ ফ্যাকাশে। রক্ত নেই বললেও হয়। শরীরে হাড় কখানা সার। কোটরে বসে যাওয়া বড়ো বড়ো চোখজোড়া মেলে কথা বলছেন মৃদু গলায়।

পিছন দিকের বারান্দায় রেলিঙের কাছে গিয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। একে একে সবাই চলে যাওয়ার পর এগিয়ে এল বেডের কাছে। কোনো কথাই ওর মুখে আসে না। অথচ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকার মানে হয় না কোনো। দেখতে যখন এসেছে, দু'একটা কথা না বলে গেলে নিজের কাছেই খারাপ লাগবে। সংকোচ কাটিয়ে এক সময় সে জিগগেস করল, আপনার শরীর এখন কেমন?

ভাল নয়। মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে পড়ি।

ডাক্তার কেমন কেয়ার নিচ্ছেন?

মোটামুটি ভালই। তবে শরীর খুব দুর্বল কিনা, অপারেশন চলবে না।

একটু ভাবল, তারপর জিগগেস করল, আপনার ডায়েট কি?

কিছুই পেটে সহ্যহয় না। খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বমি হয়ে যঅয।

কিছুই খেতে পারেন না? কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন তবু যেন প্রশ্নে আশার রেশ।

কমলালেবুর রস খেতে পারি একটু একটু। উনি বললেন আস্তে করে।

আপনার কষ্ট হচ্ছে বিশ্রাম নিন। আমি কাল আসব। কথাটা বলে চলে আসার সময় মুর্তাজা দেখতে পেলে তাঁর পান্ডুর মুখে একটা করুণ ম্লান হাসি।

বাড়ি ফেরার পথে ও ভাবতে থাকে, এখন পয়সা কোথেকে জোগাড় করা যায়? হালিদু'য়েক কমলালেবু না নিয়ে যাওয়া যায় না। গতকাল রং আর তুলি কেনার জন্য বাসা থেকে দশ টাকা নিয়েছে। আব্বা কিংবা আম্মার কাছে কোন অজুহাতেই টাকার কথা আর তোলা যাবে না। ওরা রেগে উঠবেন। সংসারটা কিভাবে চরছে তার ভাবনা নেই বলে গালাগালি করবেন। অবশ্য আগে জানলে রং-তুলি কেনার টাকা থেকে কিছু বাঁচান যেত। আপাতত দু'এক রং না কিনলেই চলত।

বাসায় পৌঁছে মুর্তাজা নিজের কামরাটায় এসে ঢুকল। কোনো সময় কোথাও পয়সা রেখেছে বলে মনে পড়ে না; তবু একবার খুঁজে দেখা যাক, ভুলে হয়তো রেখেও থাকতে পারে কোনো জায়গায়।

প্রথমত সে একটা একটা করে শার্টের পকেটগুলো খুঁজতে লাগল। আশায় ওর বুক দুলছিল। হয়তো পেয়েও যেতো পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনটে ফুটো পয়সা ছাড়া কিছুই মিলল না। শার্টগুলো বিছানার ওপর ছুড়ে ফেলে টেবিলের ড্রয়ার টেনে হাতড়াতে থাকে অসহিষ্ণুর মত। কাটা পেন্সিল রবার প্যাস্টেল ছেঁড়া কাগজ সবই সেখানে আছে, শুধু একটা পয়সাও লুকিয়ে নেই। এরপর আর কি দেখবে? আরে বিছানাটা রয়েছে যে, তার মাসিক বরাদ্দ টাকা থেকে কিছু বাঁচলে বিছানাটা উলটিয়ে তা ফেলে রাখা ওর অভ্যাস। মাঝে মাঝে অনেক দিন চলে যায়, পয়সাগুলো মোটেই চোখে পড়ে না। আবার হঠাৎ কোনদিন পেয়ে যায়। পেয়ে যায় এমন সময়ে যখন এক টাকাই লাখ টাকার শামিল। তখন অমনোযোগিতার জন্যে নিজের প্রতি খুশি হয়ে ওঠে নিজেই। কিন্তু আজ কী হলো? বিছানার নিচটা একেবারে খীর। তার দরকার আছে জেনেই যেন পয়সাগুলো জোট বেঁধে পালিয়েছে।

বিরক্তিতে পানসে হয়ে যায় মুর্তাজার মুখটা। চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে নতুন কোনো উপায় উদ্ভাবনের জন্যে চিন্তা করতে থাকে। তাকে দমে গেলে চলবে না।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ সোজা হয়ে বসলো চেয়ারে। একটা ভালো বুদ্ধ খেলেছে ওর মাথায়। আজকে বাজার করার অনুমতিটা যদি কোনপ্রকারে আম্মার কাছ থেকে আদায় করতে পারে,তাহেল অতি সহজেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। সঙ্গে অন্য কাউকে না নিলেই হল।

আম্মা, আমি আজ বাজার করতে যাব। রান্নাঘরে বসে বলর, কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে।

তিনি মুখ তুলে জিগগেস করলেন, কিসের বাজার রে?

কিসের আবার। বাসার? মুর্তাজা বলর, নিজেরা বাজার না করলে ভাল খাওয়া যায় না

কি?

উনি একটু হেসে বললেন, এখন ক'টা বাজে খেয়াল আছে? এক্ষুণি খেতে বসবি, আর বাজার হয়নি কেমন করে ভাবলি?

মুর্তাজা ভাবে, তাইতো। ও হাসপাতাল থেকে আসার সময়ই যে সাড়ে দশটা বেজেছিল। আর এখন বারোটার কম নয়। আজ শুক্রবার কিনা? আর্ট ইস্কুলের সাপ্তাহিক ছুটি, তাই বুঝতে পারেনি।

ফরিদার কাছে একটু খোঁজ নিলে কেন হয়? মায়ের কাছে থেকে আসার সময় কথাটা মগজে খেলতেই মাঝখানকার কামরাটার উদ্দেশ্যে সে চলফরিদা ওর পিঠে পিঠি। এজন্যই হয়তো সামান্য কারণে ওর সঙ্গে ঝগড়া বেঁধে যায়। এখন বয়স কিছু বেড়েছে বলে ফরিদা অনেকটা গম্ভীর হয়েছে, কিন্তু তবু মনকষাকষিকে অনেক সময় ঠেকানো যায় না। ফরে এমনো হয়, চার পাঁচদিন কথা বলে না দু'জনে। মুর্তাজা ফাইনাল ইয়ারে পড়লে কী হবে, ও এখনো ছেলেমানুষ থেকে গেছে। বিমেষ করে ছোটভাইবোনদের কাছে। বয়সের দাবিতে সে ওদের কাছে মোটেই পাত্তা পায় না। গতবার একজিবিশনে অয়েল পেইন্টিং এ সে গবর্নর্স প্রাউজ পেয়েছিল, কাগজে কাগজে ছাপা হয়েছিল ওর নাম; কিন্তু ফরিদা তাকে আমলই দেয়নি।

ওর ওখানে যেতে ইতস্তত করে। ছোটবেলা থেকে তার যেমন ছিল ছবি আঁকার শখ, তেমনি ফরিদার ছিল গানের। ওর জন্যে একজন টিউটর রাখতে হছিল। এতদিনে অনুষ্টানে গান গেয়ে শহরে একটা সুনাম অর্জন করেছে। কিন্তু যত প্রশংসা করা হয়, ততটুকু পাওযার যোগ্য মোটেই নয়। সেদিন সকালে উঠে হারমোনিয়ামের সঙ্গে একটা গান রেওয়াজ করছিল ফরিদা, প্রান্তিক পরিষদের নববর্ষ দিবসে গাইতে হবে। মুর্তাজা একটা কম্পোজিশনে হাত দিয়েছিল, কাজ শুরু করার পর নতুন নতুন কল্পনা জাগতে থাকায়, তখন রীতিমত রোখ চেপে গেছে ওর। পাশের কোঠার হারমোনিয়ামের পোঁ পোঁ, ও গট্ গট্ করে এসে গলা ফাটিয়ে বলর, বন্ধ কর, বন্ধ কর। কি আমার মিষ্টি গলারে, আবার গান শেখা হচ্ছে।

রাগে ফরিদার চোখ ফেটে পানি পড়ার যোগাড়। কিন্তু এ অপমান ও নীরবে সহ্য করবে কেন? ও মাথা ঝাড়া দিয়ে বলল, করবো না, তোমার কী?

আমার কি? হারমোনিয়ামটা ছুড়ে ফেলব বাইরে।

ইস্, ফেলো তো দেখি। কেমন বুকের পাটা। রোখ করে তাকায় ফরিদা।

মুর্তাজা ভ্রূকুটি করে ফিরে যেতে যেতে বলে, ফেলে দিতে পারতাম, কিন্তু এখন ফেলব না, ছবি আঁকছি।

এমন ছবি আমি বাঁহাতে আঁক্তে পারি। ফরিদা ছাড়বার পাত্রী নয়।

সেদিন থেকে ওদের মধ্যে যে কথাবার্তা বন্ধ হয়েছে এরপর আর বোঝাপড়া হয়নি। মুর্তাজা দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে থাকে। ওর কাছে পয়সাকড়ি থাকার সম্ভাবনা অনেক। শত হলেও মেয়ে তো! ওর ইস্কুলের মাইনে ও বাসের টাকাটা বাবা নিজে দিয়ে আসেন, কাজেই সেখান থেকে হাতসাফাই করতে পারে না। কিন্তু টিফিনের পয়সা? টিফিনের জন্যে অবশ্য রোজ পাঁচ ছ' আনার বেশি পাওয়া যায় না, তবু এই পাঁ'আনার ওপর অন্য কারো হাত নেই একথা টিক। মুর্তাজার মনে হয়, টিফিনের জন্যে একটি পয়সাও খরচ করে না ফরিদা, খিদের পেটে অকেক্ষণ কাটিয়ে দিতে পারে। আর এভাবেই না সেলাইয়ের কাসকেটটা কিনেছে।

মুর্তাজা ঘরে ঢুকে ছোট টেবিলটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তার মুখে ফুটেছে তখন দেখনহাসি। এতদিন যেন ওর ওপর বিনা কারণে অন্যায় করে এসেছে। রাফ খাতায় এলজাবরার একটা সলিউশন করছিল ফরিদা, মুখ নিচু করে। কে এসেছে টের পাওয়া সত্ত্বেও চেয়ে দেখবার প্রয়োজন বোধ করলো না। মুর্তাজা তাকে খুশি করতে চায়, একটা ভালো খবর আছে ফরিদা।

ও জাবাব দেয়না কোনো। নিচু হয়ে পেনসিল দিয়ে লিখতেই থাকে।

মুর্তজা আবার বলল, একজনের মুখে তোর গানের প্রশংসা শুনলাম। খুব গুণীলোক। পারতপক্ষে কাউকে আমল দেননা। অথচ উনি আমাকে ডেকে বললেন, তোর গলার কাজ বেশ সুন্দর।

তাতে তোমার কি হয়েছে? ফরিদা ফোঁস্ করে উঠল।

তোর রাগ এখনো পড়েনি দেখছি। অজুহাত দিতে চায়। সে বলল, না হয় ভুলই করেছি। এজন্য এমনভাবে থাকতে হবে? বড় ভাইয়ের সামান্য কথাটা মাফ করতে পারছিস্ না?

ফরিদা বলর, থাক্ আর বড়ভাই ফলাতে হবে না।

আমাকে মাফ করে দে। আর শোন্, একটা জরুরি কথা আছে।

ওর খাতার ওপর হাত রেখে মুর্তাজা বলল, তোর কাছে গোটা দেড়েক টাকা হবে?

এতক্ষণ কেন ও তোয়াজ করছিল, এইবার বুঝতে পারল ফরিদা। খাড়া জবাব দিল, না!

আমার নিজের জন্য নয়। তুই বুঝতে পারছিস না কত দরকার।

মুর্তাজা টাকা চাওযার কারণটা বিশদভাবে বুঝিয়ে বলে। খুব কম সময়েই ছোটবোনের কাছে সত্য কথা কয়, কিন্তু আজকে একটি কথাও বাড়িয়ে বলল না। কথাগুলো শোনার পর রাগ-অভিমান সব ভুলে যায় ফরিদা, তার মুখে ফুটে উঠে গাম্ভীর্য। চিন্তিতভাবে বলল, কিন্তু আমি যে আজকে উল্ আনিয়ে ফেলেছি।

একটা টাকাও নেই? পানসে মুখে শুধায়, একটিও না?

ফরিদা বলল, না।

হতাশায় মুর্তাজার চেহারাটা নিভে যায়, বলল, তাহলে কি হবে? আম্মার কাছ থেকে আদায় করতে পারিস না কিছু?

কিভাবে, অনর্থক গালাগালি শুনতে পারব না। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর ফরিদা উৎসাহিত হয়ে বলল, এক কাজ করলে হয়। সুতো দিয়ে আমি যে পাখাটা তৈরি করেছি তা বিক্রি করতে পারলে—।

চশমাটা খুলে শার্টের খুট্ দিয়ে মুছতে মুছতে ভাবে মুর্তাজা। ফরিদা জিগগেস করে, পারবে তুমি?

তা চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। চিন্তিতভাবে বলল, নিশ্চয় পারব। দে পাখাটা!

মুখে বললেও মন সায় দিচ্ছে না। নকশাটা দেখতে ভালোই লাগে, সদরঘাটে নিয়ে গেলে হয়তো বেশিক্ষন লাগবে না বিক্রি করতে! কিন্তু এ কেমন করে সম্ভব? যদি জানাশোনা কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তাহলে লজ্জায় মাথা কাটা যাবে না? খোলা রাস্তায় জিনিশ বিক্রি করতে যাওয়াটা গ্লানিকর ব্যাপার। লোকে চেহারা দেখলেই বুঝতে পারবে, সে ফেরিওলা নয়, অথচ কেন একটা সুতোর পাখা বিক্রি করতে এসেছে তার আসল কারণটা জানতে পারবে না। ভাববে, অভাবে পড়েই বোধ হয় বাড়ির জিনিশ বেচতে এসেছে।

ফরিদা তৎক্ষণাৎ ব্যস্ততার সঙ্গে শোবার ঘরে গিয়েছিল। মা;কে লুকিয়ে বেতের বাক্স থেকে পাখাটা এনে খবরের কাগজ দিযে মোড়াল। মুর্তাজার হাতে দিয়ে বলল,সাবধানে বেরিয়ে যাও।

মুর্তাজার মুখটা তখন দ্বিধায় দ্বন্দ্বে চুন হয়ে আছে। তার মনে হচ্ছে, মাথায় বাড়ি দিলেও এ কাজ সে করতে পারবে না। ফরিদা যখন পাখাটা হাতে এনে দিল, সে আপত্তি জানাতে পারল না। বাসার ান্য কেউ যাতে দেখতে না পায়, তেমনি সতর্কতার সঙ্গে বেরিয়ে এল রাস্তায়।

অনেকদিন খেটে ফরিদা পাখাটা তৈরি করেছিল বাবার জন্যে। তিনি আপনভোলা লোক, নিজের সুখ-সুবিধের দিকে মোটেই খেয়াল রাখেন না। এমন কি অসুখ হলেও, তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয় যে, তাঁর অসুখ করেছে। দিনরাত পড়াশুনা নিয়েই পড়ে থাকেন। তিনি বলেন, দেশের ভবিষ্যৎ যারা, সেই ছেলেমেয়েদের পড়াশুনাটা হেলাফেলার কাজ নয়। ওদের মধ্যে মনুষ্যত্বের বীজটা টিকমতো ঢুকিয়ে দিতে হবে, আর সেজন্য প্রফেসরের হওয়া চাই রীতিমতো কর্মী। যে মালী চারাগাছকে মহীরুহে পরিণত করতে চায়, তাকে ঢিলেঢালা হলে চলে না। অবশ্য অধ্যাপনা করে ক'শ টাকাই আর পাওয়া যায়। সে টাকায় ছয়-সাতজন খোরপোষের একটা সংসার চালানো কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবু পয়সাটা চরম জিনিশ নয়, যদি হোত, তাহলে হয়তো এতদিনে দুনিয়াটা শেয়াল-কুকুরের রাজ্য হয়ে দাঁড়াত। আব্বার এসব মতামতের জন্যে তাঁকে খুব ভালো লাগে ফরিদার। অন্য কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়, আম্মা সব সময় তাঁর দিকে নজর রাখতে পারেন না। তাই উনি যতক্ষণ বাসায় থাকেন্ ফরিদা যথাসম্ভব কাছাকাছি থাকে। ডাক শুনলেই ছুটে যায় তাঁর কাচে। মাঝে মাঝে তিনি ভীষণ চটে ওঠেন, কিন্তু এ নেহাত বাইরের ব্যাপার।

দু'দিন আগে পাখাটার কাজ শেষ হয়েছে। ফরিদা ভেবে রেখেছিল সুস্থির সময়ে সেটা নিয়ে গিয়ে আব্বাকে একদম অবাক করে দেবে। কিন্তু তা আর হল না।

তবু ভাবনার কারণ নেই। আরেকটি নতুন পাখা সে তৈরি করবে শিগগিরই।

ছোট ভাইবোন নিয়ে গোসল করতে যাওয়ার জন্যফরিদা তৈরি হচ্ছিল, এমন সময় ঘরে ঢুকল মুর্তাজা। ও জিগগেস করে ওঠে, এত শিগরিগই বিক্রি হয়ে গেল? কত পেয়েছ?

মুর্তাজার চেহারা বিমর্ষ। পাখা সমেত হাতটা তুলে বলে, বিক্রি আর হলো কোথায় এই তো।

কেন, কেউ কিনতে চাইল না?

আমি বিক্রি করতে চাইনি। মুর্তাজা ব্যাখ্যা করে জানায়, বাইরে গিয়ে মনে হল আমার এক বন্ধুর কাছেগেলে টাকা পেতে পারি। তোর এত কষ্টের জিনিশটা বিক্রি করবার দরকার নেই।

ফরিদা বুঝল, এ বাজে অজুহাত মাত্র। ভাইটির চরিত্র ওর নখদর্পণে আঁকা। এত লোকের সামনে দাঁড়িয়ে জিনিশটা বিক্রি করতে লজ্জা হচ্ছে, এছাড়া ফিরে আসার কোনো কারণ নেই।

যদি পাও তবে তো ভালোই। ফরিদা পাখাটা হাতে নিয়ে বলল, তা'হলে ওখানে যাচ্ছ?

হ্যাঁ এক্ষুণি যাচ্ছি। ছোট বোন ওর মনের ভাবটা বুঝে ফেলেছে ভেবে খারাপ লাগে ওর। বাইরে থেকে ফিরে আসার সময় ভেবেছিল গোসল করে খেয়েদেয়ে বেরুবে। কিন্তু

এখন আর সম্ভব নয়। এক গেলাস পানি খেয়ে ও বাইরের দিকে পা বাড়িয়ে দিল।

বন্ধুবান্ধব কম নয়। সম্ভব হলে সবার কাছে গিয়েই একবার করে ঢু মারতে হবে। প্রথমেই মনে পড়ল, আখতারের কথা। খোশমেজাজী দিলখোলা ছেলে। ওর কাছে থাকলে কয়েকদিনের জন্যে তিনটি টাকা ধার দেবেই। কিন্তু যে হারে সিগাটে ফোঁকে তাতে ওর পকেটে কিছু থাকাটাই বিচিত্র। বিবেচক ছেলে হয়ে এমন উচ্ছৃঙ্খল চলাফেরায় কোনো শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু তিরস্কার করলে ও শোনে আর হো হো করে হেসে ওঠে। ও বলে দুনিয়াতে আকবর বাদশাকেও মরতে হয়েছে, হেসে খেলে জিন্দেগীটাকে সিগারেটের ধোঁয়ার মত উড়িয়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। অবশ্য এজন্য কর্তব্যকে অবহেলা করবে না, কেননা মনের মতো কাজের মধ্যে রয়েছে আনন্দ আর আনন্দই হচ্ছে জীবন। মা বাড়িতে আছেন, ছোটভাইটা ইউনির্ভাসিটিতে ইকনমিকসে অনার্স পড়ছে, নিজের কথা না ভেবে ওদেরকে দেখাশোনা করার মতো যোগ্যতা অর্জনের জন্যেই সে আর্ট ইস্কুলে ভর্তি হয়েছিল। ল্যান্ডক্যাপ আর পটারীতে ওর হাত ভালো।

আস্তানাটা অনেক দূরে, শান্তিনগর বাজারের কাছ দিয়ে যে রাস্তাটা বেইলী রোডের দিকে চলে এসেছে, তারই ধারে। টায়ার ফেটে সাইকেলটা অচল হয়ে আছে, মুর্তাজাকে হেঁটেই যেতে হবে এতদূর।

কড়া দুপুর রোদ মাথায় নিয়ে ও যখন ভার্সিটি স্টুডেন্টস লজের বারান্দায় এসে উঠল তখন তার সারা শরীর বেয়ে দর্‌দর্‌ করে ঘাম ঝরছে। কাঠের বেড়া দেওয়া টিনের একটা চৌচালা। সে হিসেবে নামটা বেশ ভারিক্কি চালের। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল এই যে, এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছাত্র থাকে না। কযেকজন কেরানি, আর আখতার, এরাই হচ্ছে এই ঘরের বাসিন্দা। রান্নাবাড়ার জন্যে একটা চাকর রাখা হয়েছে।

মুর্তাজা ঘরে ঢোকবার আগেই দক্ষিণ দুয়ারের কাছে শুনল আখতারের গলা, আমার ভাত কোথায় হ্যা, আমার ভাত?

আপনার চাল দেওয়া হয়নি, বাবুর্চি জানাল।

দেওয়া হয়নি মানে? আমি উপোস থাকব নাকি?

তার আমি কিছু জানি না। বাবুর্চি বলল, ম্যানেজার সাবকে বলেন।

মেসের ম্যানেজার সাহেবকে জিগগেস করার পর বলল, কদ্দিন আর চালাবো বলুন। সাতদিন আগে আপনার টাকা দেওয়ার কথা ছিল।

আমি পালিয়ে যাব টাকা নিয়ে? আখতারের কণ্ঠস্বরে ক্ষোভ।

পালাবনে না। কিন্তু আমাদেরও তো একটা সাধ্যি আছে। কত টাকা আর মাইনে পাই।

মুর্তাজা ঘরে ঢুকে ওর খাটের ওপর গিযে সটান শুয়ে পড়ল। ওখান থেকে ফিরে এসে তাকে দেখতে পেয়ে অন্য সবকিছু ভুলে যায় আখতার। নিমেষে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

তার বন্ধুদের অনেকবার অনুরোধ করেছে আসতে, কিন্তু দূরের পথ বরে কেউ আসেনি এ পর্যন্ত। মুর্তাজারও এখানে প্রথম পদার্পণ। আখতার ওর সামনে সিগারেটের প্যাকেটটা খুলে দেয়। পা দুলিয়ে জিগগেস করল, তারপর হঠাৎ কি ভেবে শুভ পদার্পণ?

এমনি, আজকে তো ছুটি। মুর্তাজা বলল, তোকে মনে পড়ল।

ওহ্ গ্রেট। আখতার একটা সিগারেট ধরিয়ে বলর, কতকগুলো নতুন পট করেছি, দেখবি?

নিশ্চয় নিশ্চয়। মুর্তাজা একটু থেমে বলল, একটু জিরিয়ে নিই।

ওদের কথাবার্তা শুনে আগেই মুর্তাজার মনটা মে গিয়েছিল, ভাবছিল এখানেও কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। চশমাটা খুলে রাখার পর সিগারেট ধরিয়ে সে দোঁয়ার রিং বানাতে লাগল মুখের উপর।

এরপর কি করা যায়? বন্ধুদের একটা একটা নাম ধরে সম্ভাবনার কথা সে চিন্তা করতে থাকে। কিন্তু কেউ দিতে পারবে বলে মনে হচ্ছেনা। তা হলে?

শাজাহানপুরের ওদিকটায় কয়েকটি ভালো জায়গা দেখে এসেছি। স্কেচে বেরুবি বিকেলে? কথাটা জিগগেস করে আখাতার মুখের দিকে তাকাল।

রাখ্ তোর স্কেচ। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে মুর্তাজা বলল ঠান্ডাগলায়, ছবি আঁকার চাইতে জীবনটা অনেক মূল্যবান।

হঠাৎ এ কথা কেন? আখতার বিব্রত হয়, কিন্তু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

এমনি বললাম আর কি! যদি আঁকতেই হয়, ছবি আঁকতে হবে মানুষের। ন্যেচারের নয়। দিনের পর দিন মানুষ কিভাবে বেঁচে থাকছে, বেঁচে উঠছে, তাই ফোটাতে হবে রঙে রেখায়। ন্যেচার আসবে সেখানে, তবে মুখ্য হয়ে নয়। বিছানা থেকে উঠতে উঠতে মুর্তাজা বলল, এখন চলি!

চলি মানে? বিস্মিত হয় আখতার, এক সঙ্গে এসে মিললে ঘন্টার পর ঘন্টা যেখানে কাটিয়ে দেয়, এখন এত শিগগির উঠে পড়ার কোন ব্যাখ্যা খুজে পায় না।

একটা জুরুরি কাজ আছে। মুর্তাজা বলল, শিগগির যেতেহবে।

কি কাজ একটু শুনতে পারি? গোপনীয় কিছু নয় নিশ্চয়ই?

তোকে জানালে বিশেষ ফায়দা হবে না। মুর্তাজা বলল সংক্ষেপে।

কেমন করে বুঝলি। আখতার জিগগেস করে ক্ষুণ্ন গলায়।

এমনি, অনুমানে। মুর্তাজা বলল, তবু যখন পীড়াপীড়ি করছিল, বলছি। গোটা দু'য়েক টাকা ধার দিতে পারিস্? বিশেষ দরকার।

ও, এই কথা? শার্টটা গাযে দিতে দিতে আখতার বলর, চল্।

কোথায় যাব? জিগগেস করল মুর্তাজা, তুই কোথাও টাকা পাস্ নাকি?

হ্যাঁ, পাই। হাত ধরে টেনে আখতার বলর, চলনা জলদি।

রাস্তায় ওপাশে চালাঘরে একটা ছোট চায়ের দোকান। শুধু চা বেচে বোধ হয় পোষায় নাই, তাই মনোহারী জিনিশপত্রও রাখা হয়েছে। ওরা দুজনে টুলের মধ্যে এসে বসলো। খিদে পেয়েছে দু'জনেরই। দোকানদার ছোকরাটাকে অর্ডার দেয় আখতার, এই কি খাওয়ার আছে, দে। আর চা দে দু'কাপ।

ছোকরাটা চালাক কম নয় জিগগেস করল, আগের টাকা এনেছেন?

এনেছি বাবা, এনেছি। এখন যা বলছি দে। হঠাৎ ওর মেজাজ বিগড়ে গেল, বলল, উহ্ অসহ্য, অসহ্য।

ওর কথা পুরাপুরি বিশ্বাস না হলেও ছেলেটা একটা বাসনের করে কতকগুলা নোনতা বিস্কুট ও কুকিস নিয়ে ওদের সামনে বেঞ্চিতে রাখল। এরপর চুলোতে পাখা করতে গেল। ওরা বাইরের দিকে চেয়ে বিস্কুট চিবোতে থাকে চুপচাপ।

আধ ঘন্টার মধ্যে চা খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ল ওরা। রুমালের মুখ মুছে ছোকরাটির কাছে এগিয়ে যায় আখতার। জিগগেস করে, আমার আগে না কত হয়েছিল?

পাওনার অঙ্কটা ওর মুখস্থ। বলে, আট টাকা স্যার।

আট টাকা আর এখন হল আট আনা। সাড়ে আট টাকা। তাহলে দে, দেড়টাকা আমাকে। দশটা টাকা পুরো হয়ে যাক্।

ছেলেটা হাত নাড়িয়ে বলল, নোটটা দ্যান্।

ব্যস্ততার সঙ্গে পকেট হাতড়িয়ে ও বলে, ও তাইতো। বুলে ফেলে এসেছি। অন্র শার্টে রয়ে গেছে। দেড়টাকা দিয়ে দে, একেবারে দশ টাকার নোট দিতে আমার সুবিধে হবে।

আগে নোট না দিলে আমি পারব না। তা'হলে মালিক এসে মারবে।

রাস্তায় এসে আখতার জিগগেস করে, তোর টাকার খুব দরকার, নারে?

দরকার না হলে কি দুপুর বেলায় এদ্দূর হেঁটে আসি?

তা হলে এ ব্যাপারেই এসেছিলি আমার কাছে?

মুর্তাজা জানাল, হ্যাঁ, এ ব্যাপারেই।

চল তো দেখি। বিপরীত পাশে একতলা দালানটার দিকে চলতে চলতে বলে আখতার, ইন্সপেক্টর সাব দুটো পট কিনেছিলেন। দাম দেননি। পেলে সবিধে হবে।

কিন্তু ইন্সপেক্টরের বাড়িতে এসে ডাকাডাকি করার পর একজন এসে বলে গেলো, খেয়েদেয়ে উনি ঘুমিয়ে আছেন। এখন আসতে পারবেন না।

এরপর আখতারকে বিদায় দিযে মুর্তাজা হাঁটতে হাঁটতে ফিরে এল শহরে। চা খাওয়ার পর খিদেটা মরেছে। কিন্তু এসেছে একটা অসহ্য ক্লান্তি। শার্টের পিছনটা ভিজতে ভিজতে পিঠের সঙ্গে আটকে গেছে। ঘাম জমেছে সারামুখে, গলায়, তার মধ্যে রাস্তার ধুলো লেগে ঘিনঘিন করছে শরীরটা।

এইভাবে বিকেল হলে সদরঘাটে গিয়ে পশ্চিমদিকের একটা পাকায় বসল মুর্তাজা। সূর্য ডুবেছে বুড়িগঙ্গার পানিতে আলতা ঢেলে দিয়ে, নৌকাগুলো পাড়ে যাচ্ছে ছায়ায়। দেখবার ইচ্ছে থাকলে আরো অনেক দৃশ্য রয়েছে, ভারেঅ ছবি আঁকবার মতো, স্টাডি করার মতো। সেদিকে ওর মন নেই। এখন ভাবছে, টাকা না হলে মানুষের গোটা অস্তিত্বটাই যেন নিরর্থক। অথচ কোনদিন একে এত গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতে শেখেনি।

নদীর ঝিলিমিলি স্রোতের দিকে চেয়ে থাকতে এক সময় মাহবুব কেমিক্যাল ওয়ার্কসের কথা ওর মনে পড়ল। ম্যানজোর তিনদিন আগে বাসায় এসে বলেছিল, তাদের নতুন তেলের লেবেলটা এঁকে দিতে। মুর্তাজা ভূমিকা না করেই জবাব দিয়েছিল, আমি কমার্শিয়াল কাজ করি না।

কেবল মুখের কথা নয়, গোড়া থেকেই এ ছিল তার প্রতিজ্ঞা, কমার্শিয়াল করবে না। ক্রিয়েটিভ আর্টিস্ট হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার আগ পর্যন্ত যদি দু'তিনদিন একনাগাড়ে না খেয়েও থাকতে হয়, তবু সে ওই ধরণের শিল্পচর্চার হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে। এগুলো করলে সৃজনী- প্রতিভা দিনে দিনে কেমন করে নষ্ট হয়, তা মোটেই টের পাওয়া যায় না। ব্যবহারিক শিল্প নয়, সৃজনী শিল্পকেই করতে চায় পেশা, যদিও এদেশে এখনও তা আকাশ-কুসুম কল্পনা। এ ব্যাপারে ওর মত হচ্ছে, আত্মত্যাগ না করলে পরবর্তী জেনারেশনে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

কিন্তু সে যেন তার প্রতিজ্ঞা রাখতে পারবে না। ওর মন বলছে, এখন গেলেও সে কাজটা পাওয়া যেতে পারে। বাড়ন্ত ফার্ম, পয়সা নেহাৎ কম পাওয়া যাবে না।

এতক্ষণে যেন সমস্যার সত্যিকারের সমাধান খুঁজে পেল। মুর্তাজা উঠে দাঁড়িয়ে চলতে থাকে তাড়াতাড়ি। ভবিষ্যতে কি হবে না হবে তার জন্যে এত মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।

চকবাজার ছাড়িয়ে একটা গলিতে এসে দেখল, দোকানটা খোলাই আছে। ম্যানেজার তাকে দেখতে পেয়েই জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার? এত রাত্রে যে?

আপনাদের লেবেলের কাজটা আমি করব। কোন ভূমিকা ছাড়াই বলল মুর্তাজা।

তাতো দিয়ে দিয়েছি অন্যজনকে। আপনি তখন আপত্তি করলেন।

মুর্তাজা জিগগেস করে প্রায় ক্ষ্যাপার মত, কাকে দিয়েছেন?

নাম বলতেই সে দেকল ও লোকটি তার বন্ধু। একটু ভেবে নিয়ে জানতে চাইল, আচ্ছা, আমি যদি ওর কাছ থেকে কাজটা নিতে পারি তা হলে আপনার কোন আপত্তি নেই তো?

আমার আর কি আপত্তি? কাজ হলেই হলো।

কাল সকালে এসে দিলে টাকা দেবেন তো?

জিনিশ পেলে কেন দেবোনা?

ওখানে আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে সে যখন রশিদের কাছে এলো, তখন রাত নয়টা বাজে। ওখানে হাজির হলো, জিনিশটা বুঝে নিল, এরপর বেরিয়ে এল। রশিদকে একটা কথা বলার সুযোগ দিলো না।

ফরিদা উদ্বিগ্ন হয়ে একেকবার দরজার দিকে চাইছিল। এখনো সে বাইরে থেকে ফেরেনি কেন? বাবা-মা রেগে গেছেন। এই রাগের পিছনে একটা গভীর কারন আছে। বড় ছেলে মুনীর রাজনীতি করতো গত ভাষা-আন্দোলনের সময় জেলে গেছে। গত দু'বছর ধরে ও কোথায় থেকেছে, কখন বাড়িতে এসেছে, কখন আসেনি, বাপ-মা কিছুই ঠাহর করে উঠতে পারতেন না। যেদিন ধরা পড়ল, সেদিন ওরা বুঝতে পারলেন, তলে তলে এই ব্যাপার। এরপর বিশেষ করে ছেলেদের ওপর হুকুম, বিকেলে যেখানেই যাক, সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাসায় ফিরতে হবে। নইলে মারের চোটে পিঠের চামড়া থাকনো।

কথাটা যে মুর্তাজার মনে ছিল না এমন নয়, কিন্তু এ ব্যাপারে সে বিশেষ উদ্বিগ্ন হয় না। কেননা, এ পর্যন্ত অনেকবারই বাধ্য হয়ে এই আদেশ অমান্য করতে হয়েছে। ঠিক সন্ধ্যার সময় কোন ভদ্রলোকের পক্ষে বাড়িতে থাকা সম্ভব না—কি?

ও ঘরে ঢুকতেই ফরিদা জিগগেস করল, কি হল? এনছ?

না, তুই শুনে যা। মুর্তাজার হাবভাবে একটা রহস্যময়তা।

কানে ফিস্‌ফিস্‌ করে কি বলতেই ফরিদা চলে গেল অন্য ঘরে। মুর্তাজা হারিকেন হাতে নিজের কোঠায় এসে ঠিক করতে থাকে রং তুলি কাগজ।

ডাল তরকারি দিয়ে রান্নাঘর থেকে এক থালা ভাত আর এক গেলাস পানি নিয়ে হাজির হল ফরিদা। বলল, নাও, আগে দুটো মুখে দিয়ে নাও।

সাড়া পেয়ে মা এসে জিগগেস করলেন, এতক্ষণ কোথায় ছিলি?

এখানেই তো। কাজ করছিলাম।

এখানেই কাজ করছিলি? মায়ের সামনে মিথ্যা কথা বলতে বাধলোনা? তুই আজকাল বড় বাড়াবাড়ি করছিস। সাবধান হ। নইলে কপালে দুঃখ আছে।

আম্মা চলে যাওয়ার পর তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে মুর্তাজা কাজ করতে বসলো, হারিকেনের একটা দিক খাতা দিয়ে আড়াল করে রেখেছে। অনেক রাত পর্যন্ত আলো জ্বলছে

দেখলে বাবা চটাচটি করবেন।

আম্মাকে দেখাবার জন্য বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়েছিল ফরিদা। কিন্তু তার চোখে ঘুমের আঁশটুকুও নেই। জেলের ঘণ্টায় একটা বাজতেই সে আস্তে আস্তে উঠে এল। এমনভাবে দরজা খুলল যাতে কেউ টের না পায়।

শোয়ার আগে সে স্টোভ ও অন্যান্য সরঞ্জাম ঠিক করে রেখেছি; স্টোভটা জ্বালিয়ে জিগগেস করল কদ্দূর হয়েছে?

আরো ঘণ্টা দুই লাগবে। মুর্তাজা বলল, শিগগির চা দে তো।

তিনরঙা লেবেলটা এঁকে শেষ করার পর রাত তিনটে বাজল। এর মধ্যে তিন কাপ চা পান করতে হয়েছে। ফরিদা আর বসে থাকতে পারছেনা, চোখের পাতাদুটো একেকবার বুজে যায়। তুলিটা ধরে টেবিলের ওপর রেখে মুর্তাজা বলল, তুই যা। ঘুমিয়ে পড়গে।

আজ সকাল আটটায় ঘুম থেকে উঠে কখন দোকান খুলবে তার জন্য অপেক্ষা করল না। ম্যানেজারের বাসার ঠিকানাটাও টুকে এনেছিল। লেবেলের আঁকাটা হাতে নিয়ে চলল মুর্তাজা। ওখানে জিনিশটা বুঝিয়ে দিয়ে পাঁচ টাকার নোটটা হাতে নিল। এই টাকাতেই অনেকক্ষণ বেছে বেছে ফলের দোকান থেকে বেশ তাজা দুই গণ্ডা কমলালেবু কিনে এনেছে।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে ফিমেল ওয়ার্ডে চার নম্বর বেডটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল মুর্তাজা। জোরে হেঁটে আসায় শরীর দিয়ে ঘাম ছুটছে। যাক্, তবু সময়মত আসতে পেরেছে সে। এখনো লোকজন এসে ভিড় জমায়নি।

আমাকে চিনতে পারছেন তো? একটু ঝুঁকে বিনয়ের সঙ্গে প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ কালকে এসেছিলেন না? কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর আবার নারীকণ্ঠের ক্ষীণ আওয়াজ, মাথাটা বড্ড ঘোরে। হঠাৎ কাউকে দেখলে চিনতে পারি না। বুকটাও ভীষণ জ্বালা করে। আজকে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম।

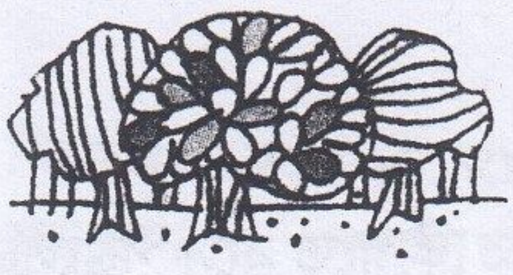
মুর্তাজা কমলালেবু বাঁধা রুমালটা সামনে রাখল। সেগুলো দেখে তার রক্তহীন পান্ডুর মুখে আবার সেই করুণম্লান হাসি ফুটে উঠল। এই হাসির পেছনে কি লুকিয়ে আছে কেউ জানে না,মুর্তাজাও নয়। সে কি দীর্ঘ কারাবাস ও নির্যাতনের বেদনা, না অন্যকিছু? মুর্তাজা একদৃষ্টে চেয়ে দেখে, তার দুই চোখের কোণ বেয়ে মৃত্যুর কালো ছায়া নেমে এসেছে সে যেন নিজের রক্তের স্পন্দনে শুনতে পাচ্ছে তারই অস্পষ্ট পদধ্বনি। সে মনে মনে শিউরে ওঠে। কী বলবে খুঁজে পায় না কিছুই। কী বলবে? কী বলতে পারে?

তবু একথা ঠিক, আমি মরব না। জানালার বাইরে অনেকদূরে চলে যায় ইলা মিত্রের দৃষ্টি। সে দষ্টি স্থির, অচঞ্চল। গলার আওয়াজটা আগের চেয়ে আরো স্পষ্ট হয়, আর বেঁচে উঠলে আপনাদের কথা আমার মনে থাকবে।

আমাকে আপনি বলবেন না।

মুর্তাজা আর কোন কথা বলতে পারে না। বিদায় নিয়ে ফিরে আসার সময় একটা ছবির পরিকল্পনা ওর মাথায় খেলল। ও মনে মনে ঠিক করে নেয়, আজকে বাসায় ফিরে গিয়ে রাত্রেই একটা স্টীললাইফ কম্পোজ করবে। কম্পোজ করবে মানুষের মাথার একটা খুলির সঙ্গে কয়েকটি টস্‌টসে তাজা কমলালেবুর রক্তিম স্তবক।

মে, ১৯৫৪



বৃষ্টি

বৃষ্টি নামবে। ঈষৎ শিশির ছোঁয়া বসন্ত রাত্রে দক্ষিণ থেকে বইবে যে হাওয়া, তাতে থাকবে সমুদ্রের আর্দ্রতা, ফাটল-ধরা শুকনো মাঠ আর পাতাঝরা গাছের শাখায় শিহরণ জাগিয়ে গিয়ে সেই অতি দূরে পাহাড়ের চূড়ায় ঘনীভূত হবে, এরপর গর্জনে বজ্রে বিদ্যুতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে সারাটা আসমান, মঙ্গলসুধার মতো অজস্রধারায় নামবে বৃষ্টি। গাছের শুকিয়ে যাওয়া ডালপালাগুলি কচি পাতায় ভরে উঠবে,সারা খামার ছেয়ে যাবে সবুজে সবুজে। দুপুরের রোদে পাটখেতের চারা বাছতে গিয়ে শরীর থেকে হয়তো দরদর করে ঘাম ঝরবে, কিন্তু ততে আসবে না এতটুকু ক্লান্তি, কেননা, নতুন ফসলের খোয়াব প্লাবনের মতো মিশে থাকবে রক্তের বিন্দুতে বিন্দুতে।

কিন্তু সে-বছর এসব কিছুই হল না। ফাল্গুন চলে গেল, উত্তর দিকটা কিঞ্চিৎ কালোও হল না; চৈত্র শেষ হতে চলল, আকাশে দু'একদিন গুরুগুরু আওয়াজ হল, গুমোট হয়ে রইল সারাটা প্রকৃতি; কিন্তু এর বেশি কিছু নয়।

এরপর এল বৈশাখ। আর এখনও সূর্য আগুনের ফুলকি উড়িয়ে তীব্র তেজে জ্বলতেই লাগল, মাটির বুক চিরে মাথা উঁচিয়ে-ওঠা পাটের চারাগুলি আস্তে আস্তে কুঁকড়ে গেল। ওপরে খাঁ-খাঁ শূন্য, নিচে আদিগন্ত মুক্ত সুদূর, আরও নিচে বাঘবন্দী নকশার মতো জমিগুলি রোদে-পোড়া, বিবর্ণ। দুপুরবেলা খেতের আলোর ওপর গিয়ে দাঁড়ালে কলজেটা সহসা ছাৎ করে ওঠে, ঝলসানো তামাটে জিহ্বা বার করে সারা মাঠটা ডাইনীর মতো হা করে আছে। জ্বলন্ত ক্ষুধা নিয়ে সে নিজে বুকের শিশুশস্যকে গ্রাস করেছে, আগামী বছর যে গজব নেমে আসবে তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু কেন? এর পিছনে নিশ্চয় কোন গুরুতর কারণ আছে। সেদিন জুম্মা নামাজের পর আলোচনা উল। মিম্বরের কাছে দাঁড়িয়ে মৌলানা মহীউদ্দিন বলতে লাগলেন, বেরাদরানে ইসলাম! আমি অধম বান্দা, আপনাদের খেদমতে কি বয়ান করব, আপনারা সব বিষয়েই ওয়াকিবহাল। কিতাবে আছে, খোদার গজব নামে তখনি যখন দুনিয়া গুণাগারিতে ভরে যায়। আমরা এখন কি দেখছি? না, ছেলে বাপের কথা শোনে না, জেনানা বেপর্দা, চুরি-ডাকাতি, বদমায়েশিতে দুনিয়া পূর্ণ হয়েছে। এদিকে নামাজ নেই, রোজা নেই, হল হজ জাকাত নেই। আজ চলুন, আমরা তাঁর দরবারে জার-জার হয়ে কাঁদি। মাঠে গিয়ে সবাই হাত তুলে মোনাজাত করি, তিনি রহমানুর রাহিম, ইচ্ছা করলে একটু দয়া করতেও পারেন।

মৌলানা সাহেবের কণ্ঠস্বরের গুরুগম্ভীর ধ্বনি-তরঙ্গে পাকা মসজিদের ভিতরটা গম্‌গম্ করতে লাগল। মুসল্লিদের মধ্য থেকে উঠে দাঁড়ালেন হাজি কলিমুল্লাহ। থুতনিতে একগুচ্ছ শাদা দাড়ি, মাথায় কিস্তি টুপি, নামাজ পড়তে পড়তে কপালের মাঝখানটায় দাগ পড়েছে। তিনি প্রথমে গলা খাকরানি দিলে, পরে আবেগ-কম্পিত গলায় বলতে লাগলেন, মৌলানা সায়েব যা বললেন, তা অবশ্যই আমরা পালন করব। কিন্তু এই সঙ্গে একটি কথা সক্কলের মনে রাখতে হবে, কুকর্মের বিচার চাই। এই অনাবৃষ্টি কেন হল, আপনারা ভেবেছেন কি? খোলাখুলি বলতে গেলে, নিশ্চয় কোনো মেয়ে অবৈধভাবে গর্ভবতী হয়েছে, তৌবা, আস্তাকফেরোল্লা! এই অঞ্চলে, আশেপাশের কোনো গ্রামে অথবা আমাদের গ্রামেও হতে পারে। এদের তালাশ করে বার করতেই হবে, নইলে এই আজাবের হাত থেকে ছাড়া

পাওয়া যাবে না। এদের দুর্‌রা মেরে ঠান্ডা করতে হবে।

ডান হাতের আঙুলগুলি দাড়িতে একবার চালিয়ে গরমে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লেন হাজি কলিমুল্লাহ, তাঁর মগজের কোষে কোষে সত্রিকারের অপরাধীকে খুঁজে পাওয়ার ভাবনা।

দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে ফুটবল খেলার ময়দানে যেদিন মেঘের নামাজ হওয়ার কথা, তার একদিন আগেই অসুখে পড়লেন সুখী মৌলানা মহীউদ্দিন।

জামাতে ইমামতি করবার জন্য হাজি সাহেবকে গাঁয়ের তরফ থেকে অনুরোধ করা হল। প্রথমে বিনয় করলেও, সকলের খেদমতে পরে রাজি হলেন।

সেদিন নামাজ শেষ হওয়ার পর পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে মুখ করে দাঁড়ালেন হাজি কলিমুল্লাহ, বহুদূর চাউনি বুলিয়ে দেখলেন, দুনিয়াটা এখনো জিন্দেগীর অযোগ্য হয়ে ওঠেনি, এখনো ডাক দিলে আলেমুল গায়েবের দরবারে হাজিরা দিতে হাজার লোককে পাওয়া যায়। তিনি চেয় রইলেন, আর দেখলেন অগুনতি টুপির শোভা, হোক্‌না সেগুলি তেল চিটচিটে অথবা ছেঁড়াখোড়া। খোলা পান্তরে গালভাঙা তামাটে মানুষগুলি বসে আছে অসহায়ের মতো, সবারই মনে একটুখানি রহমের প্রার্থনা। হাজি কলিমুল্লাহ দু'হাত তুলে দরাজ গলায় উচ্চারণ করতে রাগলেন, ইয়া আল্লাহ, ইয়া বারে খোদা, তুই চোখ তুলে চা, একটু দয়া করে তোর বান্দাদের। তুই আসমান-জমিন, চান-সুরুজের মালিক, তোর অঙ্গুলি হেলনে সাগর দোলে, হাওয়া ছুটে চলে, নহর বয়, তোর একটুখানি ইচ্ছায় এই দুনিয়া ফুলে-ফসলে ভরে উঠতে পারে। মেঘ দে, পানি দে, ছায়া দে, শান্তি দে তুই।

আল্লাহুম্মা আমিন! আল্লাহুম্মা আমিন! সারা জামাত জোড়া একই কাতর আওয়াজ। হাজি কলিমুল্লাহর শাদা দাড়ি চোখের পানিতে ভিজে গেল। কেঁদে জারজার হয়ে তিনি দোয়া খতম করলেন, সোবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতে আম্মা ইয়াসসেফূন, আসসালামু আলাল মুরসালিনা, আলহামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামিন!

এইভাবে একদিন দু'দিন, তিন দিন ময়দানে গিয়ে জামাতে শামিল হল ছেলে-বুড়ো জোয়ানেরা, তাদের একচোখ আকাশের দিকে আরেক চোখ ফসল কুঁকড়ে যাওয়া খামারের দিকে। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা এক মায়ের একপুত্রের গায়ে চুনকালি মাখিয়ে, তার মাথার কুলোয় কোলাব্যাঙ আর বিষকাটালির গাছ রেখে রতের পর রাত মেঘখেলা খেলল, নদীর ধারে সিন্নি রেঁধে কলাপাতায় ফকির-ফাকরাকে খাওয়ার। কিন্তু সেই রোদ চুয়ানো কাকচক্ষু নীল, একখন্ড মেঘের আভাসও দেখা গেল না।

মগরেবের নামাজের পর পাটিতে বসে তসবিহ জপতে জপতে এসব কথাই ভাবছিলেন হাজি কলিমুল্লাহ, তাঁর চোখের পুতুলিতে অবসাদের ছায়া।গভীর ভাবনার কারণ আছে বৈকি! সুতোর চোরাকারবার থেকে কযেক হাজার টাকা পেয়েছিলেন, তার অর্ধেক দিয়ে একটা গুদাম কিনেছেন মেঘনার বন্দরে, বাকি অর্ধেক দিযে কিনেছেন দুন দেড়েক জমি। নিজে পাট কিনে মজুদ করতে না পারলে গুদাম কেনার ফায়দা নেই। মাসিক দেড়শো টাকা ভাড়ায় আর কী হয়। অথচ এ বছরও গুদামটাকে নিজে ব্যবহার করতে পারবেন বলে মনে হচ্ছে না। এদিকে সবগুলি জমি নিজে চাষ করেছেন। এখানটায়ই হয়েছে চরম বোকামি। যদি পওনি দিতেন, তাহলেও হাজার দেড়েক টাকা নগদ পাওয়া যেত; কিন্তু মুনি-মজুর ও জমির তদারক করতে জান বেরিয়ে যাচ্ছে। বীজ বোনা থেকে এক-নিড়ি পর্যন্ত পয়সাকড়ি কম খরচ হয়নি, ভবিষ্যতে আরো হবে, অথচ এদিকে আকাশের যা হাল, তাতে ফসল পাওয়ার বিশেষ আশা নেই।

সুতোর কারবার ছেড়ে দিয়েও ভালো কাজ করেননি। গত বছর হাওয়া জাহাজে চড়ে

গিয়ে হজ করে এসেছেন; ভেবেছিলেন, অতঃপর সংসারের ঝামেলাতে নিজকে এতটা জড়াবেন না, গুদামটা ছেলেদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজে জমিজমা নিয়েই থাকবেন। কিন্তু টাকার অভাবে সব ভেস্তে গেল। আসলে ব্যবসা ব্যবসাই, এতে সৎ-অসৎ- এর প্রশ্ন নেই, নিয়ৎ ভালো থাকলে, দান-খয়রাত করলেই হল।

জানালার বাইরে থেকে আমের বোলের তীব্র গন্ধ ভেসে আসছিল, বাঁশঝাড়ে শালিকের কিচিরমিচির অনেকটা মন্দীভূত। তসবিহর গুটিগুলি চঞ্চল হয়ে ঘুরছে হাজি কলিমুল্লাহর আঙুলে আঙুলে, এই সঙ্গে তাঁর মনটা ক্রমেই আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে।

জৈগুন ঘরে বাতি দিতে এসে যেন চমকে উঠল। বলল, মিয়াসাব এখানে? মসজিদে যান নি?

না শরীরটা খুব ভালো নয়। হাজি সাহেব ওর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, তাছাড়া তোর গিন্নিমা বোধ হয় এক্‌খুনি এসে পড়বেন।

দিন পনের হল নতুন গিন্নি বাপের বাড়ি গিয়েছিল নাইওর করতে, আজকে তাকে আনবার তারিখ। হাজি নিজে যেতে পারেন নি, প্রথম তরফের তৃতীয় ছেলে খালেদকে পাঠিয়েছিলেন সকাল বেলায়। আসলে বৌকে বাপের বাড়িতে বেশিদিন থাকতে দিতে তিনি সব সময়ই নারাজ। প্রথম স্ত্রীকে দশদিন থাকতে দিয়েছিলেন, তাও একেবারে নতুন অবস্থায়। দ্বিতীয় স্ত্রীর বেলায় দিনের সংখ্যা আরো কিছুটা বেড়েছিল। তবে এখন পড়তি বয়েস, সব ব্যাপারে কড়াকড়ি চলে না। দু'বছর আগে দ্বিতীয় স্ত্রী মারা যাওার পর সংসার থেকে তার মন একেবারে উঠেই গিয়েছিল। কিন্তু খোদার কুদরত, কার সাধ্য তার কিনারা করে? তিনি কপালে যা লিখে রেখেছেন, তা একদিন ফলবেই। গতবার যখন হজে যাচ্ছিলেন, তার মাসখানেক আগে সবাই ধরে বসলো, এমন সোনার সংসার, একজন গৃহিণী না থাকলে কোনো কিছুই ঠিক থাকবে না।

কিন্তু পাত্রী? বয়স ষাট পুরো হতে চলল, এখন হাতে ধরে কে নিজের মেয়ে দিতে যাবে?

হাসালেন হাজি সায়েব, হাসালেন! আপনার কিনা পাত্রীর অভাব? মজু প্রধান দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, আপনি ক'ন যে বিয়ে করবেন, আমি পাত্রী ঠিক করে দিচ্ছি! তাও যেমন তেমন নয়, এমন কন্যা দেব, চোখে পলক পড়বে না।

হাজি কলিমুল্লাহর চোখের তারাদুটো খুশিতে চক্‌চক্ করে উঠল। একটা অজানা অনুভূতিতে তার হৃৎপিন্ডটা ধুক্‌ধুক্ করছিল; কিন্তু বাইরে আগাগোড়া ম্লান হয়েই রইলেন, আগেকার সহধর্মিণীদের স্মৃতি এতো শিগগির ভুলে যাওয়া উচিত নয়। তিনি একটা ঢোক গিলে বললেন, দেখুন তিনকাল গিয়ে এককালে পড়েছি, এখন আমোদ-আহ্লাদ করার সময় নয়। ঘরের তদারক আর— আর আমার ফাইফরমাশটা করতে পারলেই হল।

তাতো বুঝলাম! মজু প্রধান যুক্তি দেখালেন, ভাঙা নাওয়েও কাজ চলে, আবার নতুন নাওয়েও চলে। কিন্তু কোন্‌টা আমরা চাই! কোন্‌টা দিয়ে গাঙ পাড়ি দিতে সুখ?

এরপর সাতকানি জমি সাফ কাওলা করে দিয়ে যে পাত্রী ঠিক হয়েছিল, সে মজু প্রধানেরই মেয়ে-ঘরের নাতনী। বয়েস একুশ-বাইশ বছর হবে। এদেশের মেয়েরা কুড়িতেই বুড়ি হয়, সে হিশেবে হাজি সাহেবের সঙ্গে সম্বন্ধটা মোটেই বেমানান হয়নি!

রান্নাঘরে হাঁড়ি পাতিল গুছিয়ে জৈগুন এল। অর্থপূর্ণ গাম্ভীর্যের সহিত একটি পিঁড়ি টেনে নিয়ে বসলো। হাজি সাহবের ওজিফা তখনো শেষ হয়নি। মুখর বিড়বিড় খানিকক্ষণের জন্য থামিয়ে তিনি গিগগেস করলেন, কিরে কিছু খবর আছে!

জৈগুন বলল, আছে?

কি শুনি! তস্‌বিহর মালায় আঙুল থেমে গেল হাজি কলিমুল্লাহর, তিনি উৎসুক দৃষ্টিতে চাইলেন। কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে গোপন খবর সংগ্রহের জন্য তিনি জৈগুনকে নিযুক্ত করেছিলেন, আর সেজন্যই এই আগ্রহ।

আমি আজ গিয়েছিলাম বাতাসীর কাছে। গিয়ে দেখি, সে তার খাসিটার জন্য আমপাতা পাড়ছে। আমাকে দেখেই সে নানান কথা বলতে লাগল, কিন্তু আমি চেয়ে রইলাম ওর শরিলের দিকে। দরজায় একবার চেয়ে নিয়ে জৈগুন বলল, ওর তলপেটটা বেশ ফোলা মনে হল।

হাজি চিন্তিতভাবে জিগগেস করলেন, ওর জামাই না কবে মারা গেছে?

তা সাত-আট মাসে তো হবেই! জৈগুন হিশেব করে বলল, কিন্তু ওর পেট মনে হল চার-পাঁচ মাসের!

তাই নাকি? তাহলে তো বেশ অনেক দিনের ফাঁক? হাজি কলিমুল্লাহ যেন সত্যদর্শন করেছেন, তার চোখে আশার আলো ফুটে উঠল। নিচুগলায় জিগগেস করলেন, আচ্ছা, বাতাসীর ঘরে যে লোকটা থাকে, তাকে দেখলি?

হাঁ, দেখলাম। অসুখ এখনো সারেনি, তবে আগের চেয়ে একটু ভালো। আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখি সে ঘরের ভিতরে বিছানায় শুয়ে আছে।

তা হোক, তা হোক। হাজি অসহিষ্ণুর মতো বললেন, শুয়ে থাকলে কিহবে? শুয়ে থাকলে কি আর এসব কাজ করা যায় না? নিশ্চয় যায়। তুই কি বলিস?

হাঁ, দেখলাম। অসুখ এখনো সারেনি, তবে আগের চেয়ে একটু ভালো। আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখি সে ঘরের ভিতরে বিছানায় শুয়ে আছে।

তা হোক, তা হোক। হাজি অসহিষ্ণুর মতো বলরেন, শুয়ে থাকলে কি হবে? শুয়ে থাকলে কি আর এসব কাজ করা যায় না? নিশ্চয় যায়। তুই কি বলিস?

হাঁ, আপনি ঠিকই কইছেন। তা ছাড়া বাতাসীর চলাফেরা আমার ভালো নে হয় না। রজবালি বেঁচে থাকতেই এর সম্বন্ধে কত লোক কত কথা বলেছে। নামা-পাড়ার ছমু যে ওর দরজা খুলেছিল, তা কি কেউ শোনেনি? রজবালি টের পেয়েছিল বলেই না দোষটা ছমুর ঘাড়ে গিয়ে পড়ল। না হলে মেয়েমানুষের চোখঠারানি ছাড়া কি অমন কাজ করতে সাহস পায়?

যদি এই ঠিক হয়, তাহলে তো আর কোনো কথাই নেই। আমার বিশ্বাস বাতাসীই এ কাম করেছে! না হলে বৃষ্টি হবে না কেন? হাজি আবার তসবিহ জপতে লাগলেন, খানিকক্ষণ চুপ থাকার পর বললেন, তবু রাখ্, আমি নিজে একটু পরখ করে নিই, এরপর একটা কিছু করা যাবে।

জৈগুন চলে গেলে আবার গভীর চিন্তামগ্ন হরেন হাজি কলিমুল্লাহ। তার কপালের বলিরেখা আরো কুচকে গেল। তসবির গুটিতে ঘন ঘন আঙুল চলতে লাগল। বাতাসী, বাতাসী বাতাসী। বাতাসী ছাড়া এ কাজ আর কারো নয়। অল্প বয়েসে স্বামী মারা যাওয়ার এই দোষ! কেননা, স্বামীর সঙ্গ একবার যে পেয়েছে, সে সেই স্বাদ কি সহজে ভুলতে পারে? এ হচ্ছে আফিমের মতো, ভাত ছাড়া যায়, তবু ছাড়া যায় না এর নেশা। তা ছাড়া ওর এখন পুরো জোয়ানী। যেমন তেমন দু'একজন পুরুষ ওর কাছে কিছু নয়, এক চোখের বাঁকা চাউনিতেই কাত করে ফেলতে পারবে। অথচ কথা বলার কি কায়দা। মামাতো ভাই, দিনমজুরি করত, কালাজ্বরের কবলে পড়ে বিপদ হয়েছে, কেউ নেই, না দেখলে চলে না।

এসব কথা দিয়ে আর চিড়ে ভিজবে না। আসলে লোকটাকে এনেছে এক বিছানায় রাত কাটাবার জন্য— এ বুঝতে বাকি নাই।

কিন্তু এর শাস্তি হবে কী? কিতাবের হুকুম মানলে, গলা-ইস্তক মাটিতে পুঁতে এর মাথায় পাথর মারতে হবে, যতক্ষণ না প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। কিন্তু এ যুগে কি তা সম্ভব? থানা আর পুলিশ রয়েছে যে। তা হলে উপায়? জুতো মারা? একঘরে করে রাখা? গ্রাম থেকে বের করে দেওয়া?

হাজি কালিমুল্লাহ যখন এসব ভাবনায় তন্ময় হয়েছিলেন, তখন, খালেদ তার নতুন মা'কে নিয়ে মরাগাঙের পানির কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

পূর্ণিমা-চাঁদ দেখা দিয়েছিল বাড়ি থেকে রওয়ানা দেয়ার অনেক আগেই, এইবার তা বাঁশঝাড়ের মাথা ছাড়িয়ে উঠে ঝল্‌মল্‌ করছে। চারদিক নিঝুঝুম, গাছপালায় বাতাসের নড়াচড়ার গরজ নেই।

মরাগাঙে এখন হাঁটু পানি। দুই পাশে কাদা ঠেলে ডাঙার সঙ্গে যে সরু পথটার মিল হয়েছে, তার পরিষ্কার বালুর ওপর দিয়ে ঝিরঝির্‌ করে কেটে চলেছে ফোয়ারার স্রোত। পানির ভিতর থেকে গজিয়ে ওঠা বোরো খেতগুলিতে কচিধানপাতার জড়াজড়ি।

নিচু হয়ে জুতো-জোড়াটা ডানহাত দিয়ে খুলে ফেলল জোহরা। তার কাঁধে ছোটো ছেলেটা। তার অসুবিধে হচ্ছে দেখে পিছন থেকে খালেদ পাশে এসে বলল, সাজুকে আমার কাছে দিন্‌।

ওরা দু'জনে প্রায় সমবয়সী। প্রথম আপনি বলতে লজ্জা করতে খালেদের, কিন্তু এখন আর সে-ভাবটা নেই।

জোছনায় আলোকিত বড়ো ছেলের মুখের দিকে চাইল জোহরা, টানা ভুরুর নিচে ওর সুন্দর চোখজোড়া আরো সুন্দর মনে হল তার, একটা অব্যক্ত অনুভূতির ছলছলানিতে বনের অন্ধকারে শিহরিত নদীর মতো দুলে উঠল বুকের ভিতরটা। আচ্ছন্নস্বরে জিগগেস করল, তোমার কষ্ট হবে না তো?

খালেদ হাসলো। বলল, না এ আবার কষ্ট কি!

সাজুকে পাঁচ বছরের রেখে ওর আম্মা এন্তেকাল করেছেন দু'বছর আগে, আদর যত্ন না পাওয়ায় ওকে কান্না-রোগে ধরেছিল। কিন্তু বর্তমানে তা নেই। নতুন মা'কে তার এমনি ভালো লেগেছে যে, সে এক মুহূর্তের জন্যও তার কাছ-ছাড়া হয় না। জোহরা যখন নাউওর করতে যায়, তখন ও তার কোলে উঠে চলে গিয়েছিল।

অন্য কাঁধের ওপর থেকে অঘোরে ঘুমিয়ে থাকা ছোটো ভাইটিকে নিজের কাঁধে নিয়ে গিয়ে খালেদের মনে হল, কপোতের বুকের মতো উষ্ণ, প্রবালের মতো কোমল কিসের মধ্যে যেন তার বাঁ হাতের আঙুলগুলি ক্ষণিকের জন্য হঠাৎ-হাওয়ায় চাঁপার কলির মতো কাঁপুনি খেয়ে গেল। নিমেষে তার সমস্ত শরীরটা শির্‌শির্‌ করে উঠল ভরামেঘে বিদ্যুৎ সঞ্চারের মতো। পলকের জন্য তার চোখে পড়ল সহসা কেমন রাঙা হয়ে উঠল মেয়েটির মুখ, তার সারা চেহারায় রক্তের প্রবাহ বহ্নির মতো ছড়িয়ে গেল। খালেদ আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না; আরেক জন্মের কোনো নিবিড় স্মৃতি অস্পষ্ট মনে পড়ার মতো কী এক অজানা বেদনায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ঝিরঝিরে পানির ওপর দিয়ে সুমুখে হাঁটতে লাগল।

কিন্তু জোহরা দাঁড়িয়েই রইল। কাপড়টা টিক করে নিয়ে চাঁদের দিকে মুখ উঁচিয়ে চাইল একবার, আবার চাইল সামনে চলমান মূর্তিটার দিকে। এরপর সে পঞ্চল হয়ে উঠল। সেই রুপালি বালুর ওপরে ফোয়ারার স্রোতে বয়ে চলা রাস্তাটায় ত্রস্ত হরিণীর মতো পা ফেলে হাঁটু

পানির কাছে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। দুই পা'য়ের ফাঁক দিয়ে পিছন থেকে শাড়িটা কুচকে এনে ডানহাতে হাঁটুর কাছে ধরা, জোছনা-উছল কালো পানির দিকে মুখ নিচু করে জোহরা দেখল, তার মূর্তিটা ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে, এইসঙ্গে ছোটো ছোটো ঢেউয়ে ভেঙে যাচ্ছে চাঁদের চেহারাও। হঠাৎ মুখ তুলে সে ডাকল, খালেদ!

কি! কিছুদূর থেকে খালেদ সাড়া দিল।

আমাকে ফেলেই চলে যাচ্ছ! স্বপ্নের স্বরে যেন জোহরা বলল, আমি চলতে পারছি না। দেখ, দেখ! পানিটা কি সুন্দর!

খালেদ ফিরে এল। বলল, আপনার কি হয়েছে বলুন তো, চলুন তাড়াতাড়ি। অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে।

ও তাইতো। অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে। পানি ঠেলে কিছুদূর এগিয়ে আবার থমকে দাঁড়াল জোহরা, ঝিলিমিলি ঢেউয়ের দিকে চেয়ে বলর, দেখছ কি সুন্দর পানি! এমন পানতে মরতেও সুখ।

কোনো জবাব দিল না খালেদ, মুখ নিচু করে চুপচাপ এগুতে লাগল।

ওপারে কোথায় একটা পাখি ডেকে ডেকে যাচ্ছে বৌ কথা কও। নদী পেরিয়ে এসে চপ্‌চপ্‌ পানি থেকে পা দুটো ঝাড়া দিয়ে দিয়ে নতুন জুতো-জোড়াটা পরার সময় জোহরার মনে হল তার বুকের ভিতরে কিছু নেই, বিবাগী হওয়ার মতো কিসের এক রিক্ত হাহাকার গুমরে গুমরে মরছে। নিজের কথা ভাবতেই সে আঁৎকে উঠল, তার শরীরটা ঝিম্‌ ধরে অবশ হয়ে এল।

খালেদ আস্তে আস্তে হাঁটছিল। পিছন থেকে সে একটা কাতর-স্বর শুনতে পেল, একটু দাঁড়াও।

আবার কি হল আপনার।

কি জানি কিছু বুঝতে পারছি না। আমার চোখ দিয়ে এমন পানি পড়ছে কেন? জোহরা ব্যাকুলভাবে এগিয়ে গিয়ে খালেদের চোখের সামনে নিজের চোখজোড়া বিস্ফারিত করে দাঁড়াল, চাঁদের আলোয় দেখা গেল তার টলটলে দুটো চোখ দিয়ে মুক্তোর মতো অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়ছে।

খালেদ আবার উচ্চারণ করল, কি হল আপনার?

তুমি কিছউ জান না, কিছু বুঝ না! কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ মছে জোহরা অপ্রকৃতিস্থের মতো বলর, সাজুকে দাও আমার কাছে। চল শিগগির। লোকজন নেই, আমার বড্ড ভয় করছে।

ওরা যখন মুখোমুখি হয়েছিল, তার কিছু আগে থেকেই কিঞ্চিৎ হাওয়া বইতে শুরু করেছিল, আর যখন চুপচাপ চলতে শুরু করল, তখন একখন্ড ঈষৎ কালোমেঘ দক্ষিণ থেকে ধীরে ধীরে ভেসে আসতে লাগল। খড়ম পায়ে উঠোনে পায়চারি করছিলেন হাজি কলিমুল্লাহ, আকাশের দিকে চেয়ে তিনি চমকে উঠলেন। তা'হলে তার আন্দাজই ঠিক?

জৈগুন! ও জৈগুন! তিনি থমকে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, দেখে যা, আমরা যা ভাবছি তাই ঠিক। আসমানে সাজ দেখা দিয়েছে।

জৈগুন চৌকাঠের কাছে এসে মুখ বাড়িযে বললে, তবু তো আপনি বলছেন, আরো পরখ করতে। আমার মনে কোনো সুবা-সন্দে নাই। বাতাসী যা ছিনাল।

আকাশে চলমান মেঘটার দিকে চেয়ে আবার পায়চারি করতে লাগলেন হাজি কলিমুল্লাহ, এর বিচারটা কি হবে তিনি তার কিনারা করতে পারছেন না।

আধ ঘন্টা পরে জোহরা যখন এল, শুয়ে শুয়ে তার সঙ্গে আলাপ করতেও বারবার তাল কেটে যেতে লাগল, অনেক রাত পর্যন্ত চোখে ঘুম এল না।

মনস্থির করে পরদিন সকালে তিনি গিয়ে উঠলেন বাতাসীর বাড়িতে, পুবপাড়ার আমবাগানের ওধারে। বাঁশের চালার নিচটায় পাকালের ধারে বসে ও খুদের জাউ রাঁধছিল, হাজি সাহেবের সাড়া পেয়ে একটা চৌকি হাতে উঠানে এল। এমন গণ্যমান্য লোক, সাত জন্মে একবার এসেছেন ওর এখানে, কি দিযে মেহমানদারি করবে, সে ঠাহর করতে পারল না।

মাথায় কাপড় টেনে ও কি বলছিল সেদিকে হাজির মোটেই নজর ছিল না, তিনি গোপন আড়চোখে হরিদ্রাভ লাবণ্য-স্নিগ্ধ ওর দেহটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন।

এদিকে বাড়ির নাশতা-পর্বের তদারক শেষ হওয়ার পর জোহরা গুম হয়ে বসেছিল তার শোবার ঘরে চৌকির কিনারায়।

বিয়ে হওয়ার পর থেকে কিসের যেন এক আশ্চর্য মায়ায় বিনা কাজের সময়টুকু সে এখানটায় বসেই কাটিয়ে দেয়। এ কিসের জাদু? কিসের মন্ত্রণা? জোহরা তা বুঝতে পারে না। বাড়ির চেহারা বোধ হয় অনেকদিক থেকেই অদল-বদল হয়েছে, কিন্তু এ গিন্নিদের হাতের ছাপ অনেক কিছুতেই এখনও টাটকা হয়েই আছে, অন্ধকারে বসে থাকলে তাদের ঠোঁটের ফিস্‌ফিস্‌ আলাপও যেন সে শুনতে পায়। তখুনি ওর মনে হয়, এ ঘরে ঢোকবার কোনো অধিকার তার নেই, এখানকার সব দখল করে সে ডাকাতের কাজ করল।

কিন্তু আমার কি দোষ? আমি তো রাজি হতে চাইনি? নানা বলল, বোন কাঁদিসনে দু'একটা বছর সবুর কর, বুড়োটা মরল বলে। তখন বেশ জোয়ান দেখে একটা বর জুটিয়ে দেব। এখনসম্পত্তিটা হাত করে নে। জোহরা আপন মনে আওড়াল, ছাই সম্পত্তি!

দগদগে ঘা'র ওপর দিয়ে গরম বাতাস বইতে থাকলে যেমন করে জ্বলে, ওর বুকের ভিতরটা তেমনি করে জ্বলতে লাগল। দম যেন ক্রমেই বন্ধ হয়ে আসছে, এক সময় সে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। ওর চোখের দুটো তারায় জ্বল্‌জ্বল্‌ করতে লাগল একটা দুর্বিনীত বন্যতা।

মগজটা গিস্‌গিস্‌ করছিল, এলোচুলে ঝাঁকড়া মাথাটা একবার ঝাড়া দিয়ে জোহরা বাইরে চলে এল। চোখ তুলে চাইতেই ওর দৃষ্টি পড়ল কুয়োর ধারে মেহেদি গাছটার দিকে, ভিজে মাটির রসে তাতে ঘন হয়ে কচি পাতা দেখা দিয়েছে।

ক'দিন সংকল্প করেও সে এই মেহেদি গাছটা কাটতে পারে নি। কিন্তু আজকে ডান হাতটা শির্‌শির্‌ করতে লাগল। ত্রস্ত পায়ে সে চলে গেল রান্নাঘরের ভিতরে। সেখান থেকে ধারাল বটিটা এনে একেক কোপে এককটি ডাল কেটে ফেলতে লাগল।

আহা হা, করেন কি গিন্নি মা— জৈগুন দৌড়ে এল। বলল, গাছটা অনেক দিনের, মানুষের কত কাজে লাগে। কর্তা শুনলে ভীষণ রাগ করবেন।

তুই এখান থেকে যা তো। কে রাগ করবেন, না করবেন, তোর চাইতে আমি ভালো বুঝি। আমার ইচ্ছা হয়েছে আমি কাটবোই।

আমি কাম করে খাই, আর কি। আপনার ভালর জন্যই বলছিলাম।

আশ্চর্য! জোহরা মুখ তুলে চাইল। বলল, আমার ভালো-মন্দের চিন্তা তোকে করতেহবে? দুনিয়াতে আর লোক নেই!

কর্তার প্রিয় গিন্নিকে আর ঘাঁটাতে সাহস করল না জৈগুন, মুখ কালো করে সে নিজের কাজে চলে গেল।

কেমন করে দুপুর হল, কেমন করে এল বিকেল, আর কেমন করেই বা রাত্রি এসে

পৃথিবীর মুখ ঢেকে দিল, জোহরা কিছুই বলতে পারবে না। তার হৃদয়ের একটা অংশ কে যেন ঝকঝকে ধারাল ছুরি দিয়ে কেটে নিয়ে গেছে, প্রতিদিনের উচ্ছল ঢেউ সেখানে লাগে না, সেখানে তুষের আগুনের মতো শুধু একটি জ্বালা।

এশার নামাজরে পর বিছানায় শুয়ে হাজি কলিমুল্লাহ বললেন, যা ভেবেছিলাম, বাতাসীই কুকাম করেছে।

কেমন করে জানলেন? জোহরা শুধাল।

এসব জানতে কি আর খুব বুদ্ধি লাগে? তারে ঠিকমত ঘা দিলাম আর তা বেজে উঠল। ব্যস, আর ভাবনা নাই। বিচারটা করতে পারলে বিষ্টি হবেই। হাজি একটুখানি নীরব থেকে বললেন, আগামী শুক্রবারে রাত বারোটার পর বিচার বসাব। দেখা যাক কী হয়।

জোহরা চুপচাপ শুয়ে বাইরের দিকে কান পেতে রইল। আমের বোলের গন্ধ এমন মাতাল কেন? রাত কেন এমন কালো, অন্ধকার? সূর্য যদি আর না উঠত, তাহলেই ছিল ভালো, সবার চোখের আড়ারে চিরদিনের জন্য সে হারিয়ে যেত, যেখানে কেউ নেই, কেউ থাকবে না।

কপালে কোমল হাতের ছোঁয়া পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই নাক ডাকাতে শুরু করলেন হাজি কলিমুল্লাহ। ওই শব্দটুকু বাদ দিলে, জোহরার মনে হল, তার পাশে শুয়ে আছে একটা মৃত লোক, বুক থেকে পা পর্যন্ত শাদা কাপড়ে ঢাকা। সে লোমশ হাতটা ছাড়িয়ে কিছুক্ষণ চুপ হয়ে রইল। এরপর আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল। অতি সন্তর্পণে দরজার খিলটা খুলে উঠানের একপাশে আমগাছতলায় এল।

সারাদিন কোথায় ছিলে তুমি? কালেদ চুপিচুপি বাড়ির ভিতরে ঢুকতেই সা করে তার সামনে গেল জোহরা, চাপ-গলায় বলল, না খেয়ে থাকতে খুব ভাল লাগে, না?

কথা বলার চেষ্টাও না করে খালেদ থ হয়ে রইল। হঠাৎ ডান হাতটা তুলে ওর গালে একটা চড় মেরে ক্ষিপ্তের মতো জোহরা বলর, আমি আর এত কষ্ট সইতে পারবো না। বাড়ি থেকে চলে যাও, চলে যাও তুমি!

কাপড় দিয়ে মুখটা ঢেকে ও প্রায় দৌড়ে উঠে গেল বারান্দায়, ঘরের ভিতরে গিয়ে খিল এঁটে দিল।

খালেদ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল। তার দুই চোখ থেকে ঝর্‌ঝর্‌ করে পানি পড়ছে, কণ্ঠ রোধ হয়ে আসছে। ভোরবেলায় অন্যেরা ঘুম থেকে ওঠার আগেই সে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল, নদীর ধারে ধারে জমির আলের ওপর দিয়ে মিছিলি সে হেঁটে বেড়াল, এরপর চলে গেল বন্দরে, তার বড় দুই ভাই যেখানে কাজ করেন, সেই গদিতে; কিন্তু কোথাও মন টিকলো না। শেষ পর্যন্ত কী যেন এক অজানা আর্কষণে বাড়ির দিকে রওনা হয়েছিল।

শুক্রবারে রাত বারোটা বেজে গেলে একে একে সবাই গিয়ে হাজির হল মৌলানা মহীউদ্দিনের বৈঠকখানায়। এর আগেই কানাঘুষার মারফতে ব্যাপারটা সারাগ্রামে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সবার তো আর বিচারের ক্ষমতা নেই? আজকের মজলিশ শুধু গ্রামের আলেমমন্ডলী ও মাতব্বরদের নিয়ে। দরজা-জানালা বন্ধ করার পর আসামীদের মাঝখানটায় বসিয়ে তাঁরা আলোচনা শুরু করলেন।

তিনদিন তিনরাত্রি হাদিস-কিতাব গেঁটে একটা পতোয়া তৈরি করেছিলেন হাজি কলিমুল্লাহ। মৌলানার অনুমতি নিয়ে তিনি তা পড়ে শুনালেন।

বাতাসী অনেক আগে থেকেই বিনিয়ে বিনিয়ে গুন্‌গুন্‌ করছিল, এবারে ডুকরে কেঁদে

উঠল। বিলাপ করে বলতে লাগল, ও মা গো, এ-ও আমার কপালে ছিল গো! আঁতুড়ঘরে কেন মুখে নুন দিয়ে মেরে ফেললে না গো!!

এই বেটি, কান্না থামা! হাজি ধমক দিয়ে উঠলেন। বলরেন, সে সময় বুঝি খুব ফুর্তি লেগেছিল?

মৌলানা মহীউদ্দিনকে বেশ চিন্তিত মনে হল। তাঁর সৌম্য মুখমন্ডলে বেদনাতুর গাম্ভীর্যের কান্তি। ধীরে ধীরে মুখ তুলে তিনি শান্তগলায় জিগগেস করলেন, কিগো, তোমার কিছু কওয়ার আছে?

কি কইব বাবা, আপনারা তো গরিবের কথা বিশ্বাস করেন না। আমরা তো মানুষই নই, কুকুর বেড়াল! আমাদের আবার ইজ্জত কি! বাতাসী চোখ মুছে বলল, না হলে এমন বদনাম আপনারা আমার উপর ফেলতে পারতেন।

কিন্তু এসব কথা তো আর আসমান থেকে পড়ে না! হাজি কলিমুল্লাহ বললেন, অন্য কারো নামে তো ওঠে নি?

সে আমার কপালের দোষ। না হলে, ও বেঁচে থাকতেই আমি কতবার বমি করেছি, প্রতিরোজ পোড়ামাটি আর তেঁতুল না খেয়ে থাকতে পারিনি— এসব জিনিশ কারা চোখে পড়ত না?

একটা ময়লা কাঁথা গায়ে জড়িয়ে বসে বসে কোঁকাচ্ছিল বাতাসীর মামাতো ভাই রহিমদ্দি। তাকে সওয়াল করলে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে তাকিয়ে রইল শুধু।

বিচারের আলোচনা যখন এগিয়ে চলছিল, তখন দক্ষিণ দিক থেকে পালে পালে কালোমেঘ এসে সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলছিল। চাঁদ বারে বারে আড়ালে পড়ছে, গাছপালা ও খামারে নদীতে আলোছায়ার লুকোচুরি।

এক সময় বাতাস বন্ধ হয়ে গেল, অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল সারাটা প্রকৃতি। ঘরবাড়ি কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে মাঝে মাঝে গুরুগুরু আওয়াজ উঠল, সঙ্গে সঙ্গে চমকাল বিদ্যুৎ। ঘরের ভিতর সবাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল।

ঠিক এমনি সময় হাজি সাহেবের বাড়ির পিছনটায় আমগাছের নিচে দাঁড়িয়েছিল একটি মানুষের ছায়ামূর্তি। পা টিপে টিপে খোলা জানালার কাছে এসে অনেকক্ষণ সন্ধানী দৃষ্টিতে চেয়ে রইল, ঘরের ভিতরে আলো নেই; নাম-না-জানা অরণ্যের ভিতরে কোনো প্রেতপুরীর মতো সমস্ত বাড়িটা রুদ্ধনিঃশ্বাসে ঝিম ধরে আছে।

জানালা থেকে সরে এসে মূর্তিটা ভিটির ধার ঘেঁষে চলতে শুরু করল, রান্নাঘরের পাশ দিয়ে ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। একেকবার বিজলি চমকায়, আর সে যেন শিউরে ওঠে গভীর আতঙ্কে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বাতাস বইতে শুরু করল, মেঘে মেঘে সংঘাতে, গর্জনে চারদিক তোলপাড় হতে লাগল। দরজাটা হয়তো ভেজানো ছিল, আচমকা দমকা হাওয়ায় তা সশব্দে খুলে গেল। মানুষটা ত্রস্তপদে এসে উঠল বারান্দায়, এদিক-ওদিক খানিক চেয়ে এক সময় মরিয়া হয়েই যেন ঘরে ঢুকে পড়ল। ওপরে-নিচে কেবল শব্দ শব্দ আর শব্দ। জোর বাতাসের তোড়ে একেবার মোচড় খেয়ে ওঠে করগেটের চালগুলি, কাঠের বেড়ায়অবিরত ধুপধাপ আওয়াজ।

খাটের কাছে এসে ইতস্তত করতে লাগল মানুষটা, কি করবে যেন টিক করে উঠতে পারবে না। শরীরে লোমগুলি কাঁটা দিয়ে উঠেছে, ঢিব্‌ঢিব্‌ করছে হৃৎপিন্ড, চিন্‌চিন্‌ করে মস্তিষ্কে রক্ত উঠে চোখ জোড়া ঝাপসা করে দিচ্ছে। তার ভাবনা, কোথায় এল সে? একি জন্ম

না মৃত্যু? একি সব হারানোর হাহাকার, না মিলনের উন্মত্ত রংরাগ? কান পেতে সে যেন শুনল, চুড়ির রিনিঠিনি, একটি গভীর শান্ত নিঃশ্বাস, কাপড়ের মৃদু খস্‌খস্। ঘ্রাণে আসছে একি আমের বোলের, না চুলের গন্ধ? না, না এখানে নয়। এতো সে চায় না, চাইতে পারে না।

এক পা দু'পা করে সে পিছিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় অনুভব করল, একটা সুপুষ্ট নম্র মসৃণ হাত অন্ধকার থেকে উঠে এসে গানের কলির মতো পরম আশ্বাসে তার হাতকে আকর্ষণ করল।

তখন সমস্ত আকশে মেঘেদের হুড়োহুড়ি লুটোপুটি লেগে গেছে, মন্দ্র-গর্জনে একেবার কেঁপে কেঁপে উঠছে সারা পৃথিবী। একটানা ঝড়ের তীব্র বেগে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে গাছপালা, মত্ত হয়ে কে যেন লেগেছে লুণ্ঠনের উচ্ছৃঙ্খল তৎপরতায়। স্বর্গ-মর্ত্য পাতাল মন্থন করে যেন এক মহাপ্রলয়ের উচ্ছ্বসিত শব্দের ভয়ংকর-সুন্দর রাগিণী।

এভাবে কতক্ষণ ঝড় চলল হয়তো কেউ বলতে পারবে না। বাতাস যখন কমতে লাগল, কখন অযুত মুক্তাবিন্দুর মতো নামল বৃষ্টি।

ধারাল হাওয়ার সঙ্গে প্রথম যখন বৃষ্টি নামল, তখন তাতে রইল শুধু নবজাতকের বিক্ষোভ, ঘরবাড়ির ওপর দিয়ে শুধু ঝর্‌ঝর্ ঝাপটা দিয়ে গেল। কিন্তু বেশিক্ষণ এ রইল না। ধ্রুপদ সংগীতের বিলম্বিত লয়ের মতো বাতাস যতই কমতে লাগল, বর্ষণে ততই এল নিবিড়তা। এরপর শুধু ঝম্‌ঝম্ শব্দ।

এভাবে কতক্ষণ কেটে গেল, জানা নেই। এক সময় খোলা দরজা পার হওয়ার পর উঠানে নেমে বৃষ্টির মধ্য দিয়েই টলতে টলতে উত্তর-ভিটির ঘরের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল মানুষটা। তার পিছনে পিছনে এসে জোহরা এলোমেলো কাপড়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। তার শরীর ভিজে যেতে লাগল বৃষ্টির ছাটে।

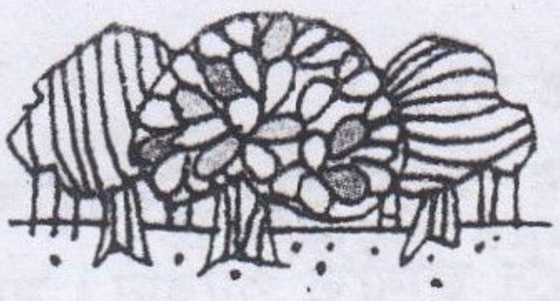
খানিকক্ষণ পরে একটা ছাতা মাথায় ঘাড় নিচু করে ধুঁকতে-ধুঁকতে বাড়িতে ঢুকলেন হাজি কলিমুল্লাহ। হঠাৎ তাকে দেখতে পেয়ে জোহরা বলে উঠল, অত দেরি যে! আর ইদিকে আমার বড্ড ডর লাগছে!

কি আর করি বল, আপদ চুকিয়ে এলাম! ছাতাটা বেড়ায় ঠেস দিয়ে রেখে হাজি বললেন, সে একটা পাঁড় হারামজাদী, শেষ পর্যন্ত কিছুতেই দোষ স্বীকার করল না। কিন্তু বাতাসীর মতো মেয়েলোকের ফাইফুই বুঝি আমি ধরতে পারি না? দুটোকে দিলাম পঞ্চাশ জুতো করে, তার ওপর কালকে গাঁ ছেড়ে চলে যাবে। দেখলে আল্লার রহমৎ? সঙ্গে সঙ্গে বিষ্টি নামল!

হ্যাঁ, তাইতো, বড় তাজ্জব ব্যাপার! কথাটা শেষ করে ঝর্‌ঝর্ বৃষ্টির মধ্যে বারান্দা থেকে উটানে নেমে গেল জোহরা, তার অঙ্গভঙ্গি রহস্যময়।

হাজি হৈ হৈ করে উঠলেন, বললেন, আরে, আরে করছ কি? তুমি পাগল হলে নাকি? এতরাত্রে ভিজছো, সর্দি করবে যে!

না, সর্দি আমার কোনকালেই করে না! জোহরা বারান্দার কাছে এল। চোখের উপর থেকে একরাশ চুল ডানহাতে সরিয়ে ফোটা ফুলের মতো উজ্জ্বল মুখটা তুলে মধুর-হাসি ওপচানো ঠোঁটে বলল, আপনি জানেন না? বছরের পয়লা বিষ্টি, ভিজলে খুব ভালো এতে যে ফসল ফলবে।



লালজুতো

আরে আপনি, এখানে যে! আচমকা একটি কলকণ্ঠ। একপাশে এসে থামা রিক্‌শা থেকে নেমে সামনে এসে মনোরম-ভঙ্গিতেদাঁড়াল মেয়েটি। বলর, কি ব্যাপার?

সাক্ষাৎটা এমনি আকস্মিক, মাহবুব প্রথমটায় থতমত খেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এ-শুধু দু'এক মুহূর্তের জন্য। রুমাল দিয়ে মুখটামুছে ও মৃদু হেসে বলল, এ প্রশ্নটা আমিও তো করতে পারি।

তার জওয়াবটাও অতি সোজা! মানে এটিই আমাদের বাসা। ওর একটা গেটের সুমুখে দাঁড়িয়েছিল, তার ভিতর হালপ্যাটার্নে তৈরি দোতালা বাড়িটার দিকে ইশারা করল সেলিনা খানম। এরপর একটু থেমে ঈষৎ গ্রীবা বাঁকিয়ে আপাদমস্তক দেখে নিল মাহবুবকে, তার ঠোঁটের কোণে রহস্যভরা মৃদু হাসি। বলল, উহ্ যা রোদ! চলুন একটু বসবেন।

কিছু ভাববার সময় নেই। মেয়েটি চলতে শুরু করলে কোনো এক অদৃশ্য আকর্ষণে মাহবুব তাকে অনুসরণ করল মন্ত্রমুগ্ধের মতো, ওর আহ্বানে আপত্তি জানাবার প্রশ্নও যেন ওঠে না। তিনদিকের পাঁচিলের ভিতরে বারান্দার নিচেকার চত্বরটা ঘন মসৃণ দূর্বায় ছাওয়া, মাঝখানে শান আর সুর্কি দিয়ে যে গোলাকার বৃত্তটি রচনা করা হয়েছে, তাতে কয়েকটি সূর্যমুখীর গাছ, ছোটোবড়ো ফুলগুলি দুপুরের অফুরন্ত রোদে উৎসুক মুখ তুলে আছে। এছাড়া, প্রাচীরের ধার ঘেঁষে নানারকম পাতাঝোপ ও ফুলের গাছ। এমনিতেই বাড়িটা সুন্দর; কিন্তু তবু মাটির অন্তর থেকে নিত্যনতুন ঐশ্বর্যকে ফুটিয়ে তোলা এই চত্বরটা না থাকলে আভিজাত্য যেন পাঁকা মনে হতো। দু'দিকে লার কাঁকরে কেয়ারী-করা পথটা দিয়ে ওরা হেঁটে গেল বারান্দার দিকে।

আপনি একটু দাঁড়ান। আমি আসছি। বারান্দার মধ্যে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে বলল সেলিনা খানম। তার ছোঁটে এখনো সেই রহস্যভরা মৃদু হাসি।

এ-হাসির অর্থ কী? দেড় বছরে যতবার দেখা হয়েছে, ওর মনে পড়ে, এ-হাসি দিয়ে মেয়েটি তার দিকে তাকিয়েছে। অনেক ভেবেও মাহবুব এর কোনো কিনারা করতে পারেনি। মাঝে মাঝে ভেবেছে, এ এক প্রচ্ছন্ন পরিহাস, মিছরির ছুরির মতো, একেবারে মর্মমূলে গিয়ে বিঁধে। কিন্তু এই ভাবটা স্থায়ী হয়নি বেশিক্ষণ। বরং এ সামান্য অভিব্যক্তিকে উপলক্ষ করে সহস্র উদ্বেল অনুভূতি তার মনের তীরকে ছাপিয়ে ভাসিয়েদিয়ে গেছে অনেক অলস মুহূর্তে।

সেশনের শুরুতে ইউনিভার্সিটিতে ক্লাশ করতে গিয়ে প্রথম যখন এ-হাসির সম্মুখীন হয়, তখন মাহবুবের মনে এক আশ্চর্য আনন্দের শিহরণ জেগেছিল। এ অভিজ্ঞতা তার বাইশ বছরের জীবনে এই প্রথম। ওর মেসটি শহরের এক কোণায়। অনেক দূর থেকে হেঁটে যাওয়ায় সেদিন তার মিনিট দশেক দেরি হয়েছিল। বছরের প্রাথমিক বক্তৃতা হচ্ছে তখন। সে অনুমতির অপেক্ষা করল না। আস্তে আস্তে রুমে ঢুকে পিছনের বেঞ্চির কিনারায় বসলো। তার সামনে মেয়েদের বসবার জায়গা। ও ঘরে ঢোকা মাত্র ডান পাশে ফিরে তাকাল মেয়েটি, কিছুক্ষণ নির্নিমেষ চেয়ে থাকার পর একটা রহস্যময় মৃদু হাসি দিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল। অন্য ছাত্র, কিংবা প্রফেসর কেউ লক্ষ্য করেনি। কিন্তু ওর বুকের ভিতরটা

এমন তোলপাড় করছিল, মনে হচ্ছিল, সে স্পন্দন যেন সবাই শুনতে পাচ্ছে।

ছুটি হওয়ার পর সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিল। হাসপাতালের মোড়ে এসে উত্তরমুখো পথটা ধরে চলতে চলতে কখন রমনার ময়দানে গিয়ে পড়েছিল সে জানতে পারেনি। মুখ উঁচু করে চেয়ে দেখছে? ভালো লাগছে সবই।

সন্ধ্যার পর মেসে গিয়ে ও নোটখাতায় লিখেছিল, প্রথম বেঞ্চিতে ডানপাশে বসে সেই মেয়েটি। রং ও ফর্সা। সর্পিল গতিতে সযত্নে গাঁথা বেণী কটিদেশে গিয়ে পৌঁছেচে। কানের রিং মানিয়েছে চমৎকার। ওর গায়ে হালকা নীল ব্লাউজ, তার ভিতর থেকে গায়ের শুভ্রতা বেরিয়ে আসছে। আশ্চর্য ওর ঠোঁট ও চোখ, মুখের সবকিছুর সঙ্গে এমন সংগতি রেখেছে যে, তার চেহারায় একটা নির্মল সৌন্দর্যের মাধুর্য ফুটে উঠেছে। ওর স্থির সৌন্দর্যে পুরুষের বুকের স্পন্দন দ্রুততর হয় না, চঞ্চল করে তোলে না তার ধমনীর রক্ত। একটা শান্ত ভালবাসার স্নিগ্ধতায় মনপ্রাণ ভরিয়ে দেয়।

মাঝে মাঝে যখন সে চঞ্চল হয়ে ওঠে, তখন দেখা যায়, তার চোখজোড়া বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল। সব জিনিশে ওর যেন একটা স্বাভাবিক কৌতূহল আছে।

কিন্তু তার হাসির বুঝি তুলনা নেই। আজ সে হাসির প্রশান্তি আমার মনে বিস্তর আবেগের প্লাবন এনেছে। আমি কি করব? কী করব আমি?

সবচেয়ে বড়ো কথা, এই মেয়েটির মধ্যে সে তার মানস-প্রতিমাকে খুঁজে পেয়েছিল। রূপকথার রাজপুরীর মধুর নীল স্বপ্নের মতো একটা অনির্বচনীয় মায়া দিয়ে তার দিনগুলিকে নিয়ে গিয়েছিল ওর কল্পনা।

রৌদ্রে মুখ উঁচিয়ে থাকা সূর্যমুখী ফুলগুলির দিকে চেয়ে মাহবুব তন্ময় হয়েছিল। এক সময় জুতোর খস্‌খস্‌ শব্দ শুনতে পেয়ে ফিরে তাকাল। হাসতে হাসতে এগিয়ে আসছে সেলিনা খানম। তার সুন্দর শাদা দাঁতগুলি মুক্তোর মতো, রক্তিমাভ গন্ডদেশে ডৌল পড়েছে। মাহবুব শুনল মেয়েটি বলছে, আসুন। অনেকক্ষণ দাঁড়ালেন। কিছু মনে করবেন না।

সিঁড়ি মাড়িয়ে ওপরতলায় উঠতে গিয়ে মাহবুব লক্ষ্য করল, ওর পায়ে এখনো কর্কহীল লালরঙের জুতো। সামনেকার পিতের গ্রন্থিটা ওর নরম আঙুলগুলিকে যেন গভীর আগ্রহে কামড়ে ধরেছে। শাড়ির পাড়ের নিচটায় চলার চাঞ্চল্যে লুকোচুরি খেলছে তার পায়ের এক ঝলক শুভ্রতা। লালজুতো তার পায়ে যেন চিরস্থায়ী। দেড় বছরের যতবার দেখেছে সে, প্রত্যেকবারই দেখেছে ওর শরীরে পরিচর্যার রূপান্তর। বিশেষ করে এক শাড়িতে দু'তিন দিনের বেশি তাকে দেখেনি। কিন্তু পায়ের দিকটায় কোনদিন পরিবর্তন লক্ষ্য করেনি ওর।

আজকে আরো দেখল, অনেক ব্যবহারে বিবর্ণ হয়ে গেছে জুতো জোড়াটা। স্থানে স্থানে কালছিটে দাগ। হীলজোড়া থ্যাৎলানো;সেব ঢাকার জন্যই যেন শাড়িটা একটু বেশি ছেড়ে দিয়ে পরা। নতুন জুতো কেনার সামর্থ্য নেই, এ কথা বলা যায় না, অথচ কেন যে এখনো সে এগলি ব্যবহার করছে, সেটাই আশ্চর্য।

সিঁড়ি যেখানে শেষ হয়েচে, তার কাছে দরজা। ডোরা-কাটা মেরুন রঙের পর্দাটা সরিয়ে কামরায় ঢুকল ওরা দু'জন।

গদি আঁটা সোপাটা দেখিয়ে দিয়ে সেলিনা বলর, বসুন।

বসবে তো নিশ্চয়ই। কিন্তু কেমন একটা দ্বিধামিশ্রিত দীনতার অনুভূতি খেলে যায় মাহবুবের মনে। সোফাটা;নে দামী কেমন করে বসবে ও? তার পোশাক এ-কামরায় মোটেই

খাপ খায় না।

কী ভাবছেন, বসুন!

হ্যাঁ, তাতো বটেই!

একটা ম্লান হাসি খেলে গেল ওর ঠোঁটের কোণায়। নরম সোফাটায় গা এলিয়ে বসে ও অনুভব করল, একটা অদ্ভুত অসোয়াস্তি তার অস্তিত্বকে চারদিকে থেকে ক্রমেই চেপে ধরছে। মেয়েটার ব্যবহারে সারল্যের কান্তি ওপচানো, তাতে মনে কোনরকম দ্বিধা থাকার কথা নয়। কিন্তু তবু সে মুখ তুলে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারে না। সে যদি একা থাকতে পারত এই কামরায়।

কপালে ছড়িয়ে পড়া চুলের গোছাটা ডানহাতে সরিয়ে দিয়ে মাহবুব বলল, এক গেলাস পানি খাওয়াতে পারেন?

এদেশে পানি কী এমন দুষ্প্রাপ্য। মেয়েটি হেসে বলল, একটু বসুন!

ও চলে যাওয়ার পর সমস্ত কামরাটা মাহবুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। একদিকে একটা ছোটো খাট, ভারি মেট্রেসের ওপর বর্ডার সেলাই করা ধবধবে চাদর। শিয়রের দিকে দুটো বালিশ পরিপটি করে সাজানো। বই রাখবার রিভলভিং শেলফটা এমন দূরত্বে রাখা, যাতে শুয়ে থেকেই মনোমত একখানা বই টেনে নেওয়া যায়। মাহবুব বুঝল, কামরাটা মূলত ড্রয়িংরুম হলেও, কোনো একজন মানুষ এখানে শোয়। আস্তে আস্তে ওর দৃষ্টি নিচে থেকে ক্রমেই ওপরে উঠতে লাগল। তিনদিকের দেয়ালগুলি দেখে ও যেন চমকে উঠল। ছবি, ছবি। শিল্পীদের আঁকা হরেক রকম ছবি, যেন ছোটোখাটো একটা প্রদর্শনী।

একটার পর একটা চবি দেখে মনে হল, অধিকাংশই ওর চেনা। গত তিন বছরে ঢাকা শহরে যত আর্ট একজিবিশন হয়েছে, সবগুলিই ও দেখেছে। এই ছবিগলি সেইসব একজিবিশন থেকেই কেনা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

গত ডিসেম্বরের একজিবিশনটার কথা ওর মনে পড়ল। প্রদর্শনীটা হয়েছিল মিউজিয়ামের দালানে।

পশ্চিমে ঢলে-পড়া সূর্যের লালআলো গাছপালার ফাঁক দিযে এসে পড়েছে সিঁড়িতে, বারান্দায়। গায়ে লাগছে নরম শীতের ছোঁয়া। প্রাচীন থামটায় হেলান দিয়ে একটা সিগারেট টানল মাহবুব, এরপর হাতে গুটিয়ে রাখা ছাইরঙা কোটটা গায়ে চড়িয়ে প্রদর্শনী দেখতে ভিতরে ঢুকল। গোড়া থেকেই সে ছবির অনুরাগী। সত্যিকথা বলতে গেলে, চিত্রকলার সে একজন ছোটোখাটো ক্রিটিক। আর একবার যে একজিবিশন হয়েছিল, তার ওপর খবরের কাগজে সে রিভিয়ু লিখেছিল। রচনাটা হয়েছিল ধার আর ভারে সমান জমকালো। আলোচনা প্রসঙ্গে সে লিওনার্দো দা ভিঞ্চি থেকে পাবলো পিকাসো পর্যন্ত অনেকের নাম উচ্চারণ করেছিল, আর এই সঙ্গে ক্লাসিজিম থেকে স্যুররিয়ালিজম পর্যন্ত বিভিন্ন শিল্প-আন্দোলনের উল্লেখ করতেও ছাড়েনি। কাজেই ব্যাপারটা হয়েছিল রীতিমতো লোমহর্ষক।

সমালোচনা বেরুবার পর কিছুদিন অনেকে তাকে সমীহ করতে লাগল। বিমেষ করে, শিল্পীরা। সে একজনকে বলতে শুনেছে, ছেলেটা সত্যিই গুণী। অনেক জানে শোনে।

কেবল আর্ট-ক্রিটিক হওয়া নয়, নিয়মিত ছবি দেখার পেছনে অন্য একটা কারণও আছে। সে একজন কবি। আর বয়েস যেহেতু একুশ-বাইশ, সেজন্য তরুণও বটে। সে কবিতা লেখে, মাঝে মাঝে ছাপা হয় মাসিক পত্রিকায়, তাই তাকে নামজাদা না-হোক,

চলিতনামা বলতেই হবে। আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে তার কতগুলি আইডিয়া আছে। ও সেগুলিকে নিজের উদ্ভাবন বলে দাবি করে। সেসবের মধ্যে একটি হল এই যে, সমসাময়িক চিত্র, সঙ্গীত, নাটক, কবিতা— এক কথায় ললিতকলার প্রত্যেকটি ধারা পরস্পর সম্পৃক্ত। সেজন্য একজন কবিকর্মীর পক্ষে সাম্প্রতিক সংস্কৃতির প্রত্যেকটি ধারা সম্বন্ধেই গভীর অনুসন্ধিৎসা ও জ্ঞান রাখা প্রয়োজন, না হলে তার রচনা ধূসর অনুর্বরতার চোরাবালিতে মৃতপ্রাণ হতে বাধ্য।

সেদিন ছবি দেখতে দেখতে অয়েল পেন্টিং সাজানো ছোট্ট কামরাটায় প্রবেশ করল ও। ডানদিকে চাইতেই চোখে পড়ল, এই মেয়েটি, দেয়ালে টাঙানো একটা স্টীল লাইফের দিকে চেয়ে আছে।

আরে আপনি যে! তাকে পেয়ে যেন খুশি হল সেলিনা, যাক্, ভালোই হল। মাথামুন্ডু কিছুই বুঝছি না। আমাকে একটু বুঝিয়ে দিন না, আপনি তো ভালো ক্রিটিক। মাহবুব হেসে বলল, তাই নাকি?

তা নয়তো কী? গতবার যে সমালোচনা লিখেছিলেন আমি বুঝি পড়িনি?

ওসব কিছু নয়। নিজে দেখে যেটুক বোঝা যায়, তাই আসল বোঝা।

কিন্তু আমি যে বুঝতে পারছি না? মেয়েটির কথায় এমন একটা নির্বোধ সারল্যের সুর বাজল, মাহবুব কৌতুক বোধ না করে পারল না।

ওর ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটে উঠল। বলল, বুঝতে পারছেন না? তাহলে তো মুশকিল!

অবশ্য ছবিটা আমার খারাপ লাগছে না। মেয়েটি বলতে লাগল, শিল্পী যেভাবে রং ব্যবহার করেছেন, তাতে বোঝা যায়, তুলির ওপর তার হাত আছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হল, ছবিটায় তিনি কী বলতে চাইছেন? এখানে দেখা যাচ্ছে, একটি লোক তার কাঁধে গুণ, বাঁশের হাতলটা চেপে ধরে সে সামনের দিকে বেঁকে নুয়ে পড়েছে। এতে কী বোঝায়? বোঝায় একটা ক্লান্তির ভাব, একটা গভীর ক্লান্তি। অথচ ছবিটার নাম স্বপ্ন। মানুষের কাছে স্বপ্নের মানেই হল আশা, যা পাইনি তার জন্য কল্পনার জাল বোনা। বাস্তব-জীবনের ফাঁকগুলিকে আমরা স্বপ্নের রামধনু দিয়ে ভরে তুলি, আর এভাবেই থাকি বেঁচে। কিন্তু এখানে সে-ভাবটা কোথায়?

মেয়েটির কথা শুনতে শুনতে মাহবুব কিছুক্ষণ থ হয়ে রইল। ও যে এমনভাবে কথা বলতে পারে, বাইরে থেকে তা আন্দাজ করার জো নেই।

মাহবুব বলল, আপনি না বলেছিলেন ছবিটা বোঝেননি!

তা তো ঠিকই!

কিন্তু এতক্ষণ যা বলরেন তাতে মনে হল, আপনি যে দৃষ্টিতে ছবিটা দেখেছেন, তাই টিক। শিল্পকে জীবনের পাশাপাশি বিচার করতে পারাটাই সত্যিকারের সমালোচনা। আর আপনি তা করেছেন।

না, আমি কিছু ভেবে বলিনি। ছবিটা দেখে যা মনে হল, তাই বললাম। কামরার এক কোণায় গিয়ে সেলিনা জিগ্‌গেস করল, আপনার কোন্ চবিটা সবচেয়ে ভালো লাগল?

এক কথায তা বলা মুশকিল। মাহবুব প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যেতে চাইল। বলল, একেকটা ছবি একক দিক থেকে ভালো লাগে।

সেলিনা মাথাটা দুলিয়ে বলর, তবু শুনি না!

এরপর মাহবুব যে তিনটি ছবির কথা বলেছিল, আজকে সোফায় বসে ও আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করল, তার দুটোই দেয়ালে টাঙানো রয়েছে। তার মধ্যে একটা ওয়াটারকালার। আরেকটি স্টীল-লাইপ। একটাতে আদিগন্ত ঢেউখেলানো শস্যপ্রান্তর ছেয়ে আছে হলুদে সবুজে; মাঠের মাঝখান দিয়ে সীঁথির মতো কাঁচা মাটির পথটায় চলছে একটা গরুগাড়ি, চারদিকে অফুরন্ত রঙের সমারোহ। এই রং থেকেই যেন বিন্দু বিন্দু হয়ে ঝরে পড়ছে জীবনের দুর্লভ প্রাচুর্য। অন্যটিতে টেবিলের ওপর একটা চীনেমাটির প্লেটে কাটা তরমুজের ফালি, পাশে রাখা মদের বোতল, সিগারেটের প্যাকেট, আর একটা দেশলাই; প্লেটটার কাছে ফেলে রাখা মানুষের মাথার খুলি ও একটা হাড়। এ ছবিতে যে-সত্যের প্রতিচ্ছায়া তাতে অন্ধ নিয়তির স্বীকৃতি কিন্তু তা জীবনের প্রবহমান অগ্নিদীপ্তিকে এতটুকু ম্লান করেনি।

সেদিনকার আলোচনার এর বেশি তার স্মরণে আসছে না। কিন্তু ও এতটুকু বুঝতে পারছে, এই ছবি দুটো কেনার পেছনে নিশ্চয় রয়েছে তার কথার প্রেরণা।

মনে মনে খুশি হয়ে উঠল মাহবুব, তাহলে সে একেবারে অপদার্থ নয়। চেহারায়, কথায়, ব্যবহারে, অথবা যে-কোনো প্রকারে অন্যজনকে প্রভাবান্বিত করতে পারাটাই হল ব্যক্তিত্ব। আজ হঠাৎ সে উপলব্ধি করল, ব্যক্তিত্ব তার আছে।

নিজের মধ্যে লুকানো এই অমূল্য সম্পদের আবিষ্কারে মন থেকে বাষ্পের মতো দীনতাবোধটা কেটে যেতে লাগল। ও নড়েচড়ে বসল সোফাটায়। তার ঘামেভেজা মুখের রেখায় রেখায় আত্মপ্রত্যয়ের স্থিরতা ফুটে উঠতে লাগল।

দেরি হয়ে গেল, কিছুমনে করবেন না! মামা-চাকর রান্নায় ব্যস্ত কি করব। কারুকার্য-করা কাচের ট্রে-র ওপর অরেঞ্জ স্কোয়াস ও পানির গেলাসদুটো সাজিয়ে অপর কামরা থেকে এল সেলিনা খানম, তাঁর ঠোঁটের কোণায় স্মিত হাসি।

এ সবের কি দরকার ছিল। শুধু পানি আনলেই চলত!

শুধু পানি কি আর দেওয়া যায়!

কেন যাবে না?

আপনি যে অতিথি! সেলিনা বলর, তাও আবার নতুন!

ও এই কথা! কিন্তু দেখবেন আতিথ্য দেখাতে গিয়ে আমাকে সৎকার করে ফেলবেন না যেন।

না। সে ভয় নেই। খানিকক্ষণ চুপ থাকার পর মুখ তুলে সেলিনা বলল, সে যদি হতো, তাহলে আরো বড় আয়োজন দেখতে পেতেন।

মাহবুব অনুভব করল, এতক্ষণ পরে তার ভিতরকার কুণ্ঠিত পুরুষটা আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠছে। গেলাসে একটা চুমুক দিয়ে বলর, কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন, কোনো মেয়ের ডাকটাই সবচাইতে বড়ো আয়োজন। এরপর যা পাব তাহল উপরি পাওনা।

তাই নাকি? সেলিনা হাসতে হাসতে যেন টুকরো হয়ে ভেঙে যেতে লাগল।

অত হাসছেন যে!

না এমনি। ও বলল, আপনি সত্যিকার কবির মতোই কথা বলছেন। যাক্, আমার ডাকটা যে আপনার ভালো লেগেছে সেজন্য ধন্যবাদ।

এর আর প্রয়োজন নেই। আমার যা পাওয়ার তা অনেক আগেই পেয়ে গেছি।

কি রকম?

সব কথা কি আর বলতে আছে?

বললে দোষ কি?

দোষ কিছু নেই। মাহবুব বলতে লাগল, আচ্ছা, আমাদরে মনে প্রতিমুহূর্তে যেসব কথা জাগছে, তার সবই কি আমরা সব জায়গায় বলতে পারি? আমি বলব, না। প্রত্যেক মানুষেরই একটা অংশ থাকে মনের নির্জনে, যেখানে সে একা। সেখানে একাই সে হাসে, কাঁদে স্বপ্ন রচনা করে। সেখানকার গভীর গোপনে যা মূল্যবান, তা বাইরে প্রকাশ করলে হয়তো চরম হাস্যকর শোনাবে। তার চেয়ে ভালো, নিজে নিজেই চেখে চেখে সে আবেগকে উপভোগ করা। আপনি কী বলেন?

আপনার যুক্তিটা মন্দ নয়। সেলিনা গলা নামিয়ে থেমে থেমে বলর, কিন্তু আমি বলি, মনে মেপে মেপে চলেই কি জীবনটা শেস করে দেব? যে জিনিশ ভালো লাগল,তাকে কাছে এনে নেড়েচেড়ে দেখতে পারব না? তাকে কাছে পেয়ে আমার মন যে সাড়া দিয়ে ওঠে, এ কথা বলতে পারব না? সব সময নিজেকে রেখে-ঢেকেই চলতে হবে?

মেয়েটির দৃপ্ত কণ্ঠস্বরে মাহবুব কিছুটা বিস্মিত হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে ওর প্রশ্নগুলির সন্তোষজনক জবাব সে দিতে পারেনি।

সামনের দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, ওপাশে নারকেল গাছের পাতাগুলি নড়ছে। একটা কাক উড়ে এসে বসলো। দুপুরের রৌদ্রে আকাশের নীল যেন চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছে, ওই সুদূরে ভ্রাম্যমাণ কালো বিন্দুর মতো উড়ে বেড়াচ্ছে কয়েকটি চিল। মাহবুব সেদিকে চেয়ে রইল, ক্ষণিকের জন্য নিজের মধ্যে যেন ও ডুবে গেল।

সেদিন ছবি দেখতে দেখতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছিল। অনেক লোক যাওয়া-আসা করছে। তাদরে পরনে হয়তো ছিল বিচিত্র পোশাক, চেহারায় হৃদয়ের রং। কিন্তু সেদিকে নজর দেওয়ার সময় ছিল না ওদের। প্রায প্রতিদিন দেখা পরিচিত মেয়েটির সান্নিধ্যেও যেন সে পেয়েছিল অপরিচয়ের নিবিড় রোমাঞ্চ, কথায় কথায় তার মনের পদ্যাপাপড়ি ধীরে ধীরে দল মেলেছিল।

পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে ওরা। একটা ওয়াটারকালার নিয়ে আলোচনা করছিল, এমন সময় একটা ছেলে প্রবেশ করল ব্রস্ততার সঙ্গে। বয়েস চবিপঁচিশ হবে। ফিটফাট চেহারা। পরনে কালো প্যান্ট, শাদা সার্ট। গলায় দামী টাই। চোখে চশমা। ঘরে ঢুকেই সে বলে উঠল, এই যে এখানে তুমি! আর আমি খুঁজে খুঁজে হয়রান।

ফিরে চাইল সেলিনা। তার গ্রীবাভঙ্গিতে চাঞ্চল্য প্রকাশ পেল। বলল, কেন কতক্ষণ এসেছ।

তা মিনিট দশেক তো হবেই। হাতঘড়িটার দিকে চেয়ে ছেলেটি বলর, তোমার না বারান্দায় থাকার কথা ছিল?

মনে ছিল না। ওর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল, ছবি নিয়ে আলাপ করছিলাম। ইনি মাহবুবু সাহেব, আমার ক্লাশফ্রেন্ড। নতুন ছেলেটাকে দেখিয়ে বলর, আর এ আমার আত্মীয, কবীর।

ভেরি গ্ল্যাড টু মিট ইউ! করমর্দন করার পর সে মেয়েটিকে বলল, সাড়ে পাঁচটা বাজে। চল শিগগির।

হাঁ চল সেলিনা মাহবুবের দিকে চেয়ে বলল, আচ্ছা আসি। আরেক সময় কথা হবে, কেমন? কালকে ক্লাশে যাবেন তো?

হাঁ, যাবো। মাহবুব বলল, থেমে থেমে। চেয়ে দেখলো, লালজুতোপরা দুটো শুভ্র পা খুট্‌খাট্‌ করে পালিয়ে গেল।

কে এল, কে চলে গেলে, তা নিয়ে ওর মাথা ব্যথার কোনো কারণ ছিল না। কেননা, এখানে সে রবাহূত। কোনো দিক থেকেই তার নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন নেই। কিন্তু তবু আশ্চর্য এক আবেগের ঝড় বুকে নিয়ে ও আচ্ছন্ন হয়ে রইল। তার মধ্যকার অবুঝ পৌরুষ কিছুতেই মেনে নিতে চাইল না, মেয়েটির জীবন-নাটকে ওর কোনো ভূমিকা নেই।

কিন্তু এ ভাবটা বেশিদিন টেকেনি। এরপর, এই চশমা-চোখ ছেলেটির সঙ্গে মেয়েটিকে দেখল অনেক জায়গায়। এক রিকশার ভিতরে, রমানর ময়দানে, লেকের ধারে, সিনেমায়। এদের মধ্যে সম্পর্ক যে কী ও জানতে পারেনি। জানার প্রয়োজনও হয়তো ছিল না।

সেদিন সন্ধ্যার পর হাঁটতে হাঁটতে মাহবুব সদরঘাটে চলে গিয়েছিল। ভালো লাগছে না আর মানুষের ভিড়। সে একা থাকতে চায়, একা। একটা বজরার ছাদের ওপর ওঠে অন্ধকারে তরঙ্গায়িত নদীর দিকে ও চেয়েছিল। শুনেছিল, কল্‌কল্‌ ঢেউয়ের ওপর দমকা হাওয়ার নিঃসঙ্গ সংগীত।

ও যখন মেসে পিরল, তখন অনেক রাত। শোবার আগে নোটবইটা বালিশের নিচে থেকে টেনে নিয়ে ও লিখেছিল, মশাদা কাগজে এখন আমি কালির আঁচড় টানছি। এ হয়তো এক আগুনের রং। কিংবা কোন গুণী কণ্ঠের দীপক রাগিণী। কিন্তু আজকে বিকেল সাড়ে পাঁচটায় যদি ওইটুকু ঘটনা না ঘটত, তাহলে আমার কালির আঁচড়ে হয়তো ধরা পড়ত অন্য কোনো গান। ও-টুকু ঘটনা, একটা রোক এল আবার চলে গেল, ওইটুকু ঘটনা শাদা কাগজের পাতাকে দিয়েছে বদলে। এখন এ-কাগজ ধূসর প্রান্তর, এখানে জাগবে শুধু মরীচিকার হাতছানি।

আগের যুগটাই ছিল ভালো। প্রথমে নির্বাচন, এরপরে জয় করে নেওয়া। প্রতিদ্বন্দ্বী আছে? তাতে বয় কী? তরবারির সঙ্গে তরবারির শক্তি পরীক্ষা। যে বেঁচে থাকবে, দিনের আলোয় গড়া তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল তরবারির মতোই তার প্রেম। আর যে মরবে, তারও অগৌরবের কিছু নেই। সে পরাজিত হবে মাত্র।

কিন্তু সভ্যতার একি লাঞ্ছনা? যাক বেছে নিলাম সে স্বয়ংম্বরা হলেও হয়তো সোনার হরিণ, তাই কোনোমতেই তাকে যায় না পাওয়া।

মাহবুব জানত, এ হচ্ছে কতগুলি ফাঁকা শব্দের শৃঙ্খল— যার অর্থ হয়তো আছে, কিন্তু হাতে নেই হৃৎপিন্ডের রক্তিমাভা। বেশিদিন নয়, বছরখানেক পরে যখন খুলে পড়বে, তখন তারই মনে হবে, এগুলি হচ্ছে যৌবনের অদ্ভুত আতিশয্য। এতে সত্যের দীপ্তি নেই, আছে শুধু বলার কথাকে রঙিন করে বলবার চেষ্টা এগুলি পড়ে তার অভিজ্ঞ মন হাসবে, এরপর সে নিজ হাতেই সব ছিঁড়ে ফেলে দেবে বাইরে। কিন্তু তা বলে এর কোনো মূল্য নেই, তা বলবে না সে। কেননা, যখন সে লিখেছিল, সেই মুহূর্তের জন্যে এই ছিল চরম সত্য।

ও জানত না, কখন পাঁচমিনিট কেটে গেছে নীরবতায়। মেয়েটি তার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল, তাও বলতে পারবে না। হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বর ওর কানে গেল। ও শুনল, কি চুপ হয়ে আছেন যে!

মাহবুব চমকে উঠল। বলল, না এমনি। আপনি যে প্রশ্নটা তুলেছেন, তাই ভাবছিলাম।

আগে গেলাসটা শেষ করে নিন।

ও ইয়েস! মাহবুব গম্ভীর মুখে বলল, আপনি যা বলেছেন, কথাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আঙুলে আঁচলের কোণটা জড়িয়ে কী ভাবল সেলিনা। এরপর গ্রীবা তুলে বলল, তা জানি না। তবু আমার মনে হয়, এছাড়া মানুষ বাঁচবে কেমন করে? মনকে চেপে কেউ বেশিদিন বাঁচতে পারবে না। অথচ এ জিনিশটা আমাদের সমাজ কিছুতেই মানবে না। একটু সহজভাবে চলতে গেলেই কুৎসা শুনতে শুনতে কানের পোকা পড়বে। জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে দু'দিনেই। কিন্তু আমি তা মানব কেন?

এক দমকা বাতাস ওর শাড়ির আঁচলটা নাড়িয়ে গেল। তার মনের উষ্ণতা সারামুখে উত্তাপের মত সঞ্চারিত হচ্ছে।

সোফায় আর বসে থাকতে পারল না সেলিনা খানম। উঠে দাঁড়িয়ে চঞ্চলভাবে পায়চারি করতে লাগল।

দেয়াল ঘেঁষে একটা ছোট্ট আলিমারি। ওদের বসবার জায়গা থেকে বেশি দূরে নয়। আলমারির কোণটায় কুই ভর করে দাঁড়িয়ে সেলিনা বলল, 'আপনিও কি মনে করেন, একটা মানুষকে বিচার করা খুবই সহজ? আমার মনে হয়, না। প্রতিটি ক্ষণের ব্যক্তিত্ব নিয়ে গোটা মানুষ। কাজেই তাকে বিচার করতে হলে তার ব্যক্তিত্বের সবটুকুই জানা প্রয়োজন। কিন্তু আমরা বিচার করি কি ভাবে? করি হয়তো একটা মুহূর্তের পরিচয় দিয়ে। এটা কি ঠিক?'

কি বলবে ঠাহর করতে না পেরে মাহবুব চুপচাপ বসে রইল। আজ দুপুর বেলায় নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে এমন একটা দৃশ্যপটের সম্মুখীন তাকে হতে হবে তা সে কল্পনাও করেনি। এই বাড়ির সামনেকার পথ দিয়ে এক বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছিল, এমন সময় দেখা। তারপর এতসব আলাপ-আলোচনা। ব্যাপারটা নাটকীয় বৈকি।

আপনি কবি, সমঝদার। তাই বলছি, কিছু মনে করবেন না, থেমে থেমে কথা কয়টি বলার পর সেলিনা মাথা নিচু করে রাখল বেশ কিছুক্ষণ। তার মুখে থমথমে গাম্ভীর্য। তাজা সজীব ঠোঁটজোড়া কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে গেছে। মুখ তুলে চাইতেই ওর চোখ ছল্‌ছল্‌ করে উঠল। গলা ঠেলে ওঠা কোনো গভীর বেদনাকে যেন সে অতিকষ্টে চেপে রাখছে। স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে সেলিনা বল, 'আচ্ছা আপনিই বলুন, আমাকে ছেড়ে চলে যাওয়া কি ওঁর ঠিক হয়েছে।

কে? আপনি কার কথা বলছেন?

দুইফোঁটা টলটলে পানি ঝরে পড়ল সেলিনার চোখ থেকে। আলমারির ওপর রাখা বড়ো ফ্রেমে বাঁধানো ছবিটার দিকে চেয়ে ও বলল, বলছি ওঁর কথা। আমার স্বামী।

ও। মাহবুবের মুখ থেকে একটা অদ্ভুত শব্দ বেরুল।

ছবিটার দিকে এতক্ষণ দু একবার ওর চোখ না পড়েছে এমন নয়, কিন্তু প্রতিবারই অস্পষ্টভাবে তার মনে হয়েছে, এ হয়তো কোনো নেতার ছবি। তাই ততটা মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করেনি। কিন্তু এবার পূর্ণদৃষ্টিতে চাইল। দেখল, দামী স্যুটপরা এক মাঝ বয়েসী ভদ্রলোক। বয়েস অনেক হবে। তবু চেহারায় প্রৌঢ়ত্বের ছাপও নেই। তার অর্ধেক মাথা জুড়ে চকচকে টাক, এ-যেন তার মনের সীমাহীন সন্তুষ্টির প্রতীক। দাড়ি গোঁফ সযত্নে কামানো। পুরু ঠোটের ফাঁকে যেন একটা সূক্ষ্ম কৌতুকের হাসি লেগে আছে। ছবির ফ্রেমটা জুড়ে একটা বকুল ফুলের মালা, শুকিয়ে কালো হয়ে আছে।

অর্ধেক গেলাস পানি ছিল। হাত বাড়িয়ে সেটা নিয়ে মাহবুব এক চুমুকে খেয়ে ফেলল। জিগগেস করল, উনি কোথায় গেছেন?

করাচি। ভেজা পাতাদুটো মেলে সেলিনা বলল, সেখানে চাকরি নিয়েছেন।

কদ্দিন হল?

তা প্রায় আটমাস। এর মধ্যে মাত্র দুটো চিঠি লিখেছেন। তাও পোস্টকার্ডে, দুচার কথায়। আপনিই বলুন এতে রাগ হয় না? আঁচলের খুঁটে চোখ মুছে সেলিনা বলতে লাগল, কেমন করে দিন কাটাচ্ছেন কিছুই লিখবেন না। লিখবেন কেবল, ভালো আছি। লিখলেই হল আর কি! আমি যেন কিছুই বুঝি না।

মাহবুব দেখল, ছবির চকচকে-মাথা ভদ্রলোক, স্মিতহাস্যে মেয়েটির কথাবার্তা লক্ষ্য করছেন। ও যেন তার জীবন্ত সান্নিধ্য অনুভব করল।

যে যাই বলুক, উনি আমায় ভুল বুঝলেন কেন?' সেলিনা আবার বলতে লাগল, কবীর আমার সাক্ষাৎ মাতাতো-ভাই। ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে থেকেছি, খেলেছি, ফুল কুড়িয়েছি। এর সঙ্গে চলাফেরা করাটা কি এমন খারাপ? অথচ উনি আমায় ফেলে চলে গেলেন। ভাবলেন না একটু এতবড় বাড়িতে একা একা থাকব কেমন করে ; একটা মামা, একটা চাকর তাতেই কি হয়?'

স্বপ্নাবিষ্টের মতো বসে বসে মাহবুব একের পর এক কথাগুলি শুনছিল। তার কোনো অনুভূতি নেই। হৃৎপিণ্ডটা যেন জমে পাথর হয়ে আছে।

ভাগ্যিস কবীর এসেছে। নাহলে এ বাড়িতে ভয়েই মারা যেতাম। ওর আবার নানান তাড়া। মেডিক্যাল স্টুডেন্ট কিনা। হাসপাতালে প্রায়ই ডিউটি দিতে হয়। দিনের বেলায় আটটা থেকে ক্লাশ। তখন থেকে তাকে প্রায়ই বাইরে কাটাতে হয়। কিন্তু রাত্রে থাকে এখানে তাইতে কিছুটা বাঁচোয়া। চারদিকে যা চুরিডাকাতি হচ্ছে? একটা ঢোক গিলে সেলিনা বলতে লাগল, এতবড় বড়ি, এর প্রত্যেকটা জিনিশই ওঁর নিজের হাতে গড়া। প্রত্যেকটা জিনিশই বাছাই করা, মনের মতো। ধরুন একটা ছবিই যদি চুরি হয়ে যায়, তাহলে সমস্ত বাড়িটা কানা হয়ে পড়বে না? অথচ এ দিকে খেয়াল নেই?

মাহবুব শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে রইল। ও কথা বলার চেষ্টাও করতে পারছে না। কি হল তার?

উনি বলতেন সব সময় হাসিখুশি থাকবে। জীবনটা দুদিনের বৈ তো নয়। কিন্তু এমন ব্যবহার করলে কি ভাবে হাসা যায়? কিন্তু আমি না হেসে থাকতে পারি না। তার কথায় কথায় এ-আমার অভ্যাস হয়ে গেছে।

ছবির চকচকে-মাথা ভদ্রলোক তেমনিভাবে চেয়ে আছেন। তার প্রসন্ন মুখে কোনো অনুযোগের ছায়াও নামছে না।

এক পশলা বর্ষণের পর শান্ত আকাশের মতো সেলিনার মুখ। রৌদ্রের ঝলকে ঝলকে যেন বেদনার মেঘভার কেটে গেছে!

সে আরেকবার ছবিটার দিকে চাইল। এরপর চলে এল আলমারির কাছ থেকে। একটু ঝুঁকে ট্রেখানা দু'হাতে ধরে বলল, অনেক কথা বলে ফেললাম। কিছু মনে করবেন না!

তার ঠোঁটে প্রথমদিনের সেই রহস্যময় মৃদু হাসি।

এবারে তো বাসা চিনলেন। মাঝে মাঝে আসবেন। ক্লাশের সময়টুকু ছাড়া প্রায় একা একাই থাকতে হয়। এলে গল্পেসল্পে বেশ সময় কাটে। অন্য কামরায় যাওয়ার ভঙ্গি করে ও বলল, একটু বসুন। আসছি।

মাহবুব এমন অন্যমনস্ক ছিল, গেটের কাছে এতক্ষণ ডাকাডাকি করছিল, শুনতে পায়নি। শোনা গেল কাটাকাটা কথাবার্তা।

কতক্ষণ পর সিঁড়িতে মস্‌মস্‌ আওয়াজ। ওপরতলায় ব্যস্ততার সঙ্গে উঠছে একটা লোক। জুতোর শব্দ নিকটতর হল। বাতাসে নড়ল পর্দা-সরে গেল একটুখানি। কে এল? ভাবল মাহবুব, উৎকর্ণ হয়ে। কে এল? ফিরে এসে ভাবল সেলিনা দরজার দিকে উৎসুক চাউনি মেলে।

কে এল? একজন আরেক জনের চোখে চেয়ে নীরব ইঙ্গিতের ভাষায় শুধাল, কে এল?

ওদের দুজনার অনুমানই ঠিক হল। পর্দাটা ডানহাত দিয়ে সরিয়ে মস্‌মস্‌ করে ঘরে ঢুকল কবীর। তার বাঁ-হাতে বগলে ধরা কয়েকটি জিনিশ।

এই নাও, মিউজিক সেন্টারে হঠাৎ পেয়ে গেলাম! রবীন্দ্র সঙ্গীতের রেকর্ড কয়টি সেলিনার হাতে দিযে অতিথিকে বলল, কখন এলেন? ভালো আছেন তো?

জ্বি হ্যাঁ, ভালো। মাহবুব উঠে দাঁড়াল, আপনি কেমন?

ভালোই। ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসবার অদ্ভুত ভঙ্গি করল কবীর।

বেশ ভালো গান তো? কৃষ্ণকলি, নৃত্যের তালে তালে, কান্নাহাসির দোলদোলানো, পৌষ ফাগুনের পালা, বেশ ভালো গানগুলি পেয়েছ তো? কথাটা বলে কবীরের দিকে চাইতেই নজরে পড়ল ওর হাতে একটা প্যাকেট। জিগগেস করল, ওটা কি?

দেখ তো। তোমার নামেই এসেছে। হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা দিয়ে কবীর বলল, গেটের কাছে আসতেই পিওনের সঙ্গে দেখা হল ; ও দিয়ে গেল।

তাই নাকি? হঠাৎ উচ্ছল হয়ে উঠল সেলিনা। হাতের রেকর্ডগুলি টেবিলের ওপর রেখে বলল, দেখি দেখি।

রেজিস্টার্ড পার্সেল। ভালোমতো প্যাক-করা। তাড়াতাড়ি খুলতে গিয়ে হাতদুটো কাঁপতে লাগল ওর। সমস্ত শরীর যেন বিদ্যুতের প্রবাহে ঝাঁকুনি খাচ্ছে। ওর এই রূপান্তর এমনি আকস্মিক, ওরা দু'জন দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

ক্ষিপ্তের মতো সুতো, কাগজ ছিঁড়ে ফেলে দেওয়ার পর পাতলা কাগজে মোড়ানো কী একটা জিশি বেরুল, প্যাকেটের ভিতর থেকে।

নিমেষে সেই খসখসে কাগজটাও ছিঁড়ে ফেলে দিল সেলিনা, সঙ্গে সঙ্গে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, জুতো, করাচির জুতো।

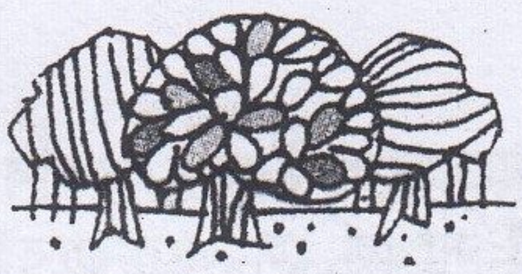
ওরা দেখল, একজোড়া আনকোরা লালজুতো। তাদের টুকটুকে রং থেখে সোঁদাল গন্ধ বেরুচ্ছে। সেলিনা কী করবে যেন ঠিক করতে পারছে না। ওর চোখের তারা নাচছে তীক্ষ্ণ খুশিতে, আরক্তিম মুখে সে ঝল্‌মল্‌ করছে।

দুহাতে জুতো জোড়াটা আলগা করতেই ভিতর থেকে ছোট্ট একটা কাগজের চিরকুট বেরুল। উল্লাসে স্থানকালপাত্র ভুলে গেল সেলিনা। ওদের সামনেই তা খুলে পড়ল, সুইট সেলিনা, দিস ইজ একর্ডিং টু ইউর চয়েস। আই থিংক্‌ ইউ উইল লাইক ইট। ইউর্স এস. এ. খান।

আবার আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল ও। কবীরের দিকে চেয়ে কলকণ্ঠে বলল, আমি তোমাকে বলিনি, জুতো আমাকে কিনতে হবে না? সেই কবে কিনে দিয়েছেন, ওর নিশ্চয় মনে আছে। একদিন না একদিন পাঠাবেন। কেমন আমার কথা ঠিক হল তো?

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ওরা দু'জন। বিদায় নিয়ে চলে আসার আগে মাহবুব লক্ষ্য করল, কবীরের মুখটা অসম্ভব রকম কালো আর কঠিন হয়ে উঠেছে আর চশমার ভিতরে তার চোখ থেকে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে।

এপ্রিল, ১৯৫৫।



উত্তাপ

অনেক আগেই মেঘ কেটে গিয়েছিল। কিন্তু তবু বিকেলে টবে পানি ঢালতে এসে সিঁড়ির পাশে শূন্য জায়গাটা চোখে পড়তেই নীরুর মনটা আবার মুহূর্তের জন্য খারাপ হয়ে গেল। প্রসাধন-মনোরম মুখে ভাবনার ছায়া, ঝাঁজরিটা হাতে নিয়ে সে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, চুপচাপ।

সামান্য একটা ফুলের টব, তার জন্য একটানা চব্বিশ ঘণ্টা শোক, বাইরের লোকের কাছে এ হয়ত মনে হবে বাড়াবাড়ি। কিন্তু আসলে তা নয়। ভালো যে বাসতে জানে সেই বোঝে বিচ্ছেদের মর্ম। জিনিশ যত ছোটই হোক, হৃদয়ের আবেগে যদি হয় তার স্থান, তাহলে তার অপচয় বেদনায়ক হবে, সে মোটেই বিচিত্র নয়। বিশেষ করে নীরুর মনটি যেন কেমন, কোমল অথচ ভারী একরোখা। এমনিতে ওর মত শান্তশিষ্ট লক্ষ্মী মেয়ে দুর্লভ, কিন্তু কোনো কারণে তার অভিমানে আঘাত করলে রক্ষে নেই। সে ক্ষিপ্ত হয়ে পাল্টা আঘাত করবে এবং তারপর ঘরের দরজা বন্ধ করে কিছুক্ষণ কাঁদবে নিজেরই মনের জ্বালায়।

গতকালের ঘটনাটাও বিশেষ কিছু ছিল না। কলেজ থেকে ফিরতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল জহিরের, আর তারই কারণ বুঝিয়ে বলবার জন্য সে তাড়াতাড়ি বারান্দায় উঠছিল, এমন সময় জুতোর আঘাত লেগে ফুলের টবটা গড়িয়ে পড়ল। তৎক্ষণাৎ নিচু হয়ে সেটিকে ধরবার চেষ্টা করছিল সে, কিন্তু পারল না।

ওখানে কে রে? ভিতরের কামরা থেকে নীরুর কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

আমি। আমি এসেছি। জহির ডেকে বলল, নীরু, দেখে যাও কি সর্বনাশ হয়েছে!

সর্বনাশ কথাটা ও যেভাবে উচ্চারণ করল, তাতে নীরুর অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। খালা-আম্মার অসুখটা বাড়েনি তো? চারদিন আগে ওরা তাঁকে যে অবস্থায় দেখে এসেছে, তারপর থেকে কেবলি উৎকণ্ঠা। যে কোনো সময় দুঃসংবাদ পেলে বিস্ময়ের কিছু নেই।

শোবার ঘরে আলনায় সে কাপড় ভাঁজ করে রাখছিল, সে কাজ স্থগিত রেখে হন্তদন্ত হয়ে বাইরে এল। ব্যাকুলস্বরে জিজ্ঞেস করল কি, কি সর্বনাশ?

ওই দেখ। জহির নিচে অঙ্গুলি নির্দেশ করল।

কিন্তু জবাব দেওয়ার আগেই ও দেখতে পেয়েছিল, তার অতি প্রিয় ফুলের টবটা ভেঙে চৌচির হয়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে। এই দৃশ্য তার কাছে পরম আত্মীয় বিচ্ছেদের চাইতে কম নয়। সে হাউমাউ করে এগিয়ে গেল ওমা! এ কেমন করে হল? আমার এ সর্বনাশ কে করলে গো বলতে বলতে নীরু দুই চোখের পানি ছেড়ে দিল।

প্রথমত অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া জহিরের গত্যন্তর রইল না। কিন্তু পরে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল। আদর করে বলল, লক্ষ্মী, অমন করো না তুমি। দোষ আমারই। আরেকটু সাবধানে চলা আমার উচিত ছিল। কিন্তু কি করব, ভেঙেই যখন গেছে এখন নতুন কেনা ছাড়া উপায় নেই। কালকে নিশ্চয় এনে দেব।

নীরু কথা বলল না। অনেক অনুনয়-বিনয় করে এক বান্ধবীর বাসা থেকে সে রজনীগন্ধার চারাটা এনেছিল, টবে লাগিয়ে বহু যত্নের পর ফুলের একটা ডাঁটাও পরিপুষ্ট হয়ে বেরিয়েছিল, অথচ ফুল ফোটবার পূর্ব মুহূর্তে কিনা অপমৃত্যু! সে অবশ্য বুজতে পারল, ওঁর কোনো দোষ নেই। কিন্তু তবু তার অভিমান অপরাজেয়।

ছোটবেলা থেকেই ওর এমনি স্বভাব, ঠিক আর দশ-পাঁচটি সাধারণ মেয়ের মতো নয়।

কৈশোরের ধূলিখেলায়ও ঘর-বাঁধার মহড়া দেওয়াই যেখানে মেয়েদের চিরন্তন স্বভাব, যেখানে বিবাহিত জীবনের তিন বৎসরেও সাংসারিকতার খুঁটিনাটি সম্পর্ক সে একেবারেই অজ্ঞ। একটি ঝি, একটি কাজ করিয়ে ছেলে, আর ওরা দু'জন, এই চারটি মানুষ। কিন্তু গৃহকর্ত্রী হিশেবে এদেরকে চালনা করতে ওর প্রায় হিমসিম খাওয়ার যোগাড়। ওর হিশেবের দোষেই প্রতিদিন এটা থাকে তো ওটা নেই, আর এনিয়ে বিরক্তির একশেষ। অথচ যেটুকু মনের মতো কাজ, তা ওর হাতে এমন নিখুঁত রূপ লাভ করে যে, সে এক আশ্চর্য। মাসিক আয় তো মাত্র আড়াইশ টাকা। কিন্তু তা থেকেই কিছু কিছু বাঁচিয়ে নীরু তার ঘরটিকে অনবদ্য করে সাজিয়েছে। বস্তি এলাকার অপরিসর ঘিঞ্জি গলির ভিতরে রাস্তার ধারের পাঁচিলে লাগানো নড়বড়ে কাঠের দরজাটি দেখে অনুমান করা কঠিন যে, এর ভিতরে এমন একটা ঘর থাকা সম্ভব। বাইরে থেকে হঠাৎ গিয়ে নতুন লোকের মনে হবে এ রীতিমত আবিষ্কার।

একতলা বাসা, রাস্তা বরাবর লম্বালম্বি অবস্থিত। এর পিছনের দু'টি কামরা নিয়ে বাড়ির মালিক বিধবা স্বয়ং থাকেন, বাকি সামনের অংশটা ভাড়া নিয়েছে ওরা। দুটি বড় কামরা। আরেকটি ছোট ভাঁড়ার ঘর। পাঁচিলের দরজা পেরিয়ে এক চিলতে জায়গা, যাকে ঠিক উঠোন বলা অসার্থক। উপরন্তু, সিঁড়ি এবং বারান্দাটাও তেমন কিছু বিশাল নয়। কিন্তু এই মধ্যে দেশী বিদেশী নানা ফুলের অন্তত পনরটি টব। দরজা ও জানালায় মনোরম পর্দা। বৈঠকখানার বেতের গোল টেবিলটি ভালো, সবুজ রং দেওয়া চেয়ারগুলি আরামদায়ক। দুটি আলমারি ভরা বই, দেয়ালে দেশীয় শিল্পীদের আঁকা তিনটি ল্যান্ডস্‌কেপ। শোবার ঘরের বিছানাটি ধবধবে, আলনাটি সযত্নে পরিপাটি করা এবং টেবিলের ওপরে স্ট্যান্ডে রাখা ওদের গ্রুপফটোটি সুন্দর।

নীরু বলে, কেবল পয়সা থাকলেই হয়না, ডিসেন্টলি থাকতে পারাটা একটা আর্ট। ঘরটি দেখলে মনে হবে, তার কথাটি শুদু কথার কথা নয়।

অপরপক্ষে বয়স সাতাশের বেশি না হলেও জহির নিতান্ত ঢিলেডালা লোক। একটা গুছাতে গিয়ে দশটা ছড়িয়ে রাখা তার অভ্যাস। ছোটবেলায় মা বাবা মারা গিয়েলিন, এদিকে বিষয় সম্পত্তি কিংবা সম্পন্ন অভিভাবক কিছুই তার ছিল না, অথচ পড়াশুনা করারও খুব ইচ্ছে, সেইজন্য কতকটা ভাগ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর শহরে চলে এসেছিল এবং এইভাবে গোড়া থেকে অনেক অলিগলির ঘা খেয়ে সে মানুষ। সুতরাং জীবনের স্নিগ্ধশ্রীর স্পর্শ সে পায়নি। তাছাড়া লাখো মানুষের অদৃশ্য কঙ্কালের ওপর যে সমাজ দাঁড়িয়ে আছে, তার মূল্যবোধে ওর কোনো বিশ্বাস নেই, কারণ, এখানে সুখ মানেই স্বার্থপরতা, প্রাচুর্য মানেই বঞ্চনা। নিজের চেষ্টা ও সাধনায় সে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছে এবং সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু তা'বলে মাটির ভিত ছেড়ে কৃত্রিম আভিজাত্যের ওপর তলায় আরোহন করতে সে রাজী নয়।

সেইজন্য, যদিও সে জানে নীরুর গৃহ রচনা নেহাৎই ওর স্বভাবজ, তবু সে একেকবার হাঁপিয়ে ওঠে। ছটফট করে খাঁচাবদ্ধ পাখির মতো। সেই উদ্দাম উচ্ছৃংখল অতীতকে যদি আবার ফিরে পাওয়া যেত! তার মনে হয়, চারদিকের অচলায়তনকে ভাঙবার জন্য নিজের যতটুকু শক্তি সবটুকু নিঃশেষ করে দেওয়ার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা।

কিন্তু একথাও ঠিক, নীরুর মনে এতটুকু দুঃখ দেওয়ার ইচ্ছে তার নেই। ও বড় কাঁচা, বড় অসহায়। একমাত্র তাকেই পরম নির্ভয়ে আঁকড়ে ধরেছে, লতিয়ে উঠেছে। মাতৃহীন মেয়ে, খালা আম্মার বাসায় মানুষ। চুয়ান্নর অন্ধকার দিনে সেখানেই দুজনার পরিচয় হয়েছিল। আহা সেই বৃষ্টিঝরা দিনগুলি। জহির মাঝে মাঝে অবাক হয়েই ভাবে, এ যেন ছিল নিশ্চিত নিয়তির মতো, আকস্মিক ও অনিবার্য।

সহপাঠী মাহফুজও ডিসেম্বরে ইকনমিক্‌সের পার্ট-টু পরীক্ষার্থী, গভর্নরের শাসন প্রবর্তিত হওয়ার দিন সন্ধ্যায় বইপত্র নিয়ে সে ওদের বাসায়ই গিয়ে উঠেছিল। কেবল বন্ধুত্বের দাবিকে সম্বল করেই অনাহূত এই আতিথ্য, কাজেই ওদের আন্তরিকতা পাবে কিনা সে-বিষয়ে মনে যথেষ্ট সংশয় ছিল। বিশেষ করে, কেরাণীর সংসার অনেক কষ্টের মধ্য দিয়ে ছেলেকে পড়াচ্ছেন ওরা। কাজেই ঠিক পরীক্ষার বছরে বাইরের কোনো অনভিপ্রেত লোককে আশ্রয় দিয়ে বিপদের ঝুকি নিতে তারা ইতস্তত করবেন সে স্বাভাবিক। বাইরের সর্বত্র যেমন উত্তেজনা, তাতে সামান্য কারণে একটা বিশৃঙ্খলায় জড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়।

কিন্তু এমনি ভালো ছেলে মাহফুজ এমনি বন্ধুবৎসল, বিবেচক আর আন্তরিক-ওর সহানুভূতির দরুন সব সমস্যার সহজ সমাধান হল। সে বলল, বাবা-মা যদি জানতে পারেন তোর ওপর ওয়ারেন্ট আছে, তাহলে মুশকিল হবে। মুখে হয়ত কিছু বলবেন না, কিন্তু দুশ্চিন্তায় থাকবেন। কাজেই এক কাজ করা যাক। আমি বলব, তুই এখানে কিছুদিন কনসাল্ট করে পড়াশুনা করতে এসেছিস। তাহলে সব ল্যাটা চুকে যাবে। কারণ, আমার কথায় ওঁরা বিশ্বাস করবেন।

পরম কৃতজ্ঞতায় জহিরের মুখ উজ্জ্বল হল। সে বলল, তোর এ উপকার জীবনে ভুলব না।

মাহফুজ হেসে বলল, পাগল, এ আবার উপকার কি। বন্ধুর বাসায় কয়েকদিন থাকবি, এইতো?

বাইরে সন্ত্রাসের রাজত্ব। সর্বত্র কেমন একটা উৎকণ্ঠা, নৈরাশ্য, আর অবসাদ। তাহলে এতদিনকার এত সংগ্রাম সবই কি ব্যর্থ? জহির সারাদিন ঘরের ভিতরে পড়ে থাকে কুঁকড়ে। এ-ছাড়া উপায় নেই। তার মনে শত প্রশ্ন, শত জিজ্ঞাসা। কবে এই স্তব্ধতার অবসান হবে? কিন্তু একজনে বা কয়েকজনে কিছুই যে করার উপায় নেই। পরদিন সন্ধ্যায় বাইরে বেরিয়ে রাত সাড়ে বারোটায় এমনি দোলায়িত মন নিয়ে সে বাসায় ফিরে আসছিল, বাড়ির ভিতর দিয়ে ঘরে ঢোকবার জন্য গেটটা হাতের চাপে ফাঁক করতেই সে দেখতে পেল, তার ঘরের কাছ থেকে কে একটি মেয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। তার মুখ থেকে একটি শব্দ প্রায় বেরিয়ে আসছিল, কে? কিন্তু সে নিজেকে সামলে নিল। কারণ, হয়তো মনে হল, এ অনাবশ্যক। সে বাসার অতিথি, কাজেই তাকে আসতে দেখে এ বাসার যে কোনো মেয়ের পক্ষেই এমন ব্যবহার স্বাভাবিক।

গেটের চাপানিটা লাগিয়ে দু'পা এগুতেই একটা ইটে তীব্র হোঁচট খেল জহির, সঙ্গে সঙ্গে পা ঝাড়া দিয়ে উহ করে উঠল।

নিচু হয়ে সে দেখল ডান পা'য়ের দুটি আঙুলের মাথা থেৎলে গিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। স্যান্ডেলটা খুলে রুমাল দিয়ে জখমটা জড়িয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে ঘরের দরজার কাছে গেল। পায়ের আঙুলে বেশ যন্ত্রণা।

আধো অন্ধকার ঘর। কপাট ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই হাওয়ায় জড়ানো রজনীগন্ধার মিষ্টি-মধুর সোঁদাল গন্ধে ওর বুকের ভিতরটা এক মুহূর্তে ভরে গেল। এ কি আশ্চর্য ওখানে কে শুয়ে আছে? মাহফুজ না? বেশ, শুয়ে থাক, প্রাণভরে ঘুমাক। তাকে জাগাবার দরকার নেই। মন্ত্রমুগ্ধের মতো জহির টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল। হারিকেনের আলোটা কম্পিত হাতে বাড়িয়ে চারদিকটা চেয়ে দেখতেই ওর মনে হল, সুন্দর, এ কি সুন্দর! খাটের শিয়রে ফুলদানীতে এক গুচ্ছ তাজা রজনীগন্ধা। কাপড়-চোপড় ও বইগুলি গুছিয়ে রাখা, খাবারের বাসন-পত্র পরিপাটি করে সাজানো। ধবধবে শাদা বালিশের ওয়াড় ও বিছানা চাদরে কার সযত্ন হাতের ছোঁয়া যেন এখনো লেগে আছে।

জখমের যন্ত্রণা ভুলে জহির বেতের সোফাটায় বসে রইল, তার ভিতরে কিসের

বিহ্বলতা। এই সময় খোলা দরজা দিয়ে ভিতর বাড়িতে আলোর নড়াচড়া দেখতে পেল, সঙ্গে টুকরো কথার দু'একটা শব্দ।

খানিকক্ষণ পর দশ-এগারো বছরের একটি চেলে চোখ কচলাতে কচলাতে ঘরে এসে ঢুকল। কোনো ভূমিকা না করে একটি ছোট-শিশি বাড়িয়ে দিয়ে সে বলল, এই নিন ডেটল, পায়ে লাগিয়ে দিন। তারপর চটপট খেয়ে ঘুমিয়ে পড় ন।

রীতিমত ভৌতিক কাণ্ড। এ বাড়ির হাওয়ারও চোখ আছে নাকি? একে আবার কে পাঠাল? ঘটনার আকস্মিকতায় আচ্ছন্ন হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে ওর চৈতন্য হল, চোকাঠ পেরিয়ে যাওয়া ছেলেটিকে সে ডাকল, এই শোন, একটা কথা আছে।

কি কথা? ছেলেটির বিরক্তির সহিত ফিরে দাঁড়াল, বলল, আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

জহির জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা তুমি কেমন করে জানতে পারলে যে আমার পায়ে চোট লেগেছে?

এসব আমি কিছু জানি না। বলতে মানা আছে। টনটনে স্বরে কথাটা বলে গজগজ করতে করতে সে চলে গেল, এত রাত্রে যততো সব—

সামান্য খেয়ে নিয়ে জহির যখন শুতে গেল, তখন রাত প্রায় দেড়টা। জানালায় ঠাণ্ডা হাওয়া, দূর থেকে বর্ষণের শব্দ শুনতে শুনতে ওর চোখের পাতা দুটি ঘুমে জড়িয়ে দিল। কম্বলটা টেনে গায়ে দিয়েছে সে, কেমন একটা মধুর মগ্নতা। অন্ধকার বৃষ্টি, বিদ্যুৎ আর শব্দ দিয়ে ঘেরা স্বপ্নের মতো এই রাত্রি, অনেক অজানা অনুভূতি, অনেক আনন্দের বেদনা, অনেক আকাঙ্ক্ষার মায়াবী বুদবুদ হৃদয়ের নিবিড় স্পন্দনে ছলছল। এর কি কোনো দাম নেই? নিজের থেকে এই হারিয়ে যাওয়ার, ছড়িয়ে যাওয়ার?

পরদিন সকালে যখন জাগল, তখন ওর দেহমনে কেমন একটা স্নিগ্ধ সজীবতা। আহ্ কতকাল! কতকাল পরে সে এমন গভীর ভাবে ঘুমাল? তারিখটি নোট বইয়ে টুকে রাখভার মত।

একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে আড়মোড়া ভেঙে উঠে পড়ল জহির। খড়ম পায়ে দিতে যাবে, কিন্তু একি আশ্চর্য, তার থেৎলে যাওয়া আঙুলে অমন সুন্দর ব্যান্ডেজ দিয়ে গেছে কে? না, এই রহস্যকে ভেদ করতেই হবে।

মাথায় একটা বুদ্ধি খেলল ওর। রোজকার মত সেদিন সন্ধ্যায়ও বাইরে গিয়ে মিনিট পনেরো বাদেই আবার ফিরে এল, জানালা দিয়ে উঁকি দিতেই ওর বুকের ভিতরটা মোচড় খেয়ে উঠল, ও কি স্বপ্ন? বাতিটা কমিয়ে রেখে শাদা শাড়ি পরা একটি মেয়ে ওর বিছানা ও বইপত্র গুছিয়ে রাখছে একমনে, মুখ তার আবছায়ায় অস্পষ্ট কিন্তু তবুও, কোমরে আঁচল বাঁধা খোলা চুলে তাকে মনে হলে, নিরুপমা। জহির চুপি চুপি এসে ঘরে ঢুকল, চমকে উঠল মেয়েটি, দৌড়ে বেরিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু তখন আর সময় নেই। জহির ওর হাত ধরে ফেলল, অনুচ্চস্বরে জিজ্ঞেস করল, কে তুমি?

মেয়েটি হাত ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করল। নিচু মুখে বলল, আহ ছাড়েন। কেউ আসবে।

শরম জড়িত কণ্ঠে আর কোনো কথা জাগেনি সেদিন। আবছা অন্ধকারে দু'জন দু'জনকে চিনে নিয়ে সরে গিয়েছিল। কিন্তু এই অন্ধকারই যে ছিল গোধূলির আলো, একমাস পরেই তা প্রমাণিত হয়েছিল।

বস্তুত ওর ছন্নছাড়া হতভাগ্য জীবনে নীরু এনে দিয়েছে যে ছন্দ ও সুষমা, সেজন্য জহির তার কাছে কৃতজ্ঞ, ঋণী। সে জানে, অনেক কিছুর বিনিময়েও এ-ঋণ অপরিশোধ্য। তাই ওকি খুশি রাখা বা খুশি করার পিছনে শুধু মাধুর্যের আকাঙ্ক্ষাই নেই, আছে একটা তৃপ্তি, সুখ।

ফুলের টব কেনার কথাটা তার মনে ছিল, বিকেল পাঁচটায় কলেঝ থেকে ফেরার পথে সে ঠাটারিবাজারে গেল।

একটি নোংরা নগ্ন হাত, দোকান থেকে বেরিয়ে রিকশার কাছে আসতেই বসন্তের দাগভরা হাড়সার একটি নোংরা নগ্ন হাত অধীর আগ্রহে তার সামনে এল, এই সঙ্গে একটি কাতর প্রার্থনা, বাবা, খয়রাত বাবা, কিছু খয়রাত দাও। আমার জন্য নয়, বাচ্চাগুলিন মরতে বসেছে। কিছু দাও, আল্লাহ্ তোমায় সুখে রাখবেন।

রোগজীর্ণ বীভৎস মা, আর তার প্যাকাটে ছেলেমেয়েগুলির দিকে চাইতেই ওর আপাদমস্তক শিরশির করে উঠল।

না, না, এসব সে দেখতে চায় না। একটা আনি মেয়েটার হাতে ফেলে জহির রিকশায় উঠে বসল। চালককে বলল, জলদি চালাও।

কিন্তু ওর হৃৎপিণ্ডটা যে ঘন ঘন দুরুদুরু করছিল, তার কারণ অন্য। মেয়েটির কাতরানি শুনে গতকালের একটি ছোট ঘটনা ওর মনে সা করে জেগে উঠেছিল।

গতকাল বিকেলে হেঁটে হেঁটেই সে কলেঝ থেকে বাসায় ফিরছিল। ওসমান গণি রোডের মোড়টায় আসতেই ময়লা কাপড় জড়িয়ে রাস্তার দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে থাকা কুৎসিত একটি লোক একেবারে ওর চোখের ভিতরে দৃষ্টিক্ষেপ করেছিল। সে কি মর্মভেদী চাউনি! তার সম্মোহনে জহির কখন থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। যখন খেয়াল হল, সামনে এক পা বাড়াতেই লোকটি হাত নেড়ে তাকে ডাকল। ও কিছুটা বিরক্ত হল। কিন্তু সাড়া না দিয়েও পারল না। কাছে গিয়ে ও পকেটে হাত দিচ্ছিল, এমন সময় লোকটি প্রতিবাদ করে উঠল, না, না, পয়সা নয়।

তাহলে কি চাও তুমি?

বিহ্বল দৃষ্টিতে ওর দিকে আরও খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর লোকটি হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

আমারে চিনতে পারছ না তুমি? চিনতে পারছ না? একটা ঢোক গিলে সে আবার বলল হাঁ, চিনবেই বা কেমন করে, আমরা তো মানুষ নই?

ব্যাপারটা এমনি নাটকীয়, কি বলবে জহির খুঁজে পেল না। দাঁড়িয়ে থেকে সে লোকটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। খানিকক্ষণ পরে হঠাৎ বলে উঠল, আরে মাজু না? তোর এমন হাল হল কিভাবে?

তাহলে চিনতে পেরেছ? হাঁ, আমি মাজু, রতনপুরের মঈজউদ্দি বাঁ হাতের তালু দিয়ে চোখের পানি মুছে সে বলতে লাগল, জহির জানি আমি বাঁচব না। দেশের আর দশজনের মত আমরাও সেই একই গতি হবে। কিন্তু মরবার আগে শেষ চেষ্টা করব, সে জন্য বুক বেঁধে ঢাকায় আসা। তিনদিন গেলাম, কিন্তু ওরা আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করল না। তাড়িয়ে দিল।

ছোটবেলার অনেক কথা মনে পড়ায় জহিরের চোখ জোড়া ছলছল করে উঠল, মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করে ধরে এল। এখন ধূমপান করা প্রয়োজন।

হঠাৎ মনে হল আমাদের এম-এল-এ সাহেব তো ঢাকায় আছেন তার কাছে যাই। উনি সুপারিশ করলে নিশ্চয় কাজ হবে। তার বাসার ঠিকানা জানা ছিল, গেলাম। কিন্তু তার দেখা পাওয়া ভার। চুপ হয়ে শ্বাস নেবার পর মাজু বলতে লাগল, তার বারান্দায় পড়ে রইলাম। একদিন পর যখন তাকে পেলাম উনি গাড়িতে চড়ছিলেন, বললেন, অনেক কাজ আছে, তার সময় হবে না।

পকেট থেকে দেশলাই বার করে জহির একটি সিগারেট ধরাল। সে কি ভাবছে? হয়তো কিছুই নয়, হয়তো-বা অনেক কিছু।

শেষ তক তোমার কথা মনে পড়ল। শুনি কলেজে পরফেসরি কর, কিন্তু কই থাক সে তো জানি না। এখন কি করি। বসে বসে তাই ভাবছিলাম। এমন সময় তুমি এলে। এ

নেহাৎ-ই তগদির, না-হলে এতকাল পরে আবার এইভাবে দেখা হবে কেন? মাজু আকুল কণ্ঠে বলল, জহির আমারে বাঁচাও তুমি, আমারে বাঁচাও। বেশি কিছু নয়, শুধু হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিলেই হবে। তোমরা শহরের মান্যগণ্য লোক, পারবে তো ভাই?

কথাগুলি শেষ করার সঙ্গে ওর সমস্ত সঞ্চিত শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে গেল। মাজু ঘন ঘন হাঁপাতে লাগল।

জহির একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, এ আর বেশি কথা কি? আমি নিশ্চয় তোমাকে ভর্তি করিয়ে দিতে পারব। কিন্তু আজকে তো সময় নেই। কাল সকালে ন'টার মধ্যে যেতে হবে হাসপাতালে।

ঠিকই তো, এ আর কতটুকু কাজ? ছেলেবেলায় ওদের বাড়িতে কত খেয়েছে, কত ঘুমিয়েছে দু'টি জীবনের সাত বছরের একটি পুরো অধ্যায় একই সূত্রে গাঁথা। মুখচোরা ভালো ছেলে জহিরকে পল্লীগ্রামের খেতখামার নদীনালা বনজঙ্গলে যে অপরূপ রূপকথার রাজ্য তার সন্ধান দিয়েছিল কৃষকের ছেলে সহপাঠী এই দুরন্ত মাজু, এ তো সেদিনের উজ্জ্বল ছবি। ওরা দুজনে একবার ঘুঘুর ডিম চুরি করে এনে টুনটুনির বাসায় রেখে বাচ্চা ফোটাবার চেষ্টা করেছিল। যার চোখের তারায় ছিল পাখির চঞ্চলতা, মুখে ছিল কচি ফসলের লাবণ্য, তার পা'গুলি আজ লিকলিকে শীর্ণ, প্লীহাভরা পেটটি ফোলাফাঁপা, চোয়াল বের-হওয়া মুখের ম্লানিমায় নিশ্চিত মৃত্যুর ছায়া।

বাল্যবন্ধুর আশ্বাসবাণী শুনে মাজুর ঘোলাটে চোখদু'টি যেন ক্ষণিকের জন্য দীপ্তিমান হল। কম্পিতস্বরে সে বলল, পারবে, তুমি পারবে, সে আমি জানতাম। তুমি আমাকে বাঁচাও ভাই। ভালো হয়ে আমি সব ঋণ শোধ করব।

অত উতলা হয়ো না। কিছু ভয় নেই তোমার। বলতে বলতে জহিরের চোখে একবিন্দু পানি চিক্‌চিক্ করে উঠল। সে বলল, সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু ভাবছি, আজকের রাতটা তুমি কাটাবে কোথায়? কোন জায়গা আছে?

জায়গা? জায়গা কোথায় পাব?

জহির চিন্তিতভাবে বলল, আমার বাসাটাও খুব ছোট, আলাদা ঘর নেই। জান তো ঢাকা শহরে বাসাবাড়ির বড় টানাটানি। কোনমতে দুজনে মাথা গুঁজে আছি।

কথাটা বলার আগেই ওর মনে হয়েছিল, এ মিথ্যে অজুহাত। আসলে বাসায় একটি লোকের একরাত্রি থাকার ব্যবস্থা করা কঠিন কিছু নয়। কিন্তু তবু উপায় নেই। এই বিশ্রী নোংরা চেহারা দেখলে নীরু আঁৎকেই উঠবে হয়তো।

মাজু তার কোটরাগত ড্যাবডেবে চোখে সামনে দাঁড়ানো বন্ধুর অন্তরাত্মাটি যেন দেখে নিল। পরে বলল, ঠিক আছে। তোমাদের কষ্ট দিয়ে লাভ নেই। আমি এখানেই বারান্দায় পড়ে থাকব। তুমি ঠিক সময়ে এসো কিন্তু। আসবে তো?

হ্যাঁ, তা'তো নিশ্চয়ই। জহির বল, আমি সাড়ে আটটার মধ্যে এখানে পৌঁছে যাব। তা'ছাড়া বাসায় গিয়ে দেখি, কোনমতে জায়গা করা যায় কিনা। যদি করতে পারি, একটু পরে তোমাকে এসে নিয়ে যাব। কেমন? আচ্ছা, এখন আসি।

সেদিন পথ চলতে গিয়ে জহির বারবার বিবেকের দংশন অনুভব করেছিল, বুকের ভিতরে চাপা কান্নার রেশ। আশ্চর্য, এতটুকু সৎসাহস তার নেই? বুঝিয়ে বললে নীরু নিশ্চয়ই আপত্তি করত না। ঘরের ভিতরে না-হোক বারান্দায় থাকতে দিত। অথচ তার একি আত্মপ্রবঞ্চনা? এই হীনতার বিষ রক্তের বিন্দুতে বিন্দুতে দিনে দিনে কখন বাসা বেঁধেছে, সে তো কোনদিন জানতে পারেনি?

তবু সে বলত, কথাটা বলত। কিন্তু ফুলের টবটি ভেঙে যাওয়ায় আস্তে আস্তে যে

নীরবতার পর্দা নেমে এল দুজনের মাঝখানে, তাতে গোটা ঘটনাটাই চাপা পড়ে গেল।

এটা-সেটা করতে গিয়ে গভীর আশা নিয়ে রাস্তার ধারে বসে থাকা মাজুর করুণ কাতর মুখটা জহিরের মনে না পড়েছে এমন নয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার যাওয়া হয়নি।

জহির তন্ময় হয়ে বসেছিল, নবাবপুর রোড থেকে ওসমান গণি রোডের ভিতরে রিকশাটা এগিয়ে যেতেই রাস্তার বাঁ-পাশে একটা ভিড় দেখে হঠাৎ ওর চমক ভাঙল। গলা বাড়িয়ে সে দেখতে পেল পরিত্যক্ত বারান্দার ওপরে ময়লা কাপড় ঢাকা একটি মৃতদেহ, তার পাশে চাদর পাতা, দুটি লোক কাছে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে নেড়ে বলছে, মুসলমান ভাইসব। একটা বেওয়ারিশ লাশ, এর দাফনের জন্য যে যা পারেন দিয়ে যান। আখেরাতের সওয়াব হাসেল করুন।

কিন্তু জহিরের কানে কোনো কথা নেই, শব্দ নেই। কেন জানি ওর হৃৎপিণ্ডটা একটা তীব্র মোচড় খেয়ে পরে ঢিব্‌ঢিব্ করতে লাগল। রিকশা থেকে সে নেমে পড়ল। যন্ত্রচালিতের মতো দুই হাতে ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল। বারান্দার একটা লোককে বলল, দেখি মুখের কাপড়টা একটু সরাও তো দেখি।

চেহারা বিহ্বল হলেও পোশাক-আশাক দেখে উপস্থিত সকলেই হয়তো ভাবল মৃতব্যক্তি এর কেউ হবে না।

তবু একজন মৃতের মুখের কাপড়টা সরিয়ে দিল। ওর দিকে চেয়ে জিগ্‌গেস করল, সায়েব চিনতে পারছেন?

জহির বিস্ফারিত দুই চোখে মাজুর বিবর্ণ নিস্তব্ধ মুখটা দেখছিল। খানিকক্ষণ পরে সে উচ্চারণ করণ, না, না। আমি চিনি না, একে চিনি না।

এরপর আবার রিকশায় চড়ে কোন্ পথে কতক্ষণে বাসায় এসে পৌঁছল, সে বলতে পারবে না। টেবিলে খাবার সাজিয়ে রেখে নীরু বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল। সে এখন প্রসন্ন, স্নিগ্ধ। যা তাকে মানায় ভালো, গলায় সেই মুক্তোর মালা, মাথার বাঁ-পাশে চুলের কাঁটায় বেলফুল, আর কপালে পরেছে লালটিপ, ছবি দেখবার জন্য আজকে তার বাইরে যাবার ইচ্ছে। স্বামীকে আসতে দেখে ওর মুখে সলজ্জ হাসি ফুটে উঠল। কিন্তু তার দিকে চোখ তুলে একবার মাত্র চাইল জহির। মাথাটা ঈষৎ নত করে বিষণ্ণমুখে যে-ভাবে সে এসেছিল, সিঁড়ির কাছে নতুন টবদু'টি রেখে একটি কথাও না বলে ঠিক সে ভাবেই হাঁটতে হাঁটতে বৈঠকখানা পেরিয়ে শোবার ঘরে চলে এল। জুতো-জোড়াটা সে কোনমতে খুলে রাখল এবং তারপর বিছানায় পড়ে বালিশে মুখ গুজে রইল।

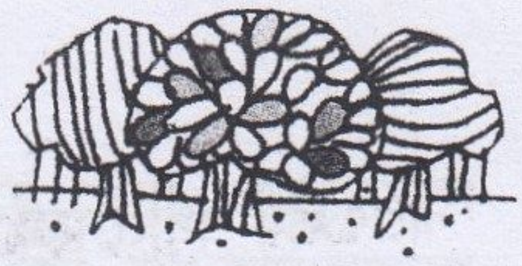
নীরু এসে ওর মাথার চুলে হাত রাখল। বলল, লক্ষ্মীটি খুব ব্যথা পেয়েছ, না? আমি আর কখ্খনো অমন করবো না। কেমন হল তো? তুমি ওঠ, হাত-মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নাও, ওঠ।

জহির বালিশ থেকে মাথা তুলল। অদ্ভুত অস্বাভাবিক স্বরে বলল, দ্যাখ তো নীরু, আমার চোখ থেকে রক্ত পড়ছে কিনা?

কই? না তো? চোখ দেখতে দেখতে ওর গালদু'টো দুই হাতে চেপে ধরে তুলতে গিয়ে নীরু বলে উঠল, ইস্, গা তো বেশ গরম দেখছি। তাই ভাবি, এইজন্য তো এমন বকাবকি? তা ঘাবড়াবার কিছু নেই। চল দিকিন একটু হাউসের কাছে। কয়েক বদনা পানি ঢাললেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আর দেরি করো না, লক্ষ্মী ওঠ।

জহির কিছু বলতে পারল না, কেবল অর্থহীন দৃষ্টিতে নীরুর মুখের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বিছানায় উঠে বসল।

এপ্রিল, ১৯৫৭।



সমতল

ভোরের খানিক আগে ইস্টিশনে ইঞ্জিনের বাঁশি এবং মালগাড়ির শানটিংয়ের ভারী ধাতব শব্দ রাত্রির নীরবতার ওপর আঘাত করতে থাকে অনবরত। রাত যে কাটছে, গড়িয়ে যাচ্ছে, বহুক্ষণ ধরে এ যেন তারই পাঁয়তারা। পাড়ার মোরগেরা ডানা ঝাড়ে, একে একে প্রথম বাক দেওয়ার কাজটা সেরে চুপ হয়ে যায় আবার, জজসাহেবের পুকুর পাড়ের নারকেল গাছে ডাকে কাকেরা, কেমন মগ্ন তাদের স্বর। অদূরে মাটির ঘরের ভিতরে কালু সহিসের খক্‌খক্ কাশি, গলির রাস্তায় কোনো মুসল্লির খড়মের খটরখটর আওয়াজ, এরপর মিষ্টি গলার আজানের সুর। আধো-ঘুম আধো-জাগরণে এসবই কানে বাজে দূরাগত স্বপ্নের ধ্বনির মতো। ভালো লাগে, হঠাৎ সম্পূর্ণ জেগে গেলেও মুয়ে শুয়ে শুনতে ভালো লাগে।

কিন্তু সকাল পাঁচটায় ঘুম ভাঙতে অন্য কিছু নয়, চট করে মনে পড়ে গেল আজকে জানুয়ারির ছাব্বিশে তারিখ, রোববার।

এই মনে পড়ায় বিছানার ওম-জাড়নো আরাম ছেড়ে এখন উঠে পড়তে হবে চটপট, তবু রশিদ সাহেব খুশি হলেন।

ছোটবেলায় ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েছিলেন, মাসিক আটটি করে টাকা শিক্ষা-বিভাগ তার মুখ দেখেই মঞ্জুর করেনি। তখন থেকে একটা আশ্চর্য গুণ দেখা দিয়েছিল, তাই না অমন কৃতিত্ব। সে হল, বইকে বই তার একের থেকে শেষের পাতা পর্যন্ত ঝাড়া মুখস্থ করে ফেলার ক্ষমতা। তাও আবার কণ্ঠস্থ নয়, একেবারে ঠোঁটস্থ, আজ্ঞা করলে ইতিহাস—ভূগোল সাহিত্য-গণিতের বিষয় সব খইয়ের মতো ফুটত। ইংরেজির বেলায়ও ছিলেন বাংলা মা'য়ের সেপাই-পুত্র। আকাশ নদী মাঠ সমুদ্র, টেবিল চেয়ার ঘরের নানা আসবাব-পত্র, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এগুলি তো নেহাৎ ডালভাত এমনকি গা চুলকানোর প্রতিশব্দও তার জানা ছিল।

কিন্তু এই অসাধারণ ক্ষমতা তাকে কেন প্রবেশিকার বাইরে আরো কিছুদূর টেনে নিয়ে যেতে পারল না সে এক রহস্য। নইলে এমন কলম-পেষা কেরাণী? আর দু'একটা পাস দিতে পারলে, অন্য কিছু না হোক, একজন বড়ো অফিসার তো অন্তত হতে পারতেন।

তবু মানুষের কোনো গুণই বৃথা যায় না, এই সান্ত্বনা। ভাগ্যের শিকে ছিঁড়ে দিতে না পারলেও, সেই স্মৃতিশক্তি কতবার কত বিপদ থেকে তাঁকে উদ্ধার করেছে বন্ধুর মতো, তার হিশেব নেই।

আজও ঠিক এমনি একটি মুহূর্ত। মশারির ভিতর থেকে মুখটি বাইরে নিয়ে আসায় ঠাণ্ডা হাওয়ার আমেজ লাগছিল। বিছানা শরীরটাকে ধরে রেখেছে পরম আদরে। সকাল বেলায় শুয়ে থাকাটা কি এমন খারাপ? কিন্তু, এখন আলস্যের প্রশ্রয় দিলে চলবে না।

লোকটি একেবারে চামার। চিনে জোঁক চামচিটের মতো বিঝাড়া। পিছনে লেগেছে তো লেগেইছে। মুখটা ভাবলেশহীন, গোবেচারা ধরনের, কিন্তু পেটে অনেক বৃদ্ধি, জিলিপির প্যাঁচ। কালরাতেও আবার এসে হাজির। অনেক কাকুতি-মিনতি করে বললেন, বড় দরকার পড়েছে ভাই, টাকাটা দিন। জানেন তো সমাজের রীতি-নীতি। ছোট মেয়েটা যাচ্ছে শ্বশুরবাড়ি, যেমন তেমন একখানা কাপড় না দিলেই নয়। ইদিকে একটি পয়সাও হাতে নেই। তাই অসুখ শরীরেই আসতে হল। আজ বিকেল থেকে কেমন জ্বর-জ্বর ভাব।

সেরেফ মিথ্যে কথা টাকা আদায়ের ফন্দি, রশিদ সাহেব ভাবলেন। কিন্তু বললেন, যে ঠেকার সময়ে আপনি ধার দিয়েছিলেন, তা চিরকাল মনে থাকবে। সময়ে এক টাকাও একশ টাকার শামিল! আপনার দশটি টাকায় আমার বড্ড উপকার হয়েছিল। আর, সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ।

না না। এসব কথা কি। দশটি তো মাত্র টাকা। আপনার দরকার পড়েছিল, দিয়েছিলাম।

এ আপনার বিনয়। রশিদ সাহেব বললেন,অবশ্য না চাইতেই টাকাটা আমার পিরিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কি করব, সবই তো দেখছেন। দিনকাল বড় খারাপ। আর আল্লার মাল, ছেলেপুলে তো কম নয়। তাদের মধ্যে আবার মেয়ের সংখ্যাই বেশি। আপনি তো দিয়ে শেষ করেছেন, কিন্তু আমি? একটি মাত্র পার করেছি। আর সেও বিশেষ সুখে নেই।

যা বলেছেন। চোরাকারবারী আর বড়লোকেরা জামাইর বাজার তাতিয়ে রেখেছে। এদিকে আমাদরে হল বিপদ।

প্রসঙ্গের খুব বেশি রূপান্তর কাম্য নয়। এতে শুধু সময় নষ্ট, আসল কাজে কলা। জমির সাহেব উসখুস করলেন, গলা খাকরানি দিলেন, মাথার গোল টুপিটা ঠিক করে পরলেন। এরপর থুতনিতে একটা ঘষা দিয়ে বললেন, আমি এবার উঠব, রশিদ সাহেব।

উঠবেন! অত তাড়া কেন। বসুন না আরেকটু। পান তামাক খান। কইরে তোরা!

থাক্ থাক্ কিসসু লাগবে না। অনেক কাজ আছে, আমি এবার উঠি।

কাজ থাকলে অবশ্য আপনার ক্ষতি করা ঠিক নয়। আচ্ছা, মাঝে মাঝে আসবেন, খুশি হব।

জমির সাহেব হতভম্ব। তিনি আবার গলা খাকরানি দিলেন, ঢোক গিললেন, কাঁধ নাড়ালেন, এবং বললেন, আমি যেজন্য এসেছিলাম—

ও টাকা? মাসের শেষ, এখন কোথেকে দেব বলুন? আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে অবশ্যই চুকিয়ে দেব।

এমন কথা তো ছ'সাতবারই দিয়েছেন। সে আমি বুঝিনা।মগজের কোষে যেন রক্ত সঞ্চারিত হল, মুহূর্তে দ্বিধা-সংকোচ কোথায় উবে গেল, বেশরমের মতো পরিষ্কার স্পষ্ট গলায় জমির সাহেব বলরেন, এক্ষুণি আমার টাকা চাই।

চরম অবস্থা, রশিদ সাহেব বুঝলেন। কিন্তু এখন বিদায় করা প্রয়োজন, পরে যা হবার হবে। তাই বিনয়ের সঙ্গে নরম গলায় বললেন, বুঝতে পারছি, আপনার খুব দরকার। বেশ কাল সকালে পাবেন। হাতে তো নেই, যেখান থেকেই হোক যোগাড় করে দেব।

বলা সহজ, কিন্তু করা কঠিন। বিশেষত ধারের জগতে একটা নিয়ম আছে, তেলা মাথায় তেল দেওয়া। তাকেই তেল দেওয়া যায়, যার তেল থাকা সম্ভব। সেজন্য বড়রা ছোটদের ধার দেয় না। প্রায় একই পর্যায়ে যারা আছে, তাদের কাছে পারতপক্ষে না যাওয়াই ভালো, কারণ পাওয়া গেলেও সেখানে সুবিধে কিছু নেই, কিঞ্চিৎ এদিক-ওদিক হলেই বড়ো গজর-গজর ফোঁসফাস করে তারা। কিন্তু ছোটরা বড়দের দিতে পারে, এবং দেওয়া-নেওয়া দু'দিক থেকেই তা ভদ্রতার অনুকূল। ওদের সঞ্চয় সামান্য, তবু দেয় সহজে, এবং সময়মত শোধ করতে না পারলে উচ্চবাচ্যও বিশেষ করোনা।

লোয়ার গ্রেড চাকরিতে ঢোকবার সময় রশিদ সাহেব বুঝতে পেরেছিলেন, সংসারের নড়বড়ে ভাঙা জাহাজটাকে ধারের লগির সাহায্য নিতেই হবে, নইলে তা যে-কোনো সময় চোরাচরে আটকা পড়তে পারে। সেজন্য এই সকল তথ্যের ভিত্তিতে গোড়া থেকেই তিনি

একটা মূলনীতি নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন। কিন্তু দুনিয়াতে সবই ফুরায়, এমনকি নদীর উৎসও। গত পনেরো বছর ধরে এত লোকের কাছে ধার করেছেন, এখন পাত্রের সংখ্যা শূন্যের কোঠায় এসে ঠেকেছে। কয়জনের সঙ্গে আর একজনের পরিচয় থাকে?

তবু, আগে জানা থাকলে, ঐ লোকটার কাছে হাত পাততেন না। বাইরে থেকে সত্যি চেনা মুশকিল। দশটি তো মাত্র টাকা, তাইতে এমন চটাং চটাং? তাকে কিছু শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। আজ রোববার। অফিস নেই। কাজেই একবার বেরিয়ে পড়লে বাসায় না ফিরলেও চলবে তাড়াতাড়ি।

মশারির ভিতরে আবার মুখটা নিয়ে রশিদ সাহেব উঠে বসলেন, বেশ বড় মশারিটা, তিনটি চৌকি জুড়ে টাঙানো। এমন সাইজের মশারি বাজারে পাওয়া যায় না। বেশ কয়গজ কাপড় কিনে এনে দর্জি লাগিয়ে বানিয়েছিলেন। দুই থেকে দশ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের এর ভিতরে ঘুমোবার অধিকার। দশজনের মধ্যে বাদ বাকি দুই ভাই শোয় সামনের ছোট ঘরটিতে এবং তিন বোন এ ঘরেরই দক্ষিণ দিকের কামরায়। প্রতি দুই বছরে গিন্নি একবার বাচ্চা দেন; এবং বর্তমানে এককালের নাদুস-নুদুস শরীর ভেঙে পড়লেও, নতুন সন্তানে এখনো তাঁর আপত্তি নেই। বলেন, সব সময় একটা কোলে না থাকলে ভালোই লাগে না তাঁর, বহুদিনের অভ্যেস কিনা।

মশারির ভিতর থেকে আসার সময় রশিদ সাহেব চেয়ে দেখলেন তার কুড়ি বছরের বিবাহিত জীবনের কীর্তিসমূহের অর্ধেক কোলাকলি জড়াজড়ি করে বিছানাময় ছড়িয়ে আছে। এরাই যত গন্ডগোলের গোড়া।

না, শিগগির বেরিয়ে পড়া ভালো। লোকটা যেমন পাষন্ড তাতে এমন ভর-সকালে এসে কড়া নাড়তে শুরু করলেও তাজ্জবের কিছু নেই। মর্নিং ওয়াকের বাতিক আছে তার।

পাঞ্জাবির ওপরে চাদরটা জড়িয়ে মশারির উদ্দেশে বললেন, ঘুমিয়ে আছ নাকি? একটু ভ্রমণে বেরুচ্ছি। ফিরতে দেরি হতে পারে। বাজারে পাঠিয়ে দিও।

মশারির ভিতরে কাচের চুড়ির রিনিঠিনি। হাই তোলার শব্দ। খানিকক্ষণ বাদে কথার জবাব এল, পাঠিয়ে তো দেব। কিছু টাকা যোগাড় করে আনে যেন। নইলে মাস চলবে না।

সেই এক কথা। শালার—। রশিদ সাহেব দরজাটা টেনে বেরিয়ে পড়লেন।

এখন বাজে ভাবনা থাক। সকালবেলাটা সত্যি সুন্দর। বিমেষত, এই মাসের মাঝামাঝি থেকে ফাল্গুনের শেষ পর্যন্ত। একটু একটু শীত, কুয়াশা বিশেষ নেই। পথের ধারে ঝোপ-ঝাড়ে নানান ফুলের বাহার, বাতাসে আমের বোলের সোঁদা গন্ধ। হাঁটতে হাঁটতে সজীব হয়ে উঠে মনটা, যদিও শরীরে ক্লান্তি। আগে ঘন ঘন পেটের অসুখ হত। এদিকে বুকের ভিতরকার হাসফাসটাও কেমন মারাত্মক হয়ে উঠছিল। কিন্তু বছর তিনেক আগে এমনিভাবে আরেক জনের খপ্পর হতে বাঁচতে গিয়ে যে একদিন সকালবেলার স্বাদ পেয়েছিলেন, তারপর এসব উপসর্গ আর নেই। রমনার ময়াদানে বেড়াতে গিয়েই জমির সাহেব এবং আর তিন ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। আশ্চর্য, ধারের ধার এত বেশি? প্রতিদিন যারা ছিলেন তুখোড় আলোচনার সঙ্গী তারা আজ বহুদূরে। অথচ তাদের সঙ্গে লেনদেনের পরিমাণ দশ পনেরো টাকার বেশি ছিল না।

যাক, সব যাক। মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার কি দরকার। লোক ঠাকাবার কায়দাকানুন যে যত ভালো রপ্ত করেছে সেই তত ভদ্রলোক; কাজেই এই সমাজে সত্যিকার হৃদয়ের কোন দাম নেই। এজন্যই এত সহজে ভাঙে আত্মীয়তা। আর বন্ধুত্ব? সে তো কথার কথা মাত্র। পকেট ভারী থাকলে তার মুখের অশ্রাব্য গালাগালও মধুর লাগে; কিন্তু গরীবের আন্তরিক

মিষ্টি আলাপও দেউলেপনা। টাকা, টাকা। টাকাই জীবন-রথের চাকা। এর ওপরে ভর করেই হয় ফেরদৌস নয় জাহান্নাম।

আর নরকেও আপত্তি ছিল না। কারণ প্রতিদিনের তিল-তিল যন্ত্রণার সঙ্গে তুলনায় সে হয়তো অকিঞ্চিৎকর।

তাছাড়া মিথ্যাচার লাম্পট্য এসব তো সাধারণ মানুষের খুন পান করেও সামান্য দান খয়রাত এবং নামাজ রোজা, ঘুষ দিয়েই যে স্বর্গ লভ্য, সে আর কি এমন লোভনীয়?

কিন্তু বাচ্চাদের জন্য যত ভাবনা। এরা তো কোনো দোষ করেনি। কারও কাছে নয়। সঙ্গতি নেই, তবু এদেরকে জন্ম দেয়ার অপরাধ হয়েছে তা মনে করারও কোনো মানে নেই। কারণ, ছেলেপলেরাই তো সংসারের সকল আশা ও আনন্দের উৎস।

তবে এদেরকে আরো ভালোভাবে পালাপোষা করা উচিত একথাও ঠিক। বিশেষত ওরা ইন্টেলিজেন্ট এবং প্রত্যেকটিরই ব্রেন আছে।

মাথাটা ঈষৎ ঝুঁকিয়েঅন্যমনস্কভাবে এগিয়ে চলছিলেন রশিদ সাহেব, একটা রিকশা প্রায় তাঁর গা ঘেঁষে গেল, তিনি হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। উচ্চারণ করলেন ইস্টুপিড।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কালো মসৃণ পীচঢালা রাস্তা শেষ। এর পরে সুরকি-ওঠা এবড়োখেবড়ো ভাঙা-ভাঙা কাঁচা মাটির পথের শুরু। সে যুগের পরিত্যক্ত খানা-ডোবা ঝোপ-জঙ্গলের মধ্য হতে আধুনিকা নগরী-নটিনী জেগে উঠেছে এবং শহরতলীর এই গ্রামীণ কোণেও লেগেছে তার নৃত্যের উত্তরীয়। হাল ফ্যাশানের বড়ো বড়ো বাড়ি। সামনে বাগান, পুকুর। পেরামবুলেটারে তুলতুলে শিশু। দৈত্যাকৃতি ট্রাকের ঝকঝক্কর এবং গাড়ির হর্ণের আওয়াজে এ স্থান মাঝে মাঝে উচ্চকিত হলেও এখানে কেমন একটা ছায়া-ঢাকা মনোরম শান্তি। টুনটুনি লাফায় লতায়-পাতায়, পাখিরা কিচিরমিচির করে, ঘুঘু ডাকে। একটি ইংরেজি কবিতায় পাওয়া গিয়েছিল, প্রকৃতিই মানুষের সর্বোত্তম শিক্ষক। কথাটা নেহাৎ মিথ্যে নয়। এখানকার লোকগুলি মাটি গাছ-গাছড়া আকাশের কাছাকাছি রয়েছে বলেই যেন বেশ ভদ্র এবং সহৃদয়।

এদের মধ্যে গফুর মাস্টার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেশে পাশের গ্রামেই তাঁর বাড়ি। তাঁর একটা আর্শ আছে, সংকল্প আছে। অপরিমেয় দুঃখকষ্ট সয়েও একটি ছেলেকেও মানুষ করতে পারেননি। সেকারণে তাঁর ভয়ানক ক্ষোভ। তাঁর মতে সেজন্য দায়ী গ্রামের বিষাক্ত পঙ্গু পরিবেশ। তাই জমিজমা বিক্রি করে শহরে এসে সোয়া তিন কাঠা জমির ওপরে ছোটখাট একটি টিনের বাড়ি করেছেন। দেখা হলেই কুশলবার্তা জিগগেস করেন, ভারী অমায়িক লোক। দোষের মধ্যে একটু বেশি খাটোকান।

পাতাবাহারের ছাওয়া পথের মোড়টা ছাড়িয়ে দেখতে পেলেন, গারে হাত দিয়ে তাঁর বারান্দায় কে বসে আছে। এত সকালে নিশ্চয় উনি বেরিয়ে যাবেন না কোথাও।

বাড়িটার তিন দিকে নাতিউচ্চ বিলেতি মেহেদির বেড়া। সুমুখে খানিকটা জায়গা খালি, গেটের মতো। রশিদ সাহেব ভিতরে ঢুকলেন।

কি ব্যাপার! আপনি এখানে, অমন ভোরবেলায়!— লোকের কাছেই লোক আসে, এবং তা কিছু অস্বাভাবিকও নয়, তবু রশিদ সাহেব যেন তাজ্জব হয়েছেন।

টাক পড়া, গোলগাল মুখ থলথলে করিম সাহেব কাষ্টহাসি হাসলেন। তাকিয়ে বললেন, কপালের লেখা সায়েব, কপালের লেখা! তাই বসে আছি।

কিস্‌সু বোঝা গেল না। রশিদ সাহেব সহানুভূতির ভঙ্গিতে হাসলেন।

আমিও কিস্‌সু বুঝতে পারছি না। এ কি ভুতুড়ে কান্ড! মনে করেছিলাম, মাস্টার মানুষ,

সাদাসিধে লোক, বিপদে পড়ে দশটা টাকা চেয়েছেন, দিই। ওরে বাব্‌বা, দেখি সেয়ানা বুড়ো। শেষে কিনা আমার সঙ্গেও ট্রিক খেলছে। কতবার কথা দিয়ে ফিরিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। আজকেও এখানে এসে শুনলাম বাড়ির ভিতরে তার গলার আওয়াজ। কিন্তু যেই ডেকে পাঠালাম, ছোট ছেলেটি এসে বলে কিনা বা'জান বাসায় নেই! কিন্তু আর এসব চালাকি চলবে না। আজকে তাকে আমি ধরবোই! বুড়ো বাটপাড়!

একটু বিরতি নিয়ে করিম সাহেব জিগগেস করলেন, আপনার কি ব্যপার?

আমার এমন কিছু নয়। রশিদ সাহেব বলরেন, বেড়াতে এসেছিলাম। দেশের লোক, অনেকদিন দেখা নেই। মনে করলাম একটু খবরা-খবর নিয়ে যাই।

বেশ, বসুন। আমি হলপ করে বলতে পারি, বাড়ির ভিতরেই আছে। আপনি একটা ডাক দিয়ে দেখুন না!

রশিদ সাহেব ইতস্তত করলেন। বললেন, না থাক। আমার তেমন কিছু জরুরি কাজ নয়ঢ। আপনাকে যখন নেই বলেছে, ডাক দিলে আমাকেও ঠিক তাই বলবে। কাজেই, আমি চলেই যাই। আপনি বসুন। দেখুন বেরোয় কিনা। আপনার সঙ্গে তার ব্যবহারটা সত্যিই ভালো হয়নি। আচ্ছা আসি, আদাব!

করিম সাহেব বললেন, আদাব!

তার চেহারা দারুণ বিতৃষ্ণায় তিক্ত।

রশিদ সাহেবের মনটাও খারাপ হয়ে গেল খুব। অনেক আশা করে এসেছিলেন, এখানে চাইলে কিছু পাওয়া যাবে। কিন্তু প্রথমেই গুড়েবালি।

গিন্নির শাসানিটা মনে পড়েছে। গেটের বাইরে এসে তিনি হন্‌হন্‌ করে হাঁটতে লাগলেন। আরো কিছু পরিচিত রোক আছে, শান্তিনগর দিয়েই যাওয়া যাক।

বটগাছের নিচে ভাঙা মন্দির, তা ছাড়িয়ে খানিকটা গেলেই একটা চা'য়ের দোকান। বাইরে টুলপাতা, দু'একটি বেকার প্রায় চব্বিশ ঘন্টাই যেন এখানে উপবিষ্ট থাকে। ভিতরে ঢোকবার দরজার কাছে মাটির উনুন, তা'তে চা'য়ের কেটলি, বাষ্প-ওড়া। সম্মুখ দিয়ে বড়ো রাস্তার দিকে যাওয়ার সময় রশিদ সাহেব পকেটে হাত দিলেন। পয়সা আছে। কম নয়, ঝাড়া দেড় আনা। গরম চা'য়ে গলাটা ভিজিয়ে নিলে মন্দ হয় না। খিদেটা মরে যাবে, হাঁটতে লাগবে ভালো।

ভিতরে ঢুকছিলেন, এমন সময় চোখ তুলে বিস্মিত হলেন, লকলকে কঞ্চিরমতো গফুর মাস্টার সম্মুখে সশরীরে দন্ডায়মান! তার ভাঙাচোরা অমসৃণ মুখের চড়াই-উৎরাই খাদে-ভাঁজে দরজা হাসির নানা বিকৃতি। উনি হাত বাড়িয়ে তাঁকে পরম আদরে গ্রহণ করলেন।

আপনি এখানে! আমি আরো খুঁজে এলাম। তর্‌জার বেড়ায় লাগানো বেঞ্চিতে বসতে বসতে রশিদ সাহেব জিগগেস করলেন, চা খেয়েছেন?

হ্যাঁ, ভালো আছি। তা আপনি কেমন? বাড়িতে সবভালো আছে তো? বড় মেয়েটার যে বিয়ে দিলেন সে কেমন চলছে?

একসঙ্গে এত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মুশকিল। আর দিয়ে কোনো ফায়দাও নেই। এক বললে শুনবে অন্য। তাই রশিদ সাহেব সংক্ষেপে বললেন, সব ভালো। আপনি যে একবারও গেলেন না?

হেলেনা? ওর কথা আর শুধাবেন না, একেবারে পোড়াকপাল। একটা প্রস্তাবও শেষ পর্যন্ত টেকে না। এখন দোজবর পেলেও দিয়ে দিই। আর কি, দু'টি খেতে পেলেই হল।

য়াঃ শালার—। রশিদ সাহেব বিরক্ত হলেন। লোকটাকে আঘাত দেওয়া দরকার। তাই

কানের কাছে মুখ নিয়ে প্রায় চে'চিয়ে বললেন, করিম সাহেব।

তড়াক করে সটান দঁড়িয়ে গেলেন গফুর মাস্টার। নিমেষে তার চেহারা ফ্যাকাশে। ভয়ার্ত কম্পিত স্বরে বললেন, করিম সাহেব!— এ্যাঁ, করিম সাহেব! কোথায়?

নামের এমনি মহিমা। শুনতে পায় না তাতে কি? সেই বন্ধ কানের ভিতর দিয়েই একেবারে মর্মে গিয়ে প্রবেশ করল, প্রাণ আকুল করল। এই লাইনে ঘাগু রশিদ সাহেব হাসলেন মিটিমিটি, তাকে টেনে পাশে বসিয়ে আবার উঁচু গলায় বললেন, ভয় নেই। করিম সাহেব আপনার বারান্দায় বসে আছে।

তাই বলুন। আমি ভেবেছিলাম এই দিকে আসছে বুঝি। একবারে চমকে দিয়েছিলেন সায়েব। যেন দশমণি বোঝা নেমে গেল, এমনি স্বস্তির ভাব। ভদ্রলোককে বলাটা কি ঠিক হল? হবে না কেন? বলার আগেই তো বুঝতে পেরেছিলেন। কাজেই, আরও কিছু শুনিয়ে দেওয়া যাক। গফুর মাস্টার বললেন, আচ্ছা আপনিই বিচার করুন তো। এ ভাবে একটা লোককে জ্বালাতন করা কি ঠিক? বাসায় থাকাই আমার দায় হয়ে উঠল। সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই যখন-তখন লোক পাঠাবে, নয়তো নিজে আসবে। আরে বাপু, তোমার ও ক'টি টাকার জন্য আমি কি বাড়িঘর উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছি? কিন্তু আমিও তার চাল বুঝেছি।

কি জবাব দেবেন? চা'য়ের কাপে শেষ চুমুকটা দিয়ে রশিদ সাহেব ভাবলেন। এরপর উঠতে উঠতে বললেন, ঠিক হয়েছে। যেমন কুকর তেমনি মুগুর। এককাপ চা খাওয়ালে তার পয়সাও আদায় করে ছাড়ে, এমনি কঞ্জুষ! আচ্ছা এখন আসি। সালামালাইকুম!

কথাগুলি কানের ধার দিয়েও গেল না গফুর মাস্টারের। বিদায় দিতে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, সে আর বলতে হবে না, যা আমি। নিশ্চয় যাব একদিন।

ছায়াঢাকা শান্তিনগরের ভিতর দিয়ে নানা পথে হাঁটতে হাঁটতে বড়ো রাস্তায় এসে একটা দোকানের ঘড়িতে দেখা গেল, সাড়ে ন'টা বাজে।

ঘোরা ছাড়া কোনো কাজই হল না, এখন ফেরা দরকার। পোঁক্ পোঁক্ ডাক ছেড়ে টাউন-সার্ভিসের বাসটা ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে, ট্রাফিক আইন ভেঙে, তার পা দানিতেও দু'টি লোক। ওদের সাহস কম নয়, পা একটুখানি পিছলে গেলে একেবারে ডাল, তাতে সন্দেহ নেই।— কিন্তু জানের মায়ার চেয়ে অন্নের তাড়াই হয়তো বড়ো। সময়মত টিক জায়গাটিতে হাজিরা দিতে হবে, নইলে আবর্জনা। তবু আজকে রোববার, অনেকের অফিস নেই, কিছুটা রক্ষে। তা না হলে আজকাল বাসে চড়াটা পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের শামিল। আশ্চর্য, এত লোক কোথেকে এল? অন্ধকার দুর্যোগের রাত্রিতে দুর্বিনীত বন্যার পানির মতো এরা হুড়হুড় করে ঢুকে পড়েছে অফিস-আদালতে, ইস্কুল কলেজে, ব্যবসায়-বাণিজ্যের আস্তানায়। রং-বেরঙের মুখ, বিচিত্র সাজপোশাক, কথাবলার ভঙ্গি। রাস্তায় বেরুলে ধাক্কা খাওয়াতেই সন্তুষ্ট।

এককালের ক্লেদাক্ত শহরটা মণিচূড় নাগিনীর মতো ছিপছিপে রুপালি শরীরে যেন ফুঁসে ফুঁসে বেড়েই চলেছে। চারদিকে তার নব নব অভিসারের রঙমহল।

কিন্তু ডি-আই-টি অভিন্যুর স্প্লিল আলো তো আকালে ছেলে হারানো মেয়েটির চোখে ঘুমের শান্তি এনে দিতে পারল না? দুই যুগের গলির অন্ধকার একবিন্দুও অপসৃত করতে সক্ষম হল না?

এই যে, রশিদ সাহেব, শুনুন!

রশিদ সাহেব ফিরে দাঁড়ালেন, কে?

আমাকে চিনতে পারছেন না?

পারব না মানে? কিন্তু এই হাল কেন আপনার। বড় অসুখে পড়েছিলেন নাকি?

অসুখ? না, অসুখ হয়নি। অসুখ আমার হয়না, আমার হতে পারে না। আমি ভালোই আছি।

সালাম সাহেবের স্বর ভেঙে গেল, ঠোঁট কাঁপল, তিনি চুপ হয়ে গেলেন। পাশাপাশি দপ্তরের লোক, অনেকদিন থেকে জানাশোনা। এমন তো তিনি ছিলেন না। সাদাসিধে নিরীহমানুষটি, লম্বাটে বাদামী মুখটা তার সব সময়হাস্যোজ্জ্বল থাকত। কিন্তু এখন তো ধূসর বিবর্ণ। গায়ের ময়লা জামাকাপড়ে নিরতিশয় দীনতার ছাপ। চুপসানো চোয়ালে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, মাথায় উসকোখুসকো চুলগুলি যেন সবই পাকা। সস্তা চশমার কাচের ভিতর লালচে চোখদুটো অসহায় কারুণ্যে ভরা।

ঠিক কথাটি খুঁজে না পেয়ে রশিদ সাহেব বললেন, তাহলে কোনো বিপদ-আপদ ঘটেছে নিশ্চয়? আপনার শরীরটা একেবারেই ভেঙ্গে গেছে।

সেজন্য আমি ভাবি না। সালাম সাহেব কি যেন চিন্তা করলেন। পরে বললেন, আমি অনেকক্ষণ আপনার পিছু, ছি আসছি, আপনি লক্ষ্য করেননি।

কি ব্যাপার বলুন তো?

সালাম সাহেব খানিকক্ষণ চুপ হয়ে রইলেন।

এরপর, কথা বলতে গিয়ে ভেউ-ভেউ করে চোখের পানি ছেড়ে দিলেন। রশিদ সাহেব আত্মস্থ হলেন। নাকে সশব্দে একটা শ্বাস টেনে বললেন, আচ্ছা, আপনিই বলুন, একজনের উপকার করা কি অপরাধ?

কেন, কি হয়েছে?

বিশেষ কিছু নয়? সালাম সাহেব বলতে লাগলেন, আপনাদের অফিসের করিম সাহেবকে চেনেন তো? বেশ ভালো লোক বলেই উনি পরিচিত। অথচ আমার সঙ্গে অমন ব্যাভারটা কেন করলেন, বুঝতে পারলাম না। দশটা টাকা নিয়েছিলেন। অনেক ঘুরিয়েছেন। গতকাল বললেন, আজকে অবশ্যই দেবেন। সকালে উঠেই আমি গেলাম। বাড়ির সামনে দেখা হয়ে গেল। বললেন, একটু দাঁড়ান, নিয়ে আসছি। কিন্তু আড়াই ঘন্টা ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম, উনি ফিরে এলেন না। পরে অনুমান করলাম, বাড়ির পিছন দিয়ে কোথাও উধাও হয়ে গেছেন! ইটস ওয়ান্ডার। এদিকে আমার ওয়াইফের অবস্থা যখন-তখন। তার ইনজেকশন আর পথ্যি কিনতেই বেরিয়েছিলাম। এই দেখুন প্রেসক্রিপশন।

পকেট থেকে একখন্ড গুটানো কাগজ বার করে তা মেলে ধরলেন। এ যেন আদালতে আবেদন এবং আশ্রয় প্রার্থনা।

কাগজটা নেড়েচেড়ে দেখে রশিদ সাহেব বললেন,সত্যি কাজটা ভালো হয়নি তার। কথা দিয়ে কথা রাখা উচিত ছিল।

এখন কি করি বলুন! সালাম সাহেব থামলেন, এরপর মনের ভিতরকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব যেন অকস্মাৎ ঝেড়ে ফেলে বললেন, আপনার কাছে টাকা আছে! থাকলে কিছু দিন না। মাসের পয়লা তারিখেই ফেরত দিয়ে দেব। দিন্ না অন্তত দুটো ইনজেকশন নিয়ে যাই। বাঁচবে না হয়তো, কিন্তু একটুখানি চিকিৎসাও করে দিতে না পারলে সে খেদ কোথায় রাখব!

কিছু দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর আছে, দুনিয়ার একটি লোকও অন্তত তাঁর সম্বন্ধে এই কথা ভাবে জেনে রশিদ সাহেব তৃপ্তি পেয়েছিলেন, তবু চিরাচরিতঅজুহাত দেখিয়েই লোকটার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলেন তিনি। কিন্তু তাঁর মনে তখন নানা অনুভূতির তোলপাড়। এ কি হল হঠাৎ? দুঃখ তিনি পেয়েছেন, এবং অন্যকেও দুঃখ পেতে দেখেছেন, কিন্তু সে-সব

তো কোনদিন এমন বুকের ভিতরে এসে ঘা দেয়নি? চিনইচন্ করে ব্যথা জাগছে যেন কলছের বোঁটায়, চোখের দৃষ্টি একেবার আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। হাঁটতে গিয়ে পা'দুটো কেমন কেঁপে কেঁপে উঠছে। গলার রগের মধ্য দিয়ে সাপের মতো কি যেন দলা পাকাচ্ছেতনি যদি তারস্বরে চিৎকার করে উঠতে পারতেন।

নিজেকে অপরাধী মনে হল তাঁর। কেন, তার কারণ জানা নেই। শুধু অস্পষ্ট কিলবিল দুঃস্বপ্নের মতো বোধ হল, জমির সাহেবের টাকাটা পরিশোধ করা তাঁর পক্ষে একেবারে অসম্ভব ছিল না। তারও তো অসুবিধে থাকতে পারে। মেয়েকে কাপড় দেয়ার কথাটা হয়তো মিথ্যে নয়।

ঘাড়টা ঈষৎ কাত করে চলতে চলতে তন্ময় দ্রুততার সঙ্গে তিনি বাসায় এসে উঠলেন। রান্নাঘরের শেডে গিয়ে জিগ্‌গেস করলেন, আমার কাছে কেউ এসেছিল?

একগোছা চুল এলিয়ে-পড়া, আগুনে-তাতানো মুখটা তুলে স্বামীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন ফতুবিবি। পিতলের চুঙিতে উনুনে ফুঁ দিতে দিতে জবাব দিলেন, এসেছিল। ঐ চিঠি। আবার আসবে।

বেড়ায় গুঁজে রাখা কাগজের টুকরোটা টেনে নিয়ে তার ওপর চোখ বুলিযে গেরে রশিদ সাহেব। জমির সাহেব লিখেছেন, জ্বরটা বেড়েছে। তাই নিজে আসতে পারলাম না। ছেলেটিকে পাঠালাম। কি আর বলব, আশা করি, আজকে নিরাশ করবেন না।

রশিদ সাহেব কি ভাবলেন খানিকক্ষণ। এরপর বললেন, শোনো, তুমি তো কিছু কিছু সেভ কর। কিছু টাকা হবে? এই দশটার মতো? খুব দরকার ছিল!

তার মানে? ফতুবিবি কারণটা জানতে চাইলেন না, কঠিন স্বরে বললেন, আমার কাছে এক পয়সাও নেই!

রশিদ সাহেব এখন পরাজয় না মানতে দৃঢ়সংকল্প। বললেন, বাজে কথা। আমি জানি আছে। তোমার ঐ বাঁশটা?

আঁচলে ঘাম মুছে চোখজোড়া বড় বড় করে তাকালেন ফতুবিবি, স্থির হয়ে বললেন, খবরদার! ওটিতে হাত দিলে ভালো হবে না।

কিন্তু রশিদ সাহেব বেপরোয়া। কাছে পড়ে থাকা নতুন ধারাল দা-টা তুলে নিয়ে গট্‌গট্ করে ঘরের ভিতরে গেলেন।

ঘরের এক কোণায় আলনাটার পাশে হাতচারেক লম্বা পুরনো একটি বাঁশ ঠেস দিয়ে রাখা; এটি ফতুবিবির ব্যাঙ্ক। বুক সমান উঁচুতে তার একটি গাঁটের নিচে একটি আয়তাকার ছিদ্র, এর মধ্যে যখন যা পারেন, সঞ্চয় করেন। অনেক হয়, কোনো কোনো সময়। রীতিমতো কাজে লাগে। বিশেষ করে এই কৌশল অবলম্বন করার দরুন কোনো শীতেই ছেলে-মেয়েদের জামাকাপড়ের অসুবিধে হয়নি। কালেভদ্রে নিজের জন্যও এক আধাখানা ভালো শাড়ির দরকার। সমাজে বাস করলে মাঝে-মধ্যে বাইরেও যেতে হয় বৈ কি।

গটে হঠাৎ খট্‌খট্ আওয়াজ।

কে এল? রশিদ সাহেব উঠে গেলেন।

দরজার কাছে গিয়ে দেখলেন, জমির সাহেবের ছেলেটা দাঁড়িয়ে। হাতে দা, উদভ্রান্ত চেহারা, আঁৎকে উঠে সে প্রায় পিছিয়ে যাচ্ছিল, রশিদ সাহেব বললেন, এসেছ? দাঁড়াও। আমি এক্ষুণি আসছি।

ফিরে আসার পর দাঁতে দাঁতে চেপে ডান হাতটার মধ্যে মনের সমস্ত ইচ্ছা, এবং দেহের সমস্ত শক্তি সঞ্চারিত করে বাঁশে কোপাতে লাগলেন। মাথায় যেন খুন চেপেছে তাঁর। ক্রাক্‌ক্রাক্ শব্দ

ঘরের চারকোণে পরিধি ছাড়িযে বহুদূরে চলে যাচ্ছে হয়তো। এ এক তিলিসমাৎ। যে ছেলেমেয়েরা এখনো ইস্কুলে যায়নি, তারা এদিক-ওদিক থেকে ছুটে এসে মায়ের কাছে দাঁড়িয়েছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সংকল্পের সিদ্ধি। চিলতে চিলতে বাঁশের টুকরোগুলি ঝরে পড়তে একসঙ্গে দু'টো আঙুল ঢোকবার আন্দাজ একটি লম্বাটে ফুটো দেখা দিল।

রশিদ সাহেব দেখলেন কঠিন ছোবড়ায় ছাওযা শুকনো তালের ভিতর কচ্‌কচে খোমার মতো টাকা পয়সার জড়াজড়ি। যাক তাহলে খাটুনি সার্থক।

বাঁশটা একটুখানি গড়িয়ে যেতে অনেকগুলি আনি সিকি আধুলি ঝন্‌ঝন্‌ করে পড়ল। ছোটরা জিকির দিয়ে উঠেছিল, মা এক ধমকে দিলেন থামিয়ে। রশিদ সাহেব সেসব কুড়োবার চেষ্টাও করলেন না। বাঁমের ফুটোর ভিতরে আঙুল ঢুকিয়ে টেনে নোট বার করতে লাগলেন। এক টাকা, দু'টাকা, তিন টাকা! এই যে পাঁচ টাকার নোট একখানা! চার টাকা, পাঁচ টাকা,— এক টাকার নোট ছ'টা পাওয়া গেল। খুচরো পয়সায় আর হাত দিয়ে কাজ নেই।

বুকের ভিতরটা দুর্বোধ্য নিগূঢ় উত্তেজনায় ঢিব্‌ঢিব্‌ করছে, তাঁর চেহারায় একটা নিষ্ঠুর জান্তব তৃপ্তি। স্ত্রীর দিকে চেয়ে তিনি বলরেন, আমার হয়ে গেছে। বাকিটা তুমি নিয়ে নাও। হেঃ হেঃ হেঃ!

ঠিক এই সময় শোনা গেল, গেটের কপাট দুটো— আই-সাই ফাঁক হয়ে ঠাশ্‌ঠাশ করে দুই ধারের থামে গিয়ে লাগল। শব্দটা এমন আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত যে, এদিকে দাঁড়ানো সবাই একসঙ্গে কেঁপে উঠল। কার এত দৃষ্টতা?

কে— তিক্ত বিরক্ত অস্বাভাবিক চড়া গলায় চিৎকার করে উঠে রশিদ সাহেব বেরিয়ে গেলেন, নোটগুলি তাঁর ডানহাতে মুঠোয় ধরা। অন্যেরাও গেল তাঁর পিছু পিছু।

বারান্দায গিয়ে সকলে বিস্ময়ে বেদনায় হতবাক। একি! রাণী দাঁড়িয়ে আছে, রাণী! তাঁদের এককালে পরম আদরের চপলা শ্যামলী সুন্দরী, বড় মেয়ে রাণী! রাণী না কোনো ভিখারিণী পাগলী, কোলে তার দেড় বছরের বাচ্চাটা গলার কণ্ঠি দেখা যাচ্ছে, মুখখানা পাণ্ডুর বিবর্ণ। এক যুগ তেল না-পড়া শনের মতো খড়খড়ে চুল উড়ছে। পরনের বহুব্যবহৃত তেনার মতো বিদঘুটে ময়লা-পড়া আধছেঁড়া কাপড়। বারান্দার নিচে জবজবে ভেজা ঢালু জায়গাটায় খালি পায়ে অর্থহীনদৃষ্টি মেলে সে দাঁড়িয়ে আছে!

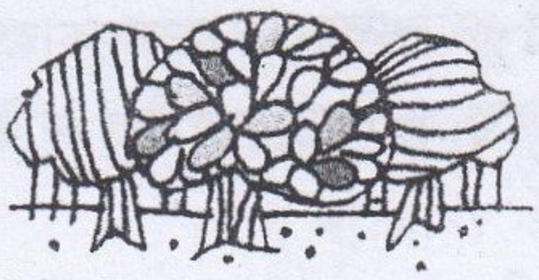
অকস্মাৎ স্বপ্নের ঘোর যেন কেটে গেল। অস্ফুট আর্তনাদের সঙ্গে বারান্দার ওপর থেকে নেমে গিয়ে মেয়েকে জড়িয়ে ধরলেন ফতুবিবি। ব্যাকুলভাবে বললেন, টিকতে পারলি না, মা! তুই টিকতে পারলি না।

কিন্তু রশিদ সাহেব স্তব্ধ, নির্বিকার মুটোর মধ্যে ধরে রাখা নোটগুলি-সহ ডানহাতটা পাঞ্জাবীর জেবের ভিতরে ঢুকিয়ে তিনি দরজার কাছে গেলেন। ছেলেটি তখনো দাঁড়িয়েছিল। তাকে দেখে সে আশ্বান্বিত হয়ে চাইল। জেবের ভিতরে কড়কড়ে কাগজগুলি আরো শক্ত করে চেপে ধরলেন রশিদ সাহেব, এরা যেন ডাকনা ঝাড়া দেবে, কক্‌কক্‌ করবে, মোরগের মতো বাক্‌ দিযে উঠে নিজেদের অস্তিত্ব ঘোষণা করবে। ম্লানমুখে বলরেন, পারলাম না বাবা, আজকেও পারলাম না। অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুতেই টাকার যোগাড় হল না। তোমার আব্বাকে বলো মাসের পয়লা তারিখে আমি দিয়ে আসব। কেমন?

হাঁ বা না কিছু জবাব দিল না ছেলেটি, মাথাটা নিচু করে আস্তে আস্তে ফিরে চলল।

মা'য়ের হাত থেকে হড়কে গিয়ে রাণী তখন ভেজা ঠাণ্ডা মাটির ওপর অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।

মে, ১৯৫৮।



ধোঁয়া

মুকে তুই চিনবি কেনে। কী দুঃসাহস, চিবুক নেড়ে ঘাড় বেঁকিযে ঠমক মেরে বলল কিনা, তোর সায়েব চেনে।

কথা নয় যেন সীসের গুলী। নিশ্চয়ই চা বাগানের কামিন, ওর অত দেমাক কিসের? ভঙ্গিটাতেই এমন একটা ইঙ্গিত, যা অতিশয় গূঢ়; চিকন নাকের ডগায় ফুটে ওঠা একটা তির্যক তাচ্ছিল্য ঃ হাতে সোনার কাঁকন, দামী ক্রেপ শাড়িপরা জলজ্যান্ত মেমসাব যেন কিছু নয়।

দুপুর গড়িয়ে যাওয়ার পর বিছানা থেকে উঠে যখন বারান্দায় পায়চারী করছিল, কিছু দূরে মাটির পাহাড়ের পাড় ঘেঁষে কালো রেখার মতো টানা কুলিধাওড়া বস্তির ওপরে পিঙ্গল ধোঁয়া দেখে এগিয়ে এসেছিল এবং আস্তে আস্তে নিজের অজান্তেই বাঙলোর টিলার ঢালুতে নেমে পড়েছিল খানিকটা, আর তখনই এই ঘটনা। ওপরে উঠে আসবে কিনা মেয়েটা ইতস্তত করছিল, নইলে ওর পরিচয় শুধোবারও কোনো কারণ ঘটত না। জবাবটা যেন আগে থেকে বানানো, ইচ্ছাকৃত।

কথাটা, ভেবে দেখলে, খুবই আপত্তিজনক। এর জন্য ওর জরিমানা কি ছাঁটাই, কিংবা দুই-ই একসঙ্গে হতে পারে। তবু রাহেলা ভাব ছিল না, সে কতকটা বিহ্বল ও মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিল মেয়েটাকে, কালো— বেশ কালো তবু আশ্চর্য সুন্দর। বাঁশীর মতো শরীরটা, প্রথম যৌবনের জোয়ার এসে তাকে ভরে তুলছে। শাড়ির পাড়ের নিচে পুষ্ট পায়ের গোড়া, চলবার সময় পাছাজোড়া নাচতে থাকে। বুকখানি সোচ্চার, গ্রীবা উন্নত। ধারালো চাহনি। মনে মনে আপনি জাগে তুলনাঃ ও যেন পাথরচাপা বিবর্ণ শাদাটে ঘাস আর সে তীরশীর্ষ ঘন সবুজ দুর্বা, ও বন্ধডোবা, আর সে কাঁকর-কঙ্কনা ক্ষীণকটি পাহাড়ী নদী। এমন দেহ পুরুষের লোভনীয় হবে সে আর বিচিত্র কি!

এমন সময় হর্ণ শোনা গেল; মেয়েটি এখনো টিলার বাঁকের আড়ালে যায়নি, থমকে দাঁড়ায়। বন্ধুর সঙ্গে আবিদ গিয়েছিল শিকারে, ফিরে এসেছে। কিন্তু মেয়েটাতো টান হয়ে দাঁড়িয়েই রইলো, মাথা ঝুঁকিয়ে সেলাম করলো না!

সশব্দে ওপরে উঠে সূর্যমুখীর ঝাড়ের কাছে জীপটা থামলে বন্দুক হাতে ওরা নামলো দু'জন।

সোফাসেট ইজিচেয়ার সবই আছে বারান্দায়, একটু নিচে নিমেই ওপরে উঠতে কাহিল হয়ে পড়েছিল রাহেলা, বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করতে থাকায বসেছিল; বিয়ের তিন বছর পর প্রথম প্রসব। অনেক শঙ্কা অনেক ভয়, তাই দু'মাস আগেই ঢাকার ম্যাটারনিটি হোমে ভর্তি হয়েছিল; কিন্তু নসিব এমন জন্মাল মৃত সন্তান। এরপর অনেক চিকিৎসা সত্ত্বেও পুরোপুরি ফিরে আসেনি স্বাস্থ্য। ইচ্ছে ছিল কিছুদিনের জন্য কক্সবাজার যায়; কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনা বাতি করেছে; কারণ, বাগানে তার অসুবিধে হচ্ছে। সব ব্যবস্থা থাকলেও হয়তো রীতিমতো নাওযা খাওয়া নেই।

এই কর্তব্যবোধটা ওর মজ্জাগত, মায়ের মাধ্যমে রক্ত প্রবাহে পাওয়া বনেদী গুণ।

খান্দানি পরিবারের মেয়ে, ইংরেজী চর্চায় কাঁচা হলেও পেয়েছে পুরো ধর্মশিক্ষা। নামায কাজা করে কদাচিৎ। উপরন্তু নিজেদের ঘরের ভিতরে যা দেখেছে তা থেকে নেওয়া, স্বামীর প্রতি অগাধ ভক্তি ও বিশ্বাস।

ক্লাব বাগানের অচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং সেখানে কি হয় সে সম্বন্ধেও কিছু জ্ঞান আছে। তবু এ নিয়ে তাকে কোনদিন নাজেহাল করেনি; মাঝেমধ্যে বাঁকা কথা বলে, মেযন কুলি মেয়েদের বলে ওর গার্লফ্রেন্ড, কিন্তু এ পর্যন্তই। গ্রাম নগর থেকে বহুদূরে এই নির্জন এলাকায় এক বাসায় দুটি প্রাণী, এদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা কি খিটিমিটি থাকলে চলবে কেন।

তবে আজকের মেয়েটিকে চমকের মতোই লেগেছে, তাতে সন্দেহ নেই, সেজন্য ঘুরে ফিরে সে-ই জীবন্ত। আবিদ সব জানে, হয়তো সব জানে। আবিদ লিখেছিল বাবুর্চি ফিরে আসেনি, ভালো রাঁধতে পারে একটা কুলি মেয়ে সে রোজ দু'বেলার রান্নাবাড়ার কাজ করে যায়— একি সেই? কাছাকাছি আসবার সুযোগ না পেলে, দুর্বলতার কারণ না ঘটলে এমন দৃষ্টতা ওর হত না কখনো। সেদিন আবিদ হ্যাট মাথায় ছড়ি হাতে দুপুর বেলায় বাগান তদারক করে এসে বুটজোড়া খুলতে খুলতে বলছিল, মুশকিল, কুলিদের মধ্যে একটা-না-একটা গোলমাল লেগেই আছে। মহা ঝামেলা। দু'টোকে জরিমানা করলাম, তার ওপর কালী মেয়েটা পাগল হয়ে গেছে। কালী? কে কালী? অহহো হ্যাঁ কি হবে ওর এখন? কি আর হবে? সবকিছুর এক ওষুধ শ্যামচাঁদ, আর তাতে না কুলালে পাবনা।

কিন্তু, এ যদি কালী হয়ে থাকে তাহলে বলা যায়, যে কথাই বলুক সে পাগল নয় একান্ত সুস্থ-সবল। তবে কেন—

রোদে পুড়ে বিবর্ণ ওরা দুই বন্ধু হাসতে হাসতে এগিয়ে এলে রাহেলা উঠে দাঁড়ালো। হাসবার চেষ্টা করলো সেও, কিন্তু তখন নিজের মধ্যে এমন নিমজ্জিত তার ফ্যাকাশে ঠোঁটের কাছে একটু কুঞ্চন জাগলো মাত্র।

ইউ আর লাকি রুহি, বন্দুকটা দেয়ালে ঠেস্ দিয়ে রেখে আবিদ বলল, হরিণের মাংস খেয়েছ, এবার বনহংসী।

শুধু তাই নয়, এরা কোন্ দেশের কোন্ বনের তা বলতে পারবেন না। সিগারেটের টুকরো অ্যাশট্রেতে পিষে সিদ্দিক বলল, হয়তো সাইবেরিয়ার, বৈকাল নয় তাহিতির! বিনা দ্বিধায় অনায়াসে হাজার হাজার মাইল উড়ে চলে আসে। বাসা ওদের আছে, কিন্তু সত্যি সারা দুনিয়াই যেন ওদের ঘর।

আমার বহুদিনের শখ আজ মিটলো। পিওন মৃত পাখিগুলোকে উল্টো করে ধরে নিয়ে এল, আবিদ তক্ষুণি সোজা হয়ে বসে, রাহলাকে লক্ষ্য করে বলল, দ্যাখ দ্যাখ কি সুন্দর। গাঢ় নীল আকাশের রং, শিউলীর বোঁটার মত রঙিন গলকম্বল। ইট মে বি দ্যাট শী ওয়াজ এ নটি লিটল মেড অব এ ইয়ং বার্ড। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

বিজয়ী শিকারীর স্বাভাবিক উল্লাস, তবু এর মধ্যে কোথায় একটা নিষ্ঠুরতা। কাছে নিয়ে পাখিগুলোকে দেখে রাহেলা ওভাবে উল্লেখ করার দরুনই গাঢ়তর করুণায় আপ্লুত। পাহাড়ী হ্রদের মুক্ত বিহঙ্গ এত দূরে এইভাবে এসে প্রাণ দেবে নিশ্চয় জানত না।

নিয়ে যা প্রায় পিসফিস করে বললো, এবং পরে বাবুর্চি এসে যখন জানতে চাইল কিভাবে রাঁধবে, রূঢ় দৃষ্টিতে তাকালো তার দিকে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে হাত-মুখ মুছতে মুছতে আবিদ একটু থেমে বলল, পাগলীটা

এদিকে এসেছিল মনে হয়।

রাহেলা আনমনা ছিল, চোখ তুলে প্রশ্ন করল, কে পাগলী?

কেন দ্যাখনি? ঐ যে কালী, কুলি মেয়েটা? এদিক থেকেই তো গেল দেখলাম।

ও হ্যাঁ। রাহেলা বললো।

ওপরে এসেছিল নাকি?

রাহেলা ভাবে একটুখানি, পরে, পরখ করবার জন্য বানিয়ে বলল, হ্যাঁ।

কিছু বললো তোমাকে? কণ্ঠস্বরে আগ্রহের সঙ্গে কিঞ্চিৎ উৎকণ্ঠার আভাস।

না। রাহেলা ভাবলো ওর মন্তব্যটা বলবে নাকি, না, চেপে যাওয়াই ভালো। তবু, শান্তস্বরে, মিথ্যে করে বলল, শুধু জিজ্ঞেস করেছে তুমি কোথায়!

সত্যি? যেন বিস্মিত আবিদ, উঁচু কপালের নিচে ওর ঈষৎ ঘোলটে চোখজোড়া স্থির হয়ে থাকে।

হ্যাঁ। টেবিলে চা সাজাতে সাজাতে ও শুধাল, ওতো কাজ করতো, কিছু পাওনা টাওনা আছে নাকি তোমার কাছে?

পাওনা! অদ্ভুত ভঙ্গিতে হেসে উঠল আবিদ, ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে মাথা আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলল, পাওনা তো আমি সঙ্গে সঙ্গেই চুকিয়ে দিই?

পাউরুটি, ডিম, কেক, বিস্কুট, প্রচুর, নাশতা-চা ধ্বংস করার পর সন্ধ্যের একটু আগে বিদায় নিল সিদ্দিক, ড্রাইভার তাকে শহরে পৌঁছে দিতে গেল। ঘাড়ের চুল আছাঁটা বড় বড় চোখ জবরদস্ত যন্ডাগোছের ছেলেটা, রাহেলা খুব একটা পছন্দ করতো না। অন্যদিন শুধু ভদ্রতাটুকু বজায় রাখে; আজ নিজের হাতে চা ঢেলে দিল, ছাইদানিটা দিল এগিয়ে এবং যাওয়া সময় বলল, আবার আসবেন।

ওর ব্যবহারের এই পরিবর্তনটা লক্ষণীয় এবং আবিদের তা নজরেও পড়েছে, তবু একে অনভিপ্রেত বলে ভাবলো না। এখানকার বিশেষ ধরণের সামাজিকতার প্রতি ও বরাবরই একটু ঠান্ডা, অথচ চাকরি রাখতে হলে গিন্নিকি সে-রকমটি হওয়া চাই। তেমনি চৌকস ও কেতাদুরস্ত। একদিন গিয়েছিল, কিন্তু ক্লাবের পরিবেশ ওর বিশ্রী ঠেকেছে। তাস, পিংপং, বিলিয়ার্ড, মদের বোতল। লোকগুলোর পোশাক দামী এবং ভদ্র, তবু প্রত্যেকটিই যেন বদমায়েশ, মেয়েদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার ইচ্ছেটাকে অতিকষ্টে চেপে রাখছে। ভাবটা এমন— নীতি জিনিশটাই বর্বরতা, একের বৌ অন্যের টেবিলে হেসে হেসে আলাপ করছে, কি অন্যের হাতে কোমর জড়িয়ে নাচছে— এটাই যেন সভ্যতা। এমন জায়গায় নিয়ে গেছে বলে ফিরে আসার পর অনেকক্ষণ গালমন্দ করেছিল। আর একবার, বিলেত থেকে জেনারেল ম্যানেজার আসার দিন— সে সন্ধ্যেটা আরো অসহ্য। করমর্দন ঘেঁষাঘেঁষি, ভালো লাগেনি মোটেই ওর। তবু স্বামীর পেশাগত গতিবিধিকে বাঁকাচোখে দেখত না একথা ঠিক।

তাকে অন্যমনস্ক দেখে বলল, গাড়ি তো এক্ষুণি ফিরবে, ক্লাব থেকে ঘুরে এসো না একটু।

না। আবিদ ক্লান্তস্বরে বলর, শিকারের পর আর ক্লাব পোষায় না।

তা হলে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়। রান্না হয়ে গেছে, দিতে বলবো?

হ্যাঁ, বলো। আবিদ আর কথা বাড়ালো না।

এরপরে আরো মিতবাক। কিন্তু দু'জনেই স্পষ্ট অনুভব করে তাদের স্বাগত ভাবনার মধ্যে শান মেঘের মতো ছায়া ফেলেছে দীর্ঘ শ্যামাঙ্গী আদিবাসী কুলিমেয়ে, দুঃখ ও দারিদ্রের মধ্যে বেড়ে উঠলেও বন্য প্রকৃতির সমস্ত সুষমা যে তিলে তিলেসঞ্চয় করেছে। দেয়াল ঘড়িটা

শব্দ করে চলে টক্‌টক্ টক্‌টক্, রাত ক্রমে গভীর হয়ে আসে; আকাশের তারাগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে ঝিক্‌মিক্ করে, আর দূর থেকে শিয়ালের ডাকের সঙ্গে ভেসে আসে ধাওড়া পাড়ার নৈশ-উল্লাসের ধ্বনি, কখনো বা চিৎকার। হয়তো এখন ওদের কোনো পূজা, দেশি মদ ও মেয়েদের নিয়ে, শুকতারা জ্বলা অবধি চলবে মৌতাত। ওদের ঘরে নেই খাট-পালঙ্ক, কার্পেট, বাথরুম, রেফ্রিজারেটর, রেডিওগ্রাম। দু'বেলা পেটপুরে খেতে পাওয়া ও কাপড় দিয়ে সবটুকু গা-ঢাকা এখনো তাদের স্বপ্ন; তবু জীবনের সবটুকু আনন্দ ও সুখ যেন ওরাই আকণ্ঠ পান করতে পারছে— নইলে কেন এত উত্তেজনা, এত হৈ হুল্লোড়? কালী, হ্যাঁ কালীই তো— কালীর শরীর চাঁপাফুল নয় কালিই মতো, তবু সে কী অপূর্ব! ছিপছিপে তন্বী, হাতের কাছে পেয়ে কোনো পুরুষ তাকে ছেড়ে দেবে সে অসম্ভব!

রাত দু'টো অবধি রাহেলা প্রায় জেগেই রইলো, অনেক চেষ্টা করেও বাজে ভাবনার হাত থেকে রেহাই পায় না।

বুঝতে পারছে আবিদের শ্বাস-প্রশ্বাসের ধ্বনিও নিদ্রাহীনতার; অনুমানটা যে ঠিক তাও বুঝলো ও যখন কলম্বলটা গা থেকে সরিয়ে মশারীর বিতর উঠে বসলো।

রাহেলা কি শুধাতে যাচ্ছিল, কিন্তু আবার কি ভেবে পাশ ফিরলো, তারপর চুপ করে থাকে।

এতকাল প্রশ্ন জাগেনি তাই সবই ছিল স্বাভাবিক; কিন্তু যে সকল গল্প শুনেছে তার সবই তো মিথ্যে নয়? চা-বাগান এক আলাদা জগৎ, তার একদিকে মারিক আরেক দিকে গোলাম। মালিকই রাজা, মালিকই ভাগ্যবিধাতা! তিনি আইন, তিনি আদালত। তাঁর মর্জি সকলের মর্জি। সামনাসামনি না থাকলেও এই অর্ধনগ্ন, অর্ধসভ্য প্রাণীগুলোর কল্পনায় তিনি জাজ্জ্বল্যমান এবং তাঁরই প্রতিভূ ম্যানেজার। লোকের ধারণায় বুদ্ধিবৃত্তি যত নিম্নস্তরেই হোক, যেহেতু এরাও বুঝতে পারে একে খুশি না রাখলে উনুনে হাঁড়ি চড়বে না, অথবা চাকরি হারিয়ে পথের কুকুর বনে যেতে হবে তাই বাপ-পিতামহে'র ঐতিহ্যের সঙ্গে তারা মেনে নিয়েছে আরো কতকগুলো অলিখিত কানুন। কোনো ঘটনা ঘটলে গুঞ্জন ওঠে শুধু তারপর সব খায়ের। তারা জানে, প্রভু যদি ইচ্ছাকরেন তাকে ভেট না দিয়ে উপায় নেই; কিন্তু তার সম্মান রক্ষা করাও তাদেরই দায়িত্ব। সেজন্য রাতের বেলাটাই নাকি আদান-প্রদানের প্রশস্ত সময়। টিলাবাবুরা তো আসলে গুপ্তচর, আর দালাল দুই-ই।

আবিদ উঠলো, আলো জ্বালিযে বাথরুমে গেল। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে সঙ্গে সঙ্গে শুলো না আবিদ। কোণের আলমারী খুলে একটি বোতল বার করলো, তাজা স্কচ্ হুইস্কি। গেলাস টেনে নিল একটি তারপর সেই গেলাসে হুইস্কি ঢেলে এক চুমুকে খেয়ে ফেললো। মুখ তুলে চেয়ে দেখে মশারীর দিকে, ও ঘুমিয়ে আছে; তবু বোতল আর গেলাসটা রেখে দিল যথাস্থানে এবং এর পরেও বিছানায় এল না আদি। প্রসবের পরে বৌয়ের গতর কাঁচা সেজন্যই কি? হয়তো না, এমনি। বাতিটা অফ করে দিল, তারপর বেতের চেয়ারে বসে সিগারেট জ্বালিয়ে টানতে লাগল। অন্ধকারে সিগারেটের মুখটা শুধু জ্বলন্ত।

সকল দরোজা-জানালা বন্ধ, তবু ওপরের খড়খড়ির ফাঁকে দূর থেকে তখনো ভেসে আসছে ঢোলডগরের ক্ষীণ শব্দ এবং এদিকেও নির্ঘুম ওদের ভাগ্যবিধাতা; এ দু'য়ের মাঝখানে রাহেলা যেন, এইক্ষণে ভাবলো রাহেলা, বেমানান— এক আতিশয্য। বিয়ে করেছে বলে আবিদ কি অনুতপ্ত? বিয়ের আগের বাঁধনহারা মত্ত দিনরাত্রির আমন্ত্রণ কি সে এখনো পায় মনের গোপন তলায়? কিন্তু বিয়ে তো নিজে যেচেই করেছিল, পশ্চিমবঙ্গ থেকে

ট্রেনে আসার পথে ামান্য পরিচয়ের সূত্রটাকে দশ বছর পরে খুঁজে নিয়েও সেকি কাকুতি-মিনতি! সে কি ছিল নেহাৎ স্বাদ বদলের আয়োজন? অথবা একটানা বেলেল্লাপনায় ক্লান্ত হয়ে পড়া প্রাণের নিরাপদ আশ্রয় সন্ধান? আর, যদি তা হয়েও থাকে এত অল্প সময়ের মধ্যেই সকল রকম আকর্ষণের শেষ?

পছন্দ করুক আর নাই করুক, এখন, সেই একমাত্র ভরসা। বিপদে ভাইয়ার ওখানে গিয়ে ওঠার প্রশ্নও অবান্তর। সংসার গুছাতে ব্যস্ত ভাবীর যা স্নেহময় মূর্তি!

পাশ ফিরতে ফিরতে ভাবলো, উঠে গিয়ে তাকে টেনে তোলে বিছানায় তারপর আদর করে। ভাবলো, হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙেছে এমনি অভিনয় করে বলুক, একি। তুমি কোথায়?

এই যে এখানে আমি রুহি।

ওগো তুমি ঘুমাচ্ছ না কেন?

এই এমনি, কেন জানি ঘুম আসছে না।

না, মিথ্যে কথা। আমাকে বুঝি ভালো লাগে না আর?

দুর পাগলি!

কিন্তু কিছু বললো না রাহেলা, পাশ ফিরে বালিশের একধারে কাত হয়ে রইরৈা।

পোড়া সিগারেটের অংশটা স্যান্ডের তলায় পিষে আবিদ উঠে এলো, বেড়ালের মতো, নিঃশব্দে; কম্বলের প্রান্তটা গায়ে টেনে নেয়ার অল্পক্ষণের মধ্যেই নাক ডাকাতে শুরু করল। মদ তাহলে, শুধু নেশা নয় ঘুমেরও ওষুধ? উঠে গিয়ে গিলে ফেলবে কি এক ঢোক? খেলে মন্দ হত না; শরীরের পরতে পরতে সেই রস বিন্দু বিন্দু হয়ে ঢুকে হয়তো অল্পক্ষণের মধ্যেই আচ্ছন্ন করে দিত ওর চেনাকেও। কিন্তু না, না মনে মনে উচ্চারণ কররো, আল্লাহ—

কিন্তু ঘুম যে চোখের পাতার কাছেও আসছে না। সামনেটা পুরা কাচের বেড়া, ভিতরে পুর সবুজ পর্দা টায়িে দেওয়া, এবং তা ওরই দিকে, সেটা একটু ফাঁক কে রবাইরে তাকাল। এক বিন্দু আলো নেই কোথায়ও, শুধু দিগন্তের কোল ঘেঁষে কয়েকটি তারা, ওরা কাঁপে, মিটিমিটি করে হাসে হয়তোবা, নাকি নিবিড় নীলের বাঁধন ছাড়িয়ে ওই কালো অরণ্যশীর্ষে ঝরে পড়তে চায় ঝাঁকে ঝাঁকে সোনালি-পাখা অচেনা পাখির মতো? আর যেখানে পড়বে, সেটা তো অরণ্য নয়, পাহাড়ের ধার ঘেঁষে ঝুঁকে থাকা মজুরবস্তি। অন্ধকারে মুছে গিয়েছিল, বাঙলোর উঁচু আঙ্গিনাটা তার সমান্তরাল, সেই অন্ধকার যেন আন্দোলিত রূপ নেয় একটি ঋজু নারী মূর্তিতে, না মেয়েটি এলোচুলে নিচ থেকে হেঁটে উঠে এসেছে ওপরে, ইতস্তত করছে নিষ্প্রদীপ বাড়িটার দিকে চেয়ে; তারপর এক পা দু'পা করে এগিয়ে টাববারান্দায় উঠল। রাতের অভিসার, নিশ্চয় টোকা দেবে দরজায়। পর্দাটা ছেড়ে দিলে মুছে যায় বাইরের ছবি, ও উৎকর্ণ চুপচাপ। কিন্তু কই, অনেকক্ষণ কেটে গেল। টু শব্দটি নেই। কেবল নিজেরই বুকের দুরু দরুরু। পর্দাটা আবার উঠিয়ে খোঁজে সেই অবয়ব, যাকে জানে কালি ছাড়া কেউ নয়। হঠাৎ রোখ চেপে যায়। শাড়িটা টেনে নিয়ে বিছানা থেকে এঠ পড়লো তারপর সেটা তাড়াতাড়ি কোমরে পেঁচিয়ে দ্রুত পদে চলে যায় ঘরের কোণায়, সেখানে দেয়ালের ধার থেকে দু'নালী বন্দুকটা হাতে নিতে নতুন শক্তিতে তির্যক হয়ে ওঠে; কৈশোরের পর এ সত্যিই যেন এক নব রূপান্তর, এতকাল পায়নি যার স্বাদ। তারই আমেজে দেরাজ থেকে বোতল খুলে নিয়ে ঢক্‌ঢক্ করে গলায় ঢালে লাল পানীয়। দরজায় টুকটুক শব্দ। ছিটকিনিটা খুলে বেরিয়ে গিল। এই তো হারামজাদী, কালীই তো। ঢং মত, পরনে সুন্দর শাড়ি, কণ্ঠে নাগেশ্বরের মালা এবং হাতে মাধবীর গুচ্ছ। ফিকফিক হাসছে, যেন বিজয়িনী।

গর্‌গর্‌ শব্দ ক'রে আবিদ পাশ ফিরলে রাহেলার ঘুম ভেঙে যায়, তাহলে সবটাই স্বপ্ন! কি অদ্ভুত, বুকের ভিতরটা ঢিপ্‌ঢিপ্‌ কছে এখনো। স্বপ্ন, স্বপ্ন নয়, যেন সত্য।

আর একদিন চোখের সামনে যা দেখলো তা প্রকৃতই সত্র, অথচ তাকে মনে হল যেন স্বপ্ন। সত্যই স্বপ্ন।

বাঙলোর কাছাকাছি কয়েকটি টিলা তদারক করে সাড়ে তিনটার দিকে ফিরছিল আবিদ। প্রায এক যুগ ধরে হান্টার ব্যবহার না করলেও সেটা বারান্দার দেওয়ালের নির্দিষ্ট জায়গাতেই থাকে; কিন্তু খালি হাতে তো যাওয়া যায় না, সেজন্য রুপো দিয়ে বাঁধানো একটি বেতের ছড়ি সঙ্গে নেওয়া অভ্যাস। হ্যাট আর ছড়িটা টেবিলে রেখে জুতা খুললো, এরপর হাত মুখ ধুতে গেল। এমন সময়ে ভরা দেহটা হেলিয়ে দুলিয়ে ঘরে ঢুকলো কে? কালী, কোনো জিজ্ঞাসা নয, অনুমতি চাওযা নয়— তাজ্জব। ঠোঁটে হাসি নেই, চোখ ভার ভার এবং তাতে কেমন একটা স্থির চাউনি, একটা বেপরোয়া সংকল্পে যেন ছাযা। কে দেখামাত্র শির্‌শির্‌ করে একঝলক রক্ত ভিতর থেকে উঠে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়লো। আর এক ঝলক মগজের সর্বত্র— পাশ কুঠরিতে রাহেলা, ব্যাপারটা যাচাই করবার জন্য চলে যায় দরজার আড়ালেদ এযে অবিশ্বাস্য, যেন কিছুটা ভৌতিক।

একি? কালী! তুই। এখানে! কাছাকাছি গৃহিণী ও গৃহভৃত্যরা আছে বলেই যেন পরপর একটি একটি শব্দে এই উৎকট জিজ্ঞাসা।

কালী কিঞ্চিৎ বিরক্ত, কিন্তু তৈরী হয়েই এসেছে, সুন্দর গ্রীবাটা একটু দুলিযে বলল, সায়েব তুই মুকে নিবিনে?

কি কয় পাগলী! আবিদ বিকারগ্রস্তের মত ডাকল, রুহি! শোনো, দেখে যাও। তোমার সেই পাগলীটা এসেছে— হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ!

তুই সাচ জানিস সায়েব আমি পাগলী নই। তুই মুকে প্যার করেছিলি মনে নেই সায়েব?

হোঃ হোঃ হোঃ! রাহেলা বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়েছিল, তার দিকে চেয়ে আবিদ হাসতে লাগল, হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ!

হাসছিস কেনে সায়েব!

দেখলে রুহি! আমি বলিনি! একদম মাথা খারাপ! বলল আবিদ, কিন্তু পরক্ষণেই আত্মস্থ, নিমেষে কঠিন ও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে চেহারা ওর, হাঁকলো, ঘনশ্যাম! ঘনশ্যাম! এসকো বাহার নেকাল দো।

ঘনশ্যাম ম্যানেজারের তাঁবেদারিতে নিযুক্ত ষোলো গোলামের এক জন। দীর্ঘাকৃতি সরল আদমী, শক্তি রাখে প্রচুর। রাত্রে সাহেবের খাটের কাছে থাকে অ্যালসেসিয়ান জর্জ আর বারান্দার একধারে চাটাইয়ের ওপর কম্বল পেতে, ঘনশ্যাম। দুটিই বেজায় প্রভুভক্ত। ঘনশ্যাম কালীর হাতে ধরলে সে ওর হাত কামড়ে দিলে। তারপর নিজেই বাইরে চলে আসে। যেন বিস্রস্ত বেদনার্ত যুবতী মাতঙ্গিনী।

কেন জানি রাহেলার পা'জোড়া কাঁপতে থাকে; কৈশোরের ও যৌবনের দু'টি রাতের সঙ্গে এর মিল। কৈশোরে, যখন সালুয়ার কামিজ পরে, তখন একরাত্রে খুব তুফান এসেছিল। বাড়ির পাশের বিরাট গাছের ডালাপালাগুলো একেকবার সর্‌সর্‌ শব্দে ভেঙে বেঙে পড়ছে, মনে আছে ঘনঘোর অন্ধকার— ওরা ভাইবোনেরা মিলে দাদী আম্মাকে জড়িয়ে ধরে সে কি কাঁপুনি। সেদিন শুক্রবার এবং দাদা বলতেন শুক্রবারই হবে নাকি কেয়ামত, সেজন্য ভিতরে-ভিতরে ভয় করছিল, আজকেই না দুনিয়া গয়রত হয়ে যায়। তাহলে কাল সকারে

ঘুম থেকে উঠে আর সূর্যের আলো দেখবে না, এবং গভীর গহীন জুলমতের মধ্যে কোথায় হারিয়ে যাবে জানবে না কেউ্যারো একরাত্রে, যখন শুনেছিল, পাশের এলাকা থেকে গুন্ডারা এসে তাদের বাড়ি আক্রমণ করতে পারে; কত গল্প শুনেছে পেটে ছুরি চালিয়ে দেয়, দলবেঁধে মেয়েদের ইজ্জত মারে, শরীর থেকে কেটে কেটে নেয় মাংসখন্ড। দাঙ্গার সময় সবই সম্ভব। সে-রাতে দেশকর্মী নির্মলবাবুর বাসায় গিয়ে রক্ষে।

আজকের আতঙ্কটাও যেন সেই, মজ্জার ভিতরে লুকিয়েছিল, সহসা এমন তীরের মতো বেরিয়ে এসেছে।

আবিদের চেহারা আরো বিকৃত। আশেপাশে যারা ছিল তারা সকলেই দ্রুত বারান্দায় এসে দাঁড়াল এবং সম্মুখে চাইতেই সবার চক্ষুস্থির; কালো কালো সারবদ্ধ কুলির দল টিলার ধার থেকে সূর্যমুখীর কেয়ারী পর্যন্ত, সামনে মেয়ে ও পিছনে মরদরা, নির্বাক, এদিকে তাকিয়ে আছে! কালীর সঙ্গে মিছিল করে এসেছে ওরা? মতলব?

ভুরু কুঁচকে কঠিন দৃষ্টিতে আবিদ দেখলে, তাদের, তারপর তির্যক স্বরে চেঁচিয়ে উঠল— হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট? হোয়াট?

চিৎকারটা কুলিদের গায়ে ঝাপটা দিয়ে পাহাড়ের দিকে ছুটে গেল। কিন্তু ওরা নীরব, নির্বিকার তেমনিভাবে চেয়ে থাকে।

কয়েক মুহূর্ত থমথমে ভাব, তারপর আবার সওয়াল, তোমরা কি চাও? কি চাও তোমরা?

কালী পিছন থেকে সামনে এসে জোরে জোরে বলল, তুই যে বলেছিলি, মুকে লিবি না সায়েব?

শাট্ আপ্। আবার চিৎকার, কাঁধ নাড়লো আবিদ, চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, হু বুঝতে পেরেছি! ষড়যন্ত্র। কিন্তু তোমরা আমাকে চিনতে ভুল করেছ। আমি জানি, হ্যাঁ আমি জানি তোমাদের মতো জানোয়ারদের কেমন করে শায়েস্তা করতে হয়! ঘনশ্যা— মা!

জি স্যার!

মেরা হান্টার!

দেয়ালের হুক থেকে তড়িৎগতিতে হান্টারটা এনে ঘনশ্যাম সাহেবের হাতে দিল। একটা গুঞ্জন জাগে, কিন্তু স্পষ্ট নয়। তার সামনে থেকে নড়তে পারে না কালী, যেন অদৃশ্য শিকলে বাঁধা পড়েছে। সে সঙ্কুচিত, বিব্রত।

ডান হাতে হান্টার খুলে ধরে আবিদ জ্বলন্ত চোখে চাইলো, দাঁত কিড়মিড় করে বলল, তোর বদমাইশি বার করবো!

কালী নড়লো না একটুও, বরং বুনো বেড়ালীর মতো ফুঁসে উঠল। তারপর খিলখিল করে হাসতে থাকে। হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলল, মুকে কেনে মারবি সায়েব? মোর পেটে তোর লেড়কা আছে, সে কুলি হইব তাকে মারিস্।

সঙ্গে সঙ্গে একটা তীব্র শব্দ এবং চিৎকার। না, চিৎকার নয়, কালী উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠে সরে গেল, চাবুকের বাড়ি পড়ে বারান্দায়।

তোর লেড়কা কুলি হইব, তাকে মারিস্ সায়েব, হি হি হি হি—!

হান্টার মুঠোয় চেপে ধরে আবিদ বুঝি দৌড়ে যায়, কিন্তু সামনে দাঁড়ানো সারবদ্ধ কুলির দল, তেমনি নিস্পন্দ। ওদের দিকে চেয়ে সে কাঁপতে থাকে।

কিন্তু রাহেলা আর কাঁপছিলো না; উচ্চহাস্যের বিদ্রূপ ছুঁড়ে দিয়ে মেয়েটা মুখ ফেরালে। কালোমেঘে যেন হাওয়ার ঠেলা লাগে, কুলিরা চলতে শুরু করলো; যা দেখবার তারা

দেখেছে, যা বোঝবার বুঝেছে, এবং তাই যথেষ্ট। সেজন্য যেন নীরবতাই তাদের ভাষা। তারা চলতে শুরু করলো, চলতে চলতে ঢালুতে গিয়ে পড়লো, এবং এর পরে রাস্তায়; রাস্তা দিয়ে চলছে পা'য়-পা'য়, মৌন মিছিলএস চেয়ে দেখছিল তারা চোখের আড়ালে চলে গেল।

তারপর কাছাকাছি ওরা দুইজন।

হান্টারটা রাখতে রাখতে সে বিড়্‌বিড়্‌ করে কি বলছে যেন, দুটিকে ছাঁটাই করার দরুন এই শয়তানী, হয়তো এমনি কিছু; কিন্তু রাহেলার দৃষ্টি নিচ থেকে ক্রমে ওপরে উঠে গেল। সূর্য অস্ত গেছে কিছুক্ষণ, পাহাড়ের ওপরে এখন তার রঙের প্রলেপ, কিচিরমিচির করে উড়ে গেলো একঝাঁক পাখি, হয়তো বনের গভীর তাদের বাসার দিকে। এ একটা সময়, নির্দিষ্ট সময়, ঘড়ির কাঁটার ঘন্টা বাজার মতো; কাছে লোকালয় নেই তাই এই সময়টিকে মিনারে দাঁড়িয়ে প্রাণের প্রার্থনায় ঘিরে রাখার নেই আয়োজন, তবু যেন বাতাসের স্তরে সূক্ষ্মরেখার মতো সেই ডাক শুনতে পেল। শুনতে পেল, কিন্তু নড়লো না; হাতমুখ ধুয়ে পবিত্র হবার জন্য ব্যস্তভাবে উঠে গেল না এবং ঘরে বাতি জ্বললেও, বারান্দায়ই বসে রইল। মাঝখানে বেতের টেবিলটা, দুজনে কখনও মুখোমুখি বসেছে তারা জানে না। আধো অন্ধকারে দুজন যেন দুটি অচেনা মানুষ। বয় এসে বলল, মেমসাব! চা রেডি।

আবিদ বলল, চা লাগবে না, যা।

ড্রিঙ্ক—! রাহেলা ভিতর থেকে উঠে বলল, ড্রিঙ্ক নিয়ে আয়।

বয় যেন বিশ্বাস করতে পারছে না তাই একটু থামলো, একটু পরে ভিতরে গেল হুকুম তামিল করবার জন্যে।

প্রথম গেলাসটা আবিদই ঢাললো, হুইস্কি আর সোডা ওয়াটার ফিফ্‌টিফিফ্‌টি। এক চুমুক খেয়ে টেবিলে রাখল পাত্রটা।

আরেকটা গেলাস টেনে নিয়ে তাতে ছক্‌ছক্‌ করে মদ ঢালে রাহেলা, এবং আবিদ কিছু বলবার আগেই, গেলাসটা হুইস্কি সোডায় কানায় কানায় ভরলে, এক চুমুকে খেয়ে ফেললে তার এক-চতুর্থাংশ।

এ কি রুহি?

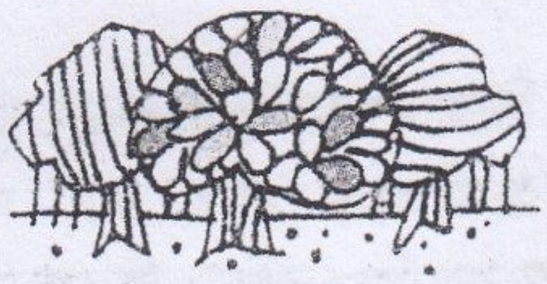
রাহেলা হেসে উঠল, বলল, কি আবার, দেখছো না?

এই প্রথম, এতটা সইতে পারবে কেন?

নিশ্চয় পারবো। এই দ্যাখো না— আবার গেলাস মুখে তুলতে গেলে আবিদ ওর হাত থেকে কেড়ে নেয় গেলাস, রাহেলা তখন বলতে থাকে, আহা কি মধু-র! দাও না লক্ষ্মীটি! আরেকটু দাও! কি দেবে না? বেশ— আমি তা'হলে ঐ-ঐদিকে চেয়ে থাকবো। হি হি হি।

রাহেলা চেয়ার ঘুরিয়ে বসে সামনের দিকে চায়। যে মিছিলটাকে সে কিছুক্ষণ আগে হারিয়ে ফেলেছিল তা চলতে চলতে এতক্ষণে ওই পাহাড়ের ওপর গিয়ে উঠেছে। আসলে বুঝতে পারেনি ওটা মিছিল নয়, নিচের বস্তিতে যে আগুন তারই কালো ধোঁয়া, রাতের আকাশে স্তরে স্তরে জমছে মেঘের মতো। এরপর দেখে তার সামনে পিছনে চতুর্দিকে শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া— কালির মতো কালো ধোঁয়ার কুন্ডলীর মধ্যে সে হারিয়ে যাচ্ছে।

ডিসেম্বর, ১৯৬২।



বাঘিনী

সবাই বুনো ঘুমের কুহকে, কিন্তু একজন জেগে থাকে; অন্ধকারে আগুনের মতো জ্বলে তার আরক্ত চোখজোড়া, ঘৃণার নিষ্ঠুর ছোবলে হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত। চকচকে ধারালো রামদার বাট্‌টা হাতের কাছেই, মনে হয় এক্ষুণি উঠে অভ্রান্ত পদক্ষেপে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে লোকটার বাড়ি খুঁজে বার করে, তারপর জানালা কেটে ঘরে ঢুকে নিজের বিছানার ওপরেই জবাই করে ফেলে তাকে। এত বড় দুঃসাহস?

সে ঘুমায় না; ঘুমুতে পারে না।

কারণ, একদিন—

একবার কি দু'বার, একটি প্রকান্ড উত্তাল উদ্‌গত শব্দ যেন কোনো গহ্বর থেকে জেগে উঠে ভেঙে পড়ল; একবার কি দু'বার, তারপর সেই শব্দের নিরাবয়ব শরীর নিশ্চল হাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে জাগ্রত হয়ে থাকে কম্পমান ছায়ার মতো। বেশ কিছুটা দূরে লোকালয়, এবং শহর আরো দূরে, যদিও গাছগাছড়া ও গ্রামের আড়ালে হারিয়ে যাওয়া তামাবিলের রাস্তা কাছাকাছি। কখনো কখনো অধিক রাত্রেও বাস চলাচলেও আওয়াজ; কিন্তু তাও সেই শব্দের অদৃশ্য প্রকারে বিলুপ্ত হতে দেরি লাগে না। তখন থাকে শুধু ভয়, একটা নিবিড় আতঙ্ক। এবং তা কাঁপতে কাঁপতে সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ সুচের মতো লোমকূপের সীমানা ছাড়িয়ে ধমনী শিরা রক্তবাহী নালী বেয়ে গিয়ে হৃৎপিন্ডের ভিতরে সঞ্চরমান।

ল, পালাই, আপন বাঁচলে বাপের নাম, ওদের ভিতরে আলাপচারী, বাঘের খাবায় জান দেয়ার চাইতে না খেয়ে থাকাও ভালো।

কিন্তু সাঙাৎ যে কাপুরুষ ভাববে এবং বলবে মাগী, এটাও কাম্য নয়, কাজেই পরস্পর চোখ চাওয়া-চাওয়ি; শিরায় বইতে থাকা লোও কখনও ঠান্ডা হতে শুরু করে নিজেরাও জানে না। বসে বসে তামাকে টানতে টানতে, হুঁকোর গুড়গুড়ও যেন ভরসা, নিজেদের শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতিধ্বনি গোনে তারা এক দুই তিন চার পাঁচ, এক দুই তিন, এক দুই, দুইদুইদুই।

কিন্তু তাজ্জব, তৃতীয় রাত্রেই গর্জন থেমে গেল, একদম চুপ, যেন এই এলাকা থেকেই উধাও। মিঞা বললে যায়নি তো বটে বরং এসেছে আরো কাছে ওই দক্ষিণের টিলায়, এবং নিশুতি রাতে চালার পিছনে দাঁড়িয়ে শুঁকে গেছে বাচ্চার গায়ের গন্ধ।

কথাটা হয়তো ফালতু নয়, বাচ্চার হদিশ মিলেছে অতএব মেজাজ পড়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু তবু বনের ওপরে পাহাড়ের ওধারে অদৃশ্য নীলতারাটির মতোই যে তার নিয়মিত অভ্রান্ত হাজিরা তাতেও সন্দেহ নেই। টিলার ওপর থেকে পাদদেশ তক নেমে গেছে জঙ্গল, তার নিচেই খোলা জায়গা বুঝিবা প্রান্তর, বাঁশের তৈরি, কামলাদের ছাপরাটি বেশি দূরে নয়: সন্ধ্যা হলেই— যদিও বাইরে শুকনো গাছের গুঁড়ি ও ডালপালার স্তূপে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে, এবং তা জ্বলে সারারাত, তবু সন্ধ্যা হলেই চুপচাপ ঘরের ভিতরে গিয়ে বসে ওরা: মোটাভাত, লম্বাডাল আর বড়জোর লাটামাছের ঝোল, কুপির ছায়াঘেরা লালচে আলোর কাচে বসে সান সাজিয়ে বানানো চুলোয় মাটির পাতিলে রান্না করে তিনজন— বাদবাকি সাতজন গল্পগুজব করে।

গল্পগুজব করে কিন্তু একটি কান বাইরের নীরবতার দিকে তীরের মতো সজাগ। নীরবতা নিস্তরঙ্গ অন্তঃস্রোত যেন, একটু হাওয়া বাঁশপাতার মৃদু সর্‌সর্ কি দূরের ধ্বনি তার

মধ্যে আলোড়ন জাগাতে পারে না; বরং অন্ধকারের দেয়াল দিয়ে ঘেরা জনপদের বাইরে অরণ্যের কাছাকাছি জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে প্রাচীন প্রাসাদের মতো।

সে আসে; এরই মধ্যে সে আসে দিনের আলো শেস হয়ে যাওয়ার পর গুটিগুটি পায়ে যখন একটি শুকনো পাতাও নড়ে না; অথচ চালার ভিতর থেকে ওরা বুঝতে পারে সে এসেছে : বাঘের বাচ্চার মা বাঘিনী।

জঙ্গল কাটা হচ্ছে, এবং কাছাকাছি মানুষের আনাগোনা আছে বলে রাত শেষ হতে থাকার সময়ে সারাদিনের জন্য চলে যায় দূরে, দুর্গম টিলার অপেক্ষাকৃত নিরাপদ আশ্রয়ে : ক্ষুন্নিবৃত্তির ইচ্ছাও যেন নেই এমনি অবসন্ন ক্লান্ত, ঝোপের আড়ালে বসে থাবা চাটে আর প্রতীক্ষা করে রাত্রির। পাহাড়ের পিছন ছেয়ে রাত নেমে এলে গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে, চায় এদিক-ওদিক, তারপর হাঁটতে থাকে : লক্ষ্য এক এবং অভ্রান্ত। কোনো গাছ থেকে পাখির ওড়া আর কোথাও কিচিরমিচির, ওরা উপলব্ধি করে অনেক দূর দিয়ে তাদের লম্বা চালাটি চক্কর দিয়ে নিল; শেষতক আঁধার আরো খানিকটা ঘন হয়ে এলে আগুনের আভা যদ্দূর গিয়ে পড়েছে তার কিনারায় এসে দাঁড়ায়। আলো ঠিকরানো কাচের মতো চোখজোড়া জ্বলজ্বল।

এই যে চিত্র বাইরেও কিছু অনুভব করে একজন, আর সেজন্য বাদবাকি কয়েকজনের ভয় ও বিস্ময়। ভয় এজন্য যে এটা নেহাৎ আগুন নিয়ে খেলা, আর বিস্ময় অস্বাভাবিকতার মাত্রায়। হোক না বাগিনী, হয়তোবা বুড়িও তবু যখন-তখন একা-একা যেভাবে বাইরে যায় তাতে ঘাড়ের ওপরে লাফিয়ে পড়ে এক থাবড়ায় ওর কলজেটা বার করে ফেললে তাজ্জবের কিছু নেই; বিমেষতসন্তানের জন্য এখন দেওয়ানা, বেচইন। জবরদস্ত জোয়ান হলেই কোন কিছু গেরাহ্যি না-করা বোকামি। মরবে ঘোড়া মাটি কামড়ায় একথা ওরা বলতে চায় না, কিন্তু এটা তো ঠিক যে অহঙ্কার পতনের মূল?

মিঞা জিনিশটা বুঝে না এমন নয়। কিন্তু গোড়া থেকে কেমন একটা নেশায় ওকে পেয়ে বসেছে। কেমন একটা উত্তেজনা। হঠাৎ মণিমাণিক্য পেয়ে গেলেও বুঝি লোকে অমন অধীর হয় না। সেদিন সক্কাল বেলায় উজ্জ্বল রৌদ্রের নিচে একটা টিলার ঝোপঝাড় কেটে সাফ করতে গিয়ে শোনে উদ্ভট শব্দ, গর্‌গর্‌গর্‌, পট্‌পট্‌। ওরা আগেই শুনেছিল তিনমণি সাপের গল্প, কাজেই কি জন্তু দেখবার আগেই চিৎকার করে লাপিয়ে নিচে চলে আসে কয়েকজন, কিন্তু মিঞার পড়ল অন্য ধাতুর। যেখানে ভয় সেখানেই অভ্যুদয়। একলা ঝোপ কাটতে কাটতে আবিষ্কার করলো বাঘের আস্তানা। একজোড়া বাঘের বাচ্চা পয়লা পাঠের শিক্ষাকে মনে রেখেই যেন ওঁৎ পেতে চেয়ে দেখছে, মিট্‌মিট্‌, আর একটা তো শিকারের ওপরে লাফিয়ে পড়বার জন্য রোখই নিল। রুদ্ধনিঃশ্বাসে তাকিয়ে আছে সঙ্গীরা কিন্তু ও কোনো উত্তেজনা প্রকাম করলো না; নিচের দিকে ঝুঁকে প্রথমে দুই পা ও দুই হাতে ওদের আটকা। তারপর দুটিকে দুই বগলে চেপে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

কিরে, এগুলান কি? দূর থেকে সওয়াল ছুঁড়ে মারে সাঙাতরা, যদিও আকৃতি দেখে কেউ-কেউ ঠিকই আন্দাজ করলো বাঘের বাচ্চা।

মঞ্জিার দৃষ্টি নিমেষে উজ্জ্বল, সে মুখ তুলে গর্বের সঙ্গে বলল, বাঘের বাচ্চা।

বাঘের বাচ্চা! বাপরে বাপ, বাচ্চা যেহানে আছে সেথায় বাপমাও আছে নিশ্চয়।

থুৎনিতে ছাগলদাড়ি, অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ও জ্ঞানী তোরাব বলল, বাঘের বাচ্চা নিজেও বাঘ।

বাঘের বাচ্চা নিজেও বাঘ কথাটা থেকে শেষতক শুধু বাঘ রইল, এবং ওদের সত্তায় তা কাঁপতে থাকে একটি বেদনাসম্ভব অনুভূতির মতো। বয়স্ক ও অপেক্ষাকৃত জ্ঞানী তোরাবের

আন্দাজ দিনে দিনে আকার নিতে থাকে : বাঘিনী, বাচ্চা, এই প্রমাণ করে বাঘিনীর একজন বাঘ ছিল এবং বাঘিনীর আকৃতি আরো জানিয়ে দেয় তার বাঘ ছিল মাঝবয়েসী। মাঝবয়েসী, যখন যৌবন চলে যায়, কিন্তু যৌবনের স্মৃতি ও উন্মাদনা তখনো প্রখর, ফলে যৌবনের মতো ব্যবহার করাই এই সময়কার ধর্ম, এবং কখনো বা ক্ষতিপূরণের অব্যক্ত বাসনায় যৌবনকেও টেক্কা দিতে অভিলাষী।

বাঘ ছিল এখন বাঘ নেই, তার মানে বাঘ হয় হঠাৎ কোন কঠিন বিমারে পড়ে মরেছে, নয়তো— হয়তো এ-অনুমানই ঠিক, বাঘ কিছুটা কমজোর হয়ে পড়ায় সহজলভ্য শিকারের জন্য পল্লীগ্রাম পর্যন্ত চলে যেত ছোট্ট খালটি সাঁতরে পার হয়ে, রাতের বেলায়। কিন্তু কয়েক রাত পর-পর তার রক্তাক্ত কীর্তি তো চাপা থাবার কথা নয়— বিশেষত মানুষ চালাক জীব।

হয় মানুষে মেরেছে, নয় হারিয়ে গেছে দু'ক্ষেত্রে একই সত্যি, তা বিচ্ছেদ। বাঘ যখন থেকেই নেই, বাঘিনী তখন থেকে একা।

যখন থেকে বাঘ নেই তখন থেকে একা বাঘিনীর এ কি দশা! বাঘের বাচ্চা ধরবার পরে মিঞা বারবার এই শুধু ভেবেছে, বাঘিনী বাচ্চা পেটে নিয়ে বনে-জঙ্গলে অঞ্চলে অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছে বাঘের জন্য। শেষ পর্যন্ত এই সীমান্ত এলাকায় এসে বাচ্চা বিইয়েছে। হায়রে কপাল!

সাঙাতরা মানা করা সত্ত্বেও প্রথম রাত থেকেই বাচ্চা দুটোকে অন্য কোথাও রাখতে পারেনি, নিজের বিছানার পাশে খুঁটিতে বেঁধে শুয়েছে মিঞা, এবং মাঝে মাঝে হাত বাড়িয়ে দিয়ে আদর করেছে, বাঘিনী ঘরের পিছনে এসেছে টের পেলে উঠে বসে ওদের আগলে থেকেছে।

আগলে থেকেছে, কিন্তু প্রহরীর মতো নয় আত্মীয়ের মতো, যেন বা পিতাই; ওরাও কেমন করে জেনেছে এই আদমিটা সম্পূর্ণ শত্রু নয়, তাই নখর দাঁত কিঞ্চিত কাজের হয়ে উঠলেও তাকে জখম করে না, শুধু সামান্য পীড়নে অধিকার আদায় করতে চায়, মুক্তির অধিকার।

হুঁ, মইরা গ্যাছে, ঠোঁটের ভিতরে স্বপ্নাবিষ্টের মতো বিড়বিড় করে মিঞা, বাঘ মরছে নির্ঘাৎ।

যে কমজোর হেই মরে। এমন আঁধারেও স্পষ্ট, জীবন্ত একজন, তেল না দেওয়া উসকো চুল বিবর্ণ চেহারা তবু গড়ন, ময়না একদম সামনে দাঁড়িয়েই বলছে আবার, আমারই নসিব মন্দ।

কি কইলে? অজগরের মতো ও ফুঁসে উঠতে পারতা কিন্তু শুধু একটি সওয়াল।

কইয়াম আবার কি নসিব মন্দ না অইলে উপাস তাহি, ছিঁড়া তেনা পিনতাম পাই না? ময়না মেজাজী মেয়ে, সেই তার মেজাজ এখন আরো ধারাল, আরো চোখা, পরে বলে একটু নরম সুরে, নিজের কতা বাদ পোলাপান দুইড্যা সুতার নাল অইয়া গ্যাছে গা।— বৌবাচ্চা পালতে পারে না তার নাম আবার মরদ।

আসলে, পরের কথাটা কখনো বলেনি ময়না, কখনো না; কিন্তু বলতে পারত। এবং হয়তো বলা উচিত ছিল, মিঞা মনে-মনে ভাবে, যে-পুরুষ অক্ষম, নারীর ধিক্কারই তার পুরস্কার। ময়না বলেনি সেই কথা, হয়তো এই ওর অভিমান। কিন্তু মরদ হয়েছে বলে তার একটুও অভিমান থাকবে না তা ঠিক নয়—সেজন্য নরসিংদীর পাটকলে যাওয়ার সুযোগ থাকলেও কামলাদলের সঙ্গে রেলগাড়িতে করে এদিকেই চলে এসেছে, অনেক দূরে। একটু বুঝুক মজাটা। বুঝুক খেতে পা'ক না পা'ক কাছে থাকারও কত দাম।

এসবই ঠিক, কিন্তু ছেলেদুটো : রাজু আর মাজুকে সে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারে না ; ওদের কান্না যেন শুনতে পায়, কান্না।

বাঘ মরেছে, বাঘের জন্য দরদ লাগে কিন্তু তাকেও আচ্ছন্ন করে জাগে এক অপূর্ব মায়া ; খামচা কামড় খেয়েও বাঘের বাচ্চাকে জড়িয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করে, আর কখনোবা ঘুমিয়ে পড়ে কিছুক্ষণের জন্য। শিয়রের কাছে বাঘিনীর অস্থির হাজিরা, কিন্তু থোড়াই তাকে পরোয়া।

পরদিন দুপুরবেলায় বাচ্চাদের খাওয়াবার জন্য তিন মাইল দূরের বাজার থেকে গোশত কিনে নিয়ে এসে জানতে পারল কন্ট্রাকটর সাহেব এসেছিলেন, এবং সঙ্গীদের নিষেধ অগ্রাহ্য করে একটি বাঘের বাচ্চা নিয়ে গেছেন ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে উপহার দেওয়ার জন্য। খুশি করবেন, এই মতলব। শোনামাত্র এক ঝলক রক্ত তীরের মতো মগজে উঠে গেল, তারপরে চিৎকার করে উঠল, না না! শালারে আমি খুন করুম!

সামনে এগিয়ে এসে হাত ধরে ওকে ঘরের ভিতরে নিয়ে গেল জ্ঞানী তোরাব, বুঝিয়ে বলল, বাঘের বাচ্চা দা কি অইব রে, খুনী জানোয়ার, তাছাড়া কন্‌টাকটার সায়েব কইছেন আমাগোরে কিছু ট্যাহা দিবেন।

রাখ্ তোর ট্যাহা, ইমুন ট্যাহাৎ আমি—পরের কথাটা মুখে এসেছিল কিন্তু উচ্চারণ করেনি মিঞা, শুধু চোখ পাকিয়ে এমনভাবে তাকাল ভয় পেয়ে ঘাড় চুলকাতে থাকে তোরাব।

সারা চেতনায় যেন আগুন ধরে গেছে, এবং তা সহজে নিভবার নয়, শান্ত হবার নয়। এমনি করুণ, এমনি দারুণ। এক টুকরো কাঁচামাংস একলা বাচ্চাটার সামনে ছুঁড়ে দিয়ে কাত হয়ে থাকে তেল-চিটচিটে বালিমটার ওপরে, আস্তে আস্তে বিড়ি টানে। দুপুরে ভাত খেল, কিন্তু আমনা, এবং তারপরেও কাজে ঘেল না। শুয়ে শুয়ে খেলা দেখে বাচ্চাটার। সে যে একলা, এ-বিষয়ে সচেতন। মাঝে মাঝে অদ্ভুত শব্দ করে, যা আগে কখনো শোনা যায়নি। এ-শব্দ যে ভ্রাতৃবিচ্ছেদের তাতে কোন সন্দেহ নেই। শব্দের কত অর্থ আছে, কত রকম চেহারা, একেক অবস্থায় তার একেক আকৃতি ; কাছের বাড়ির সওদাগর সায়েব কিছুক্ষণ পর-পর আজব এক আওয়াজ করেন গলায়, অন্ধকারে অথবা কোথাও আবছায়ায় হঠাৎ শুনলে ভড়কে যাওয়ার কথা। হাঁপানীর রোগী, অথচ বুকের পাটা মন্দ না, এক নির্জন দুপুরে ময়নাকে বলেছিল, মিঞারে ছাড়ান দে ময়না, তোরে আমি রানী বানাইমু।

সত্যি বলেছিল? এমন একটা-কিছু যদি নাই বলবে তবে তার বাড়িতে কাজ করতে যেতে ময়নার কেন অনিচ্ছা।

যখন থেকে বাঘ নেই তখন থেকে একা বাঘিনীর সেকি দশা! বাঘের বাচ্চা ধরবার পরে মিঞা বারবার শুধু এই ভেবেছে, বাঘিনী বাচ্চা পেটে নিয়ে বনে-জঙ্গলে অঞ্চলে অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছে বাঘের জন্য। শেষ পর্যন্ত এই সীমান্ত এলাকায় এসে বাচ্চা বিইয়েছে। হায়রে কপাল....

নেহাৎ ভালো মেয়ে ময়না, নইলে এখনো যে রূপ-যৈবন, সহজে এখনো গিয়ে ভাগ্যবান লোকের ঘর আলো করতে পারে। তওবা, তওবা—নিজের বৌকে নিয়ে কি ভাবছে এসব। হ্যাঁ, দুই সন্তানের জননী হওয়ার পর যেন আরো ফুটেছে শরীর, টিকোলো নাক, উন্নত বক্ষ, পাতলা ঠোঁটজোড়া, সব অঙ্গের বিশ্লেষণ সে জানে না ; এবং একটি উপমাও নয়, যদিও পুঁথিতে পালায় গানে বিচ্ছেদে শুনেছে বহু বর্ণনা। তার উপমা জানে না, কিন্তু এখন একজনের সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েছে। সে বাঘিনী। ময়না কখনো ময়না, কখনো বাঘিনী।

কখনো বাঘিনী, কখনো ময়না।

হেঁ হেঁ হেঁ, তোর ময়না আমার ময়নাপংখি! অন্ধকারে সেই আজব আওয়াজের গলার স্বর, বাঘিনী? হা-হা-হা, অইলেও কাবু কইরা ফালাইছি।

না, না। আবার চিৎকার। কিন্তু শব্দটা হয় গোঙানির মতো, তাতে সাঙাতদের মনোযোগে নাড়া পড়ে না। ধক্‌ধক্ করে জ্বলে ওঠে চোখ জোড়া, লোকটাকে সে কুন করবেই, খুন করবে।

রাত্রে ঘরে অন্ধকার, বাইরে অপার নীরবতা; অনেকক্ষণ খেলতে খেলতে শেষ পর্যন্ত থাবার ওপরে মুখ রেখে শুয়েছে বাচ্চাটা—তার গায়ে আলতোভাবে হাত বুলোতে থাকে মিঞা, যেন জানোয়ারের নয় নধর-কচি মানব সন্তানেরই দেহ। এইভাবে কতক্ষণ কাটে জানে না, এক সময় খচ্‌খচ্ আওয়াজ শিয়রের কাছে, বাঁশের বেড়ায়। বুঝতে পারে বাঘিনী এসেছে, নিঃশব্দে এখানে বাচ্চার গন্ধ পেয়ে হয়েছে উতলা। তার ভিতরে অদ্ভুত এক ভাবনার আচ্ছন্নতা। বাঘিনীর মুখটা কি ময়নার মুখের মতো? চোখজোড়া তেমনি টানাটানা, সুন্দর? নিতম্ব মাজা, তলপেট সব একই রকম? বেড়ার মধ্যে রামদায়ের মুখটা লাগিয়ে টান দিলেই ফাঁক হয়ে যাবে অনেকটা জায়গা, আর তখন বাঘিনী শরীর গলিয়ে আস্তে আস্তে ঢুকতে পারবে ঘরের ভিতরে ; ওরা কয়েকজন, যারা ঘুমুচ্ছে অঘোরে, তারা টেরও পাবে না এতটুকু। বাঘিনী কামড় দেবে না, থাবা ওঁচাবে না, বরং আগলে ধরে যেন করবে আদর।

আমার আরেকটা বাচ্চা কই, আরেকটা বাচ্চা? শুধোতে পারে বাঘিনী মুখের কাছে মুখ নিয়ে, হ্যারে আইন্যা দাও।

দিমু, দিমু। তুই ভাবিস না। রামদায়ের বাটটা শক্ত করে ধরে বলবে মিঞা, পচাগলারে খুন করুম্ আমি, আমার পোলারে নিছে চাকর বানাইতে, সাহস কত।

এরপর এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়লো, দেখে তার বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে আছে বাঘিনী, পরম আশ্রয়ের মতো বিপুল ভরা অফুরন্ত কোল এবং বুকের কাছে বুকের স্পন্দন।

সংশয় সংকোচ বা আকস্মিকতা, ঠিক কি কারণে জানে না সে—ধড়মড় করে উঠে বসল আঁৎকে ওঠার মতো, আর তখন বাঘিনীর মুখে স্মিতহাস্য। এটা বিদঘুটে। তখন তার মুখটা আপনাতেই সামনের দিকে উঁচু হয়ে গেল, ওইদিকে এক মর্মান্তিক দৃশ্য। চালাঘরের একধারে চাটাইয়ের ওপরে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে ময়না, এবং তার পাশে সেই চেনা আদমিটি : গভীর সুখে শায়িত ওরা।

না, না। চকচকে ধারালো দায়ের মুঠিটা শক্ত করে ধরে টান হয়ে দাঁড়াল, বলল, খুন করুম্।

খুন্ করবা? কর তো দেহি। তাজ্জব, ময়নাই উঠে বসে বলল, আমি ইচ্ছা কইরাই তার কাছে গেছি। তুমি তো আমারে উপাস রাহ, কাপড় দিতে পার না।

কথা শোনবার, কথা বলবার সময় নেই—সে তক্ষুণি এগিয়ে গিয়ে দুই হাতে চকচকে ধারালো দা'টা দিয়ে দুইজনের পেট বরাবর আঘাত করর। চার টুকরো হয়ে লাফাতে থাকে ওদের দেহের খণ্ড খণ্ড অংশগুলো, চারদিকে লাল রক্তের পিচকারি। তার চোখে মুখে এসেও ঝাপ্‌টা দেয় সেই উত্তপ্ত, উষ্ণ রক্তধারা।

সূর্যের আলো ঝলকে ঝলকে এসে পড়ছিল মুখের ওপরে, ঘুম ভেঙে যাওয়ার পরেও অনেকক্ষণ স্বপ্নের ঘোর কাটে না। দেখে ঘর খালি। ওরা বাঘের বাচ্চাটাকে নিয়ে বাইরে বেঁধেছে, এবং ধার দিয়ে রাখা চকচকে দা'টাও কাছে নেই। তাহলে এ কি ষড়যন্ত্র? কিছুক্ষণ চুপ থেকে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করে। তারপর আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়াল ; বেড়ার

ফাঁকে দেখা যায় সাথীরা চিড়েগুড়ের নাশতা খেতে ব্যস্ত। কি কথায় এক সঙ্গে ওরা হেসে উঠল হা হা করে।

মিঞা বিব্রত বোধ করে ; তাদের এই হাসি যেন এক পশলা ব্যঙ্গের মতো চারদিক থেকে তাকে বিঁধতে লাগল।

অথচ ওদের তো জানবার কথা নয় যে খোয়াবের ভিতরে সে ময়নাকে অন্য একজনের সঙ্গে শুতে দেখেছে। তবু এটা ঠিক বন্ধুরা অনেক সময় সবজান্তা। বিশেষ, এ তো কেবল খোয়াব নয়, বরং যেন সত্যেরও বাড়া। পচাগলার বাড়িতে নিশ্চয় আবার কাজ নিয়েছে ময়না ; একটা ছবি সে বারবার দেখতে পায়, দিনে রাতে একটু আনমনা হলেই, কাজকর্মের পরে কামরাঙা তলার আধো অন্ধকার পথে ঘরের দিকে যাওয়ার সময় খপ্ করে ওর হাত ধরে ফেলল, বলতে থাকে, লক্খি আমার।

আৎ ছাড়েন, নাইলে চেঁচাইমু।

না, না লক্খি। তোর লাইগ্যা আমি সব ছাড়তে রাজি। সওদাগর সায়েব ওর দুই হাঁটু জড়িয়ে ধরে বলল, তুই আমারে নে, আমারে বাঁচা।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে ময়না, তারপর চিন্তিত হয়ে শুধাল, আইচ্ছা মানুষটা ফিইরা আইলে কি করবেন?

কি আর করমু। মিঞারে খতম করতে শনি-মঙ্গলবার লাগব না।

একটুখানি কাতরে উঠে ময়না ঝাঁপিয়ে পড়ে তার বুকের ওপর, কাঁদতে কাঁদতে বলে, আমি কিছছু জানি না। যা ইচ্ছা তাই করেন আপনে।

উহ্, মাথাটা একবার জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে চিন্তা-কীটের সুড়সুড় প্রবাহকে ঝেড়ে ফেলতে চায় মিঞা, কিন্তু বৃথাই চেষ্টা। জ্বল্জ্বল্ চোখের তারায় ভেসে ওঠে আরো স্পষ্ট চিত্র। বাংলাঘরের একধারে অন্ধকার চিলেকোঠার চৌকির ওপরে তারা দুইজন ; বড় ঘরে বিবি ও ছেলেমেয়েরা, আর অন্যান্য ঘরেও যখন ঘুমিয়েছে সবাই, তখন এখানে মত্ত জাগরণ।

আবার শাণিত কণ্ঠে শব্দ করে উঠলে দৌড়ে এল সাঙাত কয়েকজন, প্রায় একমুখে শুধাল, কি অইছেরে?

কিছু না। ভ্রূকুটি করে মিঞা বলল, আমার দাওডা কেডা নিছে ক। আর বাগের বাচ্চা কই।

সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকে দারুণ ক্রোধে আর উত্তেজনায় ; সাঙাতরা বুঝতে পারল রসিকতার কাল শেষ, এখন নতুনভাবে নতুন করে বুঝতে হবে তাকে, নইলে খুব বিপদ হতে পারে। মিঞা আর মিঞা নেই, হয়েছে অন্য একজন এবং তারাও হয়ে গেছে কয়েকজন।

একদিকে সরে গিয়ে কি পরামর্শ করে ওরা, অনেকক্ষণ আলোচনা করতে করতে গোল হয়ে, ঘন হয়ে বসে। একজনকে খুন করবে বলেছে, তার পক্ষে এখন অসম্ভব নয়, বিশেষত যদি কেউ কাকে খুন করবে বলে ঠিক করে তাহলে তাকে খুন করাটা একান্ত সহজ। আর একজন খুন করলে সকলেই পড়বে ধরা, তারপরে জেল হাজত, ফাঁসি অথবা কালাপানি।

গত সন্ধ্যায় দুইজনে বাজারে গিয়ে কন্ট্রাকটর সাহেবের লোককে জানিয়ে এসেছিল বাঘের বাচ্চা না বলে নিয়ে যাওয়ায় মিঞার গোস্বা হয়েছে, এ-কথা ; এবার আর খবর নয়, কথা নয়, সেই দুইজনের সঙ্গে পাঠালো তোরাবকেও, যে জ্ঞানী এবং ঠাণ্ডামেজাজ।

যখন ফিরে এল তখন প্রায় বিকেল, তোরাবের কোলে বাঘের বাচ্চাটা, তার মুখের ভাব

এমন যে দিগ্বিজয় করে এসেছে। মিঞা কাত হয়ে শুয়েছিল, বাঘের বাচ্চাটাকে তার ভাইয়ের সঙ্গে কাছের খুঁটিতে বেঁধে তিনজনেই কি বলতে থাকে ; কিন্তু কিছুই কানে যায় না ওর ; সে নির্বিকার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তাদের দিকে, এবং একটু ফুর্তিও প্রকাশ করলো না।

একসময়, এক মুহূর্তের জন্য নিজের ভিতর থেকে জেগে উঠে জিগ্‌গেস করল, কি কইলি?

এসডো সায়েব আইতাছেন গাড়িৎ কইরা, বন্দুকনিয়া। দাড়ির কয়টা চুলে টান মেরে তোরাব বলল, বাঘ শিকার করবো, তুই আবার—

মিঞা তক্ষুণি বুঠে বসল এবং সকলকে তাজ্জব বানিয়ে দিয়ে শুকনো মুখে অথচ স্পষ্ট করে বলল, বাঘিনীরে আমি মারুম্।

কথাটার এমন একটা ভাব যেন বাঘিনীকে মারবার অধিকার একমাত্র তারই ; কিন্তু এজন্য নয়, তারা দৃষ্টিবিনিময় করলো কারণ এযে তাদের ধারণার উল্টো। তারা ভেবেছিল শিকারের কথা শুনে সে চিৎকার করে উঠবে এবং তির্যকস্বরে করবে প্রতিবাদ।

আমি মারুম্। মিঞা এবার একজন একজন করে সকলের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে নিয়ে বলল, আমি মারুম্। এসডো সায়েব দেখবেন।

কথাটা বলবার পর যেন ভীষণ ক্লান্ত হয়ে আবার শুয়ে পড়ল মিঞা, সাঙাতরা বুঝলো, এও তার এক খ্যাপামি।

ওর খায়েশ পূর্ণ করতে সাহেবরাও কোনো আপত্তি করবেন না ; চক্‌চকে ধারালো দা'টা হাতে নিয়ে মিঞা এখন সন্তুষ্ট, সুখী শক্তিবান। এক পৈশাচিক, তীক্ষ্ম গভীর আনন্দের উত্তেজনায় পূর্ণ। ক্রমে রাত নেমে আসে, নিঝ্‌ঝুম পাহাড়ী রাত। শুকনো গাছের গুঁড়ি ও ডালপালার আগুনের কুণ্ডলী করেছে, দাউদাউ শিখা ; অনেকটা জায়গা ফর্সা করে তুলেছে। প্রাঙ্গনের মাঝখানে একটা খুঁটিতে বাঁধা বাঘের বাচ্চাদুটো, বাঘিনীকে ধরবার টোপ। বিপরীত দিকে অশ্বত্থ গাছের ডালের ওপরে পাতার ছায়ায় মাচান, সায়েবরা দলবল নিয়ে বন্দুক উঁচিয়ে বসে আছেন।

মিঞা বন্দুক জানি না, তবু নিজের হাতে মারবে বাঘিনীকে এক আজব খৈয়াল বৈকি।

মহকুমা হাকিম সাহেব তরুণ অফিসার, তাই আদর্শবাদী ; বাঘের সঙ্গে লড়িয়ে তিনি দেখতে চান এদেশের দেহাতী আদমির দুঃসাহস।

আগুনের কুণ্ডলীর থেকে কঅনিকটা দুরে খাড়া করে রাখা একখণ্ড বেড়ার আড়ালে ওঁৎ পেতে থাকে মিঞা, হুঁশিয়ার তৈরি। বাঘিনী এদিকে আসামাত্র দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে তার ওপর এবং তারপর ইতিকর্তব্য। ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত নির্জীব করে মাটিতে না ফেলা পর্যন্ত কেবল আঘাতই করতে থাকবে নিষ্ঠুর অন্ধ উন্মত্তের মতো।

প্রাঙ্গনের জাগ্রত আগুনে বাঘিনী কোনো অর্থ খুঁজে পেয়েছে কিনা কেউ বলতে পারবে না, তবে আজ অনেকক্ষণ সে এলা না ; কিংবা এলেও এত দূরে থেকে যা গরহাজিরেরই শামিল। ওরা প্রতীক্ষা করে অস্ত্র ধরে, বন্দুক উঁচিয়ে। যত দেরিই হোক, আসবেই সে, অন্তত একবার হলেও।

টিক্‌টিক্, টিক্‌টিক্, হাতঘড়িতে মিনিটের পর মিনিট কেটে যাচ্ছে। এরপর একসময় বাচ্চা দুটোর কান খাড়া হয়ে উঠল এবং ওরা এক ধরনের আওয়াজ করতে থাকে, বোঝা যায় আনন্দধ্বনি। ওদের জননী আসছে, টের পেয়েছে নিশ্চয়, বাঁধন ছেঁড়ার জন্য দড়ি টানাটানি করে।

ওইতো সে এসেছে, বাঘিনী। আলো যেখানে শেষ হয়েছে সেই আবছা আঁধারের কিনারায় একটু দাঁড়াল, বাচ্চাদের দেখলো, তারপর মাথা উঁচু করে গর্বিত দৃপ্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে এল তাদের দিকে। মুখ বেশ বড়ো, শীর্ণ শরীরটা দেখাচ্ছে প্রকাণ্ড। পাগুলো একটু ছড়িয়ে স্তন ছেড়ে দিলে বাচ্চারা হুটোপুটি করে গুঁতোতে থাকে দুধ খাওয়ার জন্য। চক্করে চক্করে বিচিত্রিত ভীষণ মনোহর রূপ।

গুড়ুম্ গুড় ম্। হঠাৎ একসঙ্গে দুটো বন্দুক রাতের নির্জন প্রকৃতিকে সচকিত করে দিয়ে গর্জে উঠল।

বাঘিনী জানে মানুষ তার শত্রু, তবু কিছুটা বিস্মিত এবং হতভম্ব ; একটু আগে কৃপাণ হাতে এগিয়ে আসা চেনা লোকটার দিকে যেমন করে তাকিয়েছিলো তেমনিভাবে মুখটা উঁচু করলো, এবং পরক্ষণেই একটা বাচ্চাকে কামড়ে ধরে আরেকটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে রক্ত ঝরাতে ঝরাতে তেমনি অনমনীয় অপূর্ব ভঙ্গিতে চলে যেতে থাকলো অন্ধকারের দিকে।

কিন্তু আবার গুড় ম গুড় ম। আবার, আবার। এবার বনজঙ্গল প্রবলভাবে প্রকম্পিত করে ভয়ংকর গর্জনের সঙ্গে অনেক ওপরে লাফিয়ে উঠল বাঘিনী, এবং প্রচণ্ড আক্রোশে কাতরাতে কাতরাতে অগ্নিকুণ্ডলীর চারপাশে ছুটোছুটি করতে লাগল।

কিন্তু বেশিক্ষণ এইভাবেও টিকে থাকতে পারল না, অনবরত গুলীবৃষ্টিতে একটা ভয়ানক আর্তনাদ করে একসময় সে কাত হয়ে পড়ে গেল। তক্ষুণি দৌড়ে আসে মিঞা বেড়ার কাছ থেকে, আর চক্‌চকে ধারালো অস্ত্রটা দিয়ে প্রাণপণে আঘাত করতে থাকে মাথায়, ঘাড়ে, পিঠে, উরুতে, জঙ্‌ঘায়। ক্রমেই নির্জীব হতে থাকা বাঘিনী চেয়ে দেখে তাকে। চেয়ে চেয়ে দেখে।

বাঘিনীর মৃত রক্তাক্ত শরীরের ওপরে লুটিয়ে পড়েছিল, সেইখানে সশব্দে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে কাঁদতে ঘুম ভেঙে গেল ; উঠে বসে হাত দিয়ে দেখে চোখে অশ্রুর বন্যা, গলা টন্‌টন্ করে ঠেলে ওঠা যন্ত্রণাকে অতিকষ্টে চেপে রাখে।

কাল সাহেবরা শিকার করতে আসবেন।

আজ রাত্রে, অনেক রাত্রে বাঘিনী এলে উঠানে জ্বালিয়ে রাখা কাঠের আগুনের আভায় গিয়ে নিঃশব্দে বাচ্চা দুটোকে ছেড়ে দিল।

বাঘিনী টের পেয়ে দৌড়ে এসে ওদের সঙ্গে কোলাকুলি করতে লাগলো এবং তারাও মুক্তি পেয়ে, জননীকে পেয়ে আত্মহারা হল।

চোখের নিচে পানির দাগ এখনো শুকোয়নি, মিঞা দূরে সরে যায় না কাছে দাঁড়িয়ে থেকেই দেখে তাদের পুনর্মিলন। রাতের নির্জনে আগুনের আভায় যেন চারজনের একটি পরিবার।

জানুয়ারি, ১৯৬৩।